নাট্যসাহিত্যের আলোচনা

ও

নাটকবিচার

(চতুর্থ খণ্ড)

শ্রীসাধন কুমার ভট্টাচার্য্য এম. এ.
বঙ্গবাসী কলেজের
বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক,
ও
নাট্যতত্ত্ব ও নাট্যসমালোচনা-সাহিত্যের অধ্যাপক,
একাডেমি অফ ড্যান্স্, ড্রামা, এ্যাণ্ড মিউজিক,—পশ্চিমবঙ্গ

জিজ্ঞাসা
১৩৩এ, রাসবিহারী এভিনিউ
কলিকাতা-২৯

নাট্যসাহিত্যের আলোচনা ও নাটকবিচার

চতুর্থ খণ্ড

উৎসর্গ

পরমপূজ্যপাদ অধ্যাপক

শ্রীযুক্ত শ্যামাপদ চক্রবর্ত্তী এম, এ—মহোদয়ের করকমলে

চতুর্থ খণ্ডের সূচী

নিবেদন

'নাট্যসাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার'—গ্রন্থমালার চতুর্থ খণ্ড প্রকাশিত হইল। এই খণ্ডে যোগেশচন্দ্র চৌধুরী—রচিত **দিগ্বিজয়ী**; ক্ষীরোদপ্রসাদ—রচিত **নরনারায়ণ** এবং 'বনফুল'—রচিত **শ্রীমধুসূদন** এই তিনখানি নাটকের সমালোচনাকে স্থান দেওয়া হইয়াছে। পৃথক পৃথক গ্রন্থে নাটক তিনখানির সমালোচনা আগেই প্রকাশিত হইয়াছে; এই গ্রন্থে একত্রে উহাদের প্রকাশ করা হইল। এই তিনখানি নাটকের প্রথমখানি **ঐতিহাসিক,** দ্বিতীয়খানি **পৌরাণিক** এবং তৃতীয়খানি **চরিত** এবং তিনখানিরই রস-প্রকল্প—ট্র্যাজেডি।

যে গ্রন্থে আলোচ্য তিনখানি নাটকের প্রত্যেকখানিই ট্র্যাজেডির রসাদর্শে পরিকল্পিত, সেখানে পরিপাটি আলোচনার জন্য প্রথমতঃ ট্র্যাজেডির স্বরূপ দ্বিতীয়তঃ ঐতিহাসিকত্ব পৌরাণিকত্ব এবং চরিতত্ব সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা অবশ্যই করা দরকার। দরকার বুঝিয়াও পৃথক কোন অধ্যায়ে আমি এইসব আলোচনা করি নাই। কারণ—প্রথম খণ্ডে, দ্বিতীয়খণ্ডে এবং তৃতীয়খণ্ডে এই সকল বিষয়ে যে আলোচনা করা হইয়াছে তাহা আমি যথেষ্ট বলিয়াই মনে করি এবং এই খণ্ডেও প্রসঙ্গ-ক্রমে যতখানি অপেক্ষিত ততখানি আলোচনা আমি করিয়াছি। ট্র্যাজেডির স্বরূপ, মেলোড্রামা ও ট্র্যাজেডির পার্থক্য প্রভৃতি বিষয়ে যাঁহারা বিশেষ ভাবে জানিতে চাহেন তাঁহাদের আমি প্রথম খণ্ড এবং তৃতীয় খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত সিরাজদ্দৌলা ও নীলদর্পণ নাটকের সমালোচনা পাঠ করিতে অনুরোধ জানাইতেছি; তারপর, ঐতিহাসিক নাটকের, পৌরাণিক নাটকের এবং চরিত নাটকের লক্ষণ সম্বন্ধে আলোচনা, বিশেষ বিশেষ নাটকের আলোচনা স্থলেই জিজ্ঞাসু পাঠক খুঁজিয়া পাইবেন। এই খণ্ডেও আমি ঐতিহাসিক পৌরাণিক এবং বিশেষতঃ চরিত নাটকের লক্ষণ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। দিগ্বিজয়ী

নাটক আলোচনা-প্রসঙ্গে আমি খাঁটি ঐতিহাসিক নাটকের স্বরূপের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি এবং ঐতিহাসিক কাহিনী, ঐতিহাসিক ব্যক্তির জীবন, বিষয়বস্তু হিসাবে গ্রহণ করা সত্ত্বেও, কেন নাটক কার্য্যত ঐতিহাসিক নাও হইতে পারে তাহাও দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। জিজ্ঞাসু পাঠককে আলোচনার এই অংশ পড়িয়া দেখার জন্য অনুরোধ জানাইতেছি। সেখানে আমি জোরের সঙ্গেই বলিতে চাহিয়াছি, ভাবশুদ্ধি রক্ষা করা—যে কোন নাটকের পক্ষেই অত্যাবশ্যক ব্যাপার। ঐতিহাসিক এবং সামাজিক নাটকে বাস্তবতার মায়া খুবই অপরিহার্য্য। ঘটনা-বিন্যাস, পরিস্থিতি-কল্পনা, ভাব-বিকল্পনা প্রভৃতির দ্বারা এই মায়া যে অনুপাতে নষ্ট হয় সেই অনুপাতেই নাটক ভাবশুদ্ধি হারাইয়া ফেলে। অন্যপক্ষে পৌরাণিক কাহিনীতে বা রূপকথার কাহিনীতে যদিও সঙ্গতির চাহিদা থাকে কিন্তু প্রতিটি ঘটনার এবং প্রতিটি চরিত্রের এমন নিখুঁত বাস্তবতা কেহই প্রত্যাশা করে না। পৌরাণিক জগতে প্রাকৃত অপ্রাকৃত নামেই শুধু পৃথক, কার্য্যত উহারা ঘনিষ্ঠ। দুইয়ের ব্যবধান খুব বেশী নহে—সেখানে দেবতারা মানুষের ঘরে এবং মানুষ দেবতার ধামে অবাধেই আনাগোনা করিতেছেন। সেখানে ব্যক্তির আকস্মিক আবির্ভাব বা তিরোভাব, দেবতার মানুষ হওয়া, মানুষের দেবতার দেহে লীন হওয়া, দেবতার ঔরসে মানুষের গর্ভে সন্তান হওয়া, স্বর্গ হইতে রথ নামিয়া আসা, মেদিনীর রথচক্র গ্রাস করা, পৃথিবীর দুইভাগে ভাগ হইয়া যাওয়া—কোন কল্পনাই অসম্ভব নহে। দৈব-ইচ্ছাই—দেবলীলাই সেখানে সর্বব্যাপী। দৈব-রোষই সেখানকার সর্বাপেক্ষা বড় বিপত্তি। দৈবরোষের পরেই দ্বিতীয় ভয়ঙ্কর—ব্রহ্মশাপ। মন্ত্রতন্ত্রের এবং যোগের প্রভাব-প্রতিপত্তি দুর্বার ও বিস্ময়কর। দেবতার কৃপা অবশ্য সকলেরই উপরে। যতবড় পুরুষকারই হউক না কেন—দৈবশক্তির কাছে তাহার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। এই ভাবপরিমণ্ডলেই পৌরাণিক নাটক শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করিয়া থাকে।

ঐতিহাসিক এবং সামাজিক নাটকের ক্ষেত্রে পাত্র-পাত্রীর পায়ের তলা হইতে বাস্তবতার ভূমি যত সরিয়া যায় তত যেমন তাহারা 'আকাশস্থ নিরালম্ব'

হইয়া পড়ে এবং নাটকের ভাবশুদ্ধির হানি ঘটে, তেমনি পৌরাণিক নাটকের ক্ষেত্রেও পৌরাণিক আবহাওয়া অর্থাৎ দৈব-বিধানের দৈবলীলার প্রভাব যত কমিয়া যায়, তত নাটকের পৌরাণিকী ভাবশুদ্ধির অপচয় হয়। ঐতিহাসিক নাটকে কবিকল্পনাকে যেমন ঐতিহাসিক তথ্যের বাধা মানিয়া—দেশ-কাল পাত্রের ঔচিত্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া চলিতে হয়, পৌরাণিক নাটকেও তেমনি কবি পৌরাণিক বার্ত্তার গণ্ডী মানিয়া চলিতে বাধ্য। উভয়ক্ষেত্রেই কাহিনীর কাঠামো এবং চরিত্রের প্রসিদ্ধি যথাসম্ভব অক্ষুন্ন রাখিয়াই, কবিকে কল্পনার অবকাশ সৃষ্টি করিতে হয়। এই সমস্ত ক্ষেত্রে কবির দক্ষতা খুঁজিতে হইবে বৃত্ত রচনার মধ্যে নহে, খুঁজিতে হইবে—বিশেষ পরিস্থিতিতে অনুভাব সঞ্চারিভাব প্রভৃতির গভীরতা ও জটিলতা সৃষ্টির ক্ষমতার মধ্যে—এক কথায় রসনিষ্পত্তির তীব্রতার মধ্যে। এই কথাটি মনে রাখিয়াই, ঐতিহাসিক নাটক এবং পৌরাণিক নাটকের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া উচিত।

এই খণ্ডের বিশেষ উল্লেখযোগ্য তত্ত্বালোচনা—চরিতধর্মী নাটকের স্বরূপ বিচার। চরিতধর্মী নাটকের গঠন বিচার করিতে হইলে অবশ্যই চরিত ধর্ম কি তাহা জানিয়া লওয়া দরকার। ধর্ম না জানিয়া ধর্মীকে বিচার করিতে গেলে, বিচারের নামে অবিচারই করা হইবে। বিভ্রান্তি যে অনিবার্য্য সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। অনেকক্ষেত্রেই এই কারণে বিভ্রান্তি ঘটিয়া থাকে। ধর্মীর স্বরূপ না জানিয়া একের ধর্ম অন্যে আরোপ করিতে গিয়া বিভ্রাট ঘটানো হয়।

এই প্রসঙ্গে বিচারের মূল সূত্র সম্বন্ধে দুই একটি কথা উত্থাপন করা যাইতে পারে। নাটক 'সাহিত্য' বটে কিন্তু উহা সাহিত্যের এক বিশেষ প্রজাতি (species)। কবিকর্ম হিসাবে—রসনিষ্পন্ন সামগ্রী হিসাবে, সাধারণভাবে উহা কাব্য (কবেরিদম=কাব্যম্) কিন্তু বিশেষতঃ উহা "দৃশ্য কাব্য"। অর্থাৎ বৈশেষিক লক্ষণ (differentia) হইতেছে—দৃশ্যত্ব—অভিনেয়ত্ব। (তত্রাভিনেয়ং দৃশ্যম্)। নাটক একাধারে শ্রব্য-দৃশ্য। অতএব নাটক বিচার করিতে হইলে—'কাব্য-ধর্ম' এবং 'দৃশ্য ধর্ম' দুই ধর্মেরই বিচার করিতে হইবে এবং তাহা পৃথক

ভাবে করিলে চলিবে না—দুই ধর্মের অবিরোধ সঙ্গতি বা সামঞ্জস্য ঘটিয়াছে কিনা তাহাই যাচাই করিয়া দেখিতে হইবে। এ সম্পর্কে বিখ্যাত নাট্য সমালোচক অগষ্ট উইল্‌হেলম শ্লেগেল (১৭৬৭-১৮৪৫) তাঁহার—"লেকচারস অন্ ড্রামাটিক আর্ট এ্যাণ্ড লিটারেচার (১৮০৯-১১) গ্রন্থে লিখিয়াছেন—"a dramatic work may always be regarded from a double point of view—how far it is poetical and how far it is theatrical. "Poetical" কথাটির অর্থ, আমাদের 'কাব্য' কথাটির অর্থের মতো সাধারণ লোকে ভুল বুঝে বলিয়া শ্লেগেল লিখিয়াছেন—"let not however, the expression poetical be misunderstood : I am not now speaking of the versification and the ornaments of language......but I speak of the poetry in spirit and design of a pieco ; and this may exist in as high a degree when the drama is written in prose as in verse. What is then that makes a drama poetical ? The very same assuredly that makes other work so. It must in the first place be a connected whole, complete and satisfactory within itself."

আমাদের 'কাব্য' কথাটিও ঠিক এই অর্থেই প্রযুক্ত। কিন্তু অনেকেই এই তাৎপর্য্য বুঝিতে পারেন না বা বুঝিতে চাহেন না বলিয়া নাটককে 'দৃশ্য কাব্য' বলিতে কুণ্ঠা বোধ করিয়া থাকেন। যাহা হউক নাটক সামান্যধর্মে 'কাব্য' এবং বিশেষধর্মে দৃশ্যকাব্য—এই সিদ্ধান্ত সম্পর্কে সচেতন থাকা আবশ্যক।

কিন্তু দৃশ্যত্ব-নিরূপণ আর এক মহাসমস্যা। এই চড়ায় ঠেকিয়া অনেক সমালোচনারই ভরাডুবি ঘটিয়া থাকে। কি থাকিলে দৃশ্যধর্ম অক্ষুণ্ণ থাকে এবং কি না থাকিলে তাহা থাকে না এই প্রশ্ন লইয়া বিসংবাদের অন্ত নাই। এখানেও "নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্"। ইউরোপে এবং আমেরিকায় এই প্রশ্ন লইয়া এত জল ঘোলা হইয়াছে যে সত্য উদ্ধার করা এক মহাদুঃসাধ্য ব্যাপার। শ্লেগেল

(১৮০৯-১১) ফার্ডিনাণ্ড ব্রুণেতিয়ার (১৮৯৪) মরিস মেটার্লিঙ্ক (১৮৯৬), উইলিয়াম আর্চার (১৯১২) হেনরি আর্থার জোন্‌স্ (১৯১৪), জর্জ পিয়ার্স বেকার (১৯১৯) জন হাওয়ার্ড লসন (১৯৩৬), বার্ণার্ড'শ প্রমুখ নাট্যবিশারদগণ, "ড্রামাটিক"-এর লক্ষণ নির্দ্ধারণ করিতে গিয়া গভীর ও জটিল আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহাদের আলোচনাকে মতবাদ হিসাবে সাজাইয়া গুছাইয়া লইলে এরূপ একটা তালিকা করা যায় :—

(১) শ্লেগেল (১৮০৯-১১) অভিসরণ-বাদ (onward progress of action).

(২) ব্রুণেতিয়ার (১৮৯৪) সক্রিয়-দ্বন্দ্ব বা আক্রমণশীল উদ্যোগ (conflict)

(৩) মেটার্লিঙ্ক (১৮৯৬) ভাবধ্বনিবাদ বা স্থির ক্রিয়াবাদ } Action in Words or Static action

(৪) আর্চার (১৯১২) সঙ্কটবাদ (Crisis)

(৫) আর্থার জোনস (১৯১৪) কৌতূহলবাদ + প্রতিক্রিয়াবাদ } Suspense or Reaction

(৬) বার্ণার্ড শ— বিতর্কবাদ (Discussion)

(৭) পিয়ার্স বেকার (১৯১৯) আবেগবাদ (Emotion)

(৮) হাওয়ার্ড লসন (১৯৩৬) ভারসাম্যের পরিবর্তন (Change of (Equilibrium)

কোন্ ধর্মের জন্য উপস্থাপ্য বস্তু খাঁটি নাটকীয় বা দৃশ্য হইয়া উঠে—এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইলে উল্লিখিত মুনিদের মত অবশ্যই জানা দরকার। কাহার মত গ্রাহ্য, কাহার মত অগ্রাহ্য—এ বিচারে প্রবেশ করিবার অবকাশ এখানে নাই। এই বিচারের জন্য যাঁহারা কৌতূহলী তাঁহাদের গ্রন্থকারের "নাট্যতত্ত্ব মীমাংসা" (যন্ত্রস্থ) গ্রন্থখানি পাঠ করিবার জন্য অনুরোধ জানাইয়া

রাখিতেছি। আপাততঃ এখানে তুইটি মেরুর প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। এই মতবাদগুলির—এক মেরুতে, ব্রুণেতিয়ারের সক্রিয় দ্বন্দ্ববাদ—যেখানে পাত্র পাত্রীদের সচেতন ও সক্রিয় সংগ্রামের মধ্যে, বাধা অতিক্রমণের আক্রমণশীল উদ্যোগের মধ্যে নাটকীয়ত্ব নিহিত; অন্য মেরুতে—মেটারলিঙ্কের স্থিরশান্তক্রিয়াবাদ—যেখানে নাটকীয়ত্ব কোন বাধা বিপত্তির বিরুদ্ধে দ্বন্দ্ব করার মধ্যে নিহিত নহে; নাটকীয়ত্ব থাকে—সংলাপের অর্থশক্তির মধ্যে—গভীরতর ব্যঞ্জনার মধ্যে। ব্রুনেতিয়ারের মতে নায়ক যেখানে—উদ্যমের সহিত বাধাকে আক্রমণ না করে—অর্থাৎ "act" না করিয়া acted "upon" হয়, সেখানে নাটকীয়ত্বের হানি ঘটে—নাট্যধর্ম থাকে না। অন্যপক্ষ মেটার্লিঙ্কের ধারণা—"Indeed it is not in actions but in the words that are found the beauty and greatness of tragedies and this not solely in the words that accompany and explain the action, for there must perforce be another dialogue besides the one which is superficially necessary" (The treasure of the humble)। তবে ভরসা এই যে, এই সিদ্ধান্তই তাঁহার শেষ সিদ্ধান্ত নহে। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে, European Theories of the Drama গ্রন্থের সম্পাদকের কাছে লিখিয়াছিলেন—"You must not attach too great importance to the expression 'static' it was an invention, a theory of my youth, worth what most literary theories are worth—that is, almost nothing. whether a play be static, dynamic, symbolistic or realistic is of little consequence. What matters is that it be well written. well thought out, human and if possibse superhuman, in the deepest significance of the term. The rest is mere, rhetoric." মন্তব্যটুকু প্রণিধানযোগ্য। বাস্তবিকই মর্ম না জানিয়া ধর্ম ব্যাখ্যা করিতে গেলে চলিবে কেন? চণ্ডীদাসের মতো আমরাও বলিতে পারি—

মরম না জানে ধরম ব্যাখানে
এমতি আছয়ে যারা
কাজ নাই সখি, তাদের কথায়
বাহিরে রহুন তারা।

মর্ম উদ্ধার করাই বড় কথা এবং নাটকীয়ত্বের মর্মও সকল মর্মের মতোই উপলব্ধিগম্য, সহৃদয়হৃদয়গম্য।

এইরূপ যেখানে অবস্থা, সেখানে কোন্টুকু নাটকীয়, কোন্টুকু অনাটকীয়, তাহা বাছিয়া লওয়া খুব সহজসাধ্য ব্যাপার নহে। মোটামুটি ভাবে বলা যাইতে পারে—অংশের বিচার করিবার আগে অংশীর স্বরূপ বা প্রকৃতিটি স্থির করিয়া লওয়া দরকার; কারণ অংশীর অভিব্যক্তির জন্যই তো অংশের উদ্ভব—অংশীর উদ্দেশ্য সিদ্ধ করাতেই অংশের উপযোগিতা। অংশের তাৎপর্য্য বুঝিতে হইলে যে অংশীর স্বরূপ আগে বুঝা দরকার—জন হাওয়ার্ড লসন মহাশয় এ কথাটা খুব জোরের সঙ্গেই বলিয়াছেন। "Action may be simple or complex, but all its parts must be objcetive. progressive, meaningful"—এই সিদ্ধান্ত করিবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি "progressive এবং" "meaningful" শব্দ দুইটির তাৎপর্য্য নির্দ্ধারণের সমস্যার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন, বলিয়াছেন—'প্রোগ্রেসিভ্' কথাটা গঠন সংক্রান্ত ব্যাপার আর "মিনিঙফুল" কথাটি বিষয়-সংক্রান্ত। কোনটি 'মিনিঙফুল' কোনটি 'মিনিঙফুল' নহে, সমগ্রের স্বরূপটি ধরিতে না পারা পর্য্যন্ত তাহা বুঝা সম্ভব নহে—"Neither problem can be solved until we find the unifying principle which gives the play its wholeness binding a series of action into an action which is organic and indivisible"—[The theory and technique of play making-1935] শিল্পী যাহা সৃষ্টি করিতে চাহেন তাহা সরল অথবা যৌগিক—যৌগিক আবার কি ধরণের যৌগিক—তাহা নির্দ্ধারণ করিতে পারিলেই অঙ্গন্যাসের তাৎপর্য্য সম্যক বুঝা যাইতে পারে। সুতরাং শিল্পী যে সমগ্রের রূপটি—

'wholeness' ধ্যান করিয়াছেন, সেই ধ্যানকেই আগে আবিষ্কার করা দরকার।

এখানেই আসে—নাটকের "জাতি" নিরূপণের প্রশ্ন। কোন্ জাতীয় নাটক—এ প্রশ্নের মীমাংসা আগেই করা চাই। তাহা করা হয় না বলিয়া অনেক সময় 'ধানের ক্ষেতে বেগুন খুঁজিতে' যাওয়া হয়। যেমন—রূপক সাংকেতিক নাটক বিচারে ঐতিহাসিক ও সামাজিক নাটক-বিচারের সূত্র প্রয়োগ করা হয়, পৌরাণিক নাটকে সামাজিক নাটকের বাস্তবতা প্রত্যাশা করা হয়, কাব্যিক নাটকে সংলাপের বাস্তবকল্প ঔচিত্য দাবী করা হয়। যৌগিক বৃত্তে সরলবৃত্তের "ঐক্য-নিষ্ঠা না পাইয়া যৌগিকবৃত্তকে অনাটকীয় বলিয়া ঘোষণা করা হয়, চরিত নাটকে বা চরিতধর্মী গঠনে কার্য্য-ঐক্য না পাইয়া সমগ্র গঠনটিরই নিন্দা করা হয়—এমনি আরো অনেক কিছুই করা হয়। কোনটি মুখ্য লক্ষ্য এবং কোনগুলি উপলক্ষ্য তাহা স্থির না করিয়া বিচারে অগ্রসর হওয়ার ফলে—ঘটনা-মুখ্য নাটকে রস-চরিত্র-ভাবের স্পষ্টতা চাহিয়া বঞ্চিত হইতে হয়; রসমুখ্য নাটকে ঘটনার চমক চরিত্রের জটিলতা ভাবের চমৎকারিত্ব না পাইয়া ক্ষুব্ধ হইতে হয়; চরিত্র মুখ্য নাটকে ঘটনার চমকপ্রদতা সংবেদনার তীব্রতা বা ভাবৈশ্বর্য্য না দেখিয়া ক্ষোভ হয় এবং ভাবমুখ্য নাটকে জটিল চরিত্র সৃষ্টি ঘটনার সংঘাত এবং তীব্র রসসংবেদনা না থাকায়, নাটককে নাটক বলিয়াই মনে হয় না। এই কারণেই সমালোচকের দৃষ্টি লক্ষ্যভেদী হওয়া দরকার অর্থাৎ প্রথমেই নাটকের জাতি প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত করা উচিত এবং জাতীয় বিশেষত্বের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই অঙ্গোপাঙ্গের বিচার করা কর্ত্তব্য।

"Wholeness" অর্থাৎ অঙ্গীর স্বরূপটি নির্দ্ধারণ করা যে বাস্তবিকই বড় কথা, নাটকের বিচার করিতে গিয়া যে-সব বিভ্রান্তিকর মন্তব্য করা হয় তাহা হইতেও পরোক্ষ ভাবে বুঝা যায়। ক্লাসিকাল গঠনের সংস্কার লইয়া রোমান্টিক গঠনের নাটক বিচার করিতে বসিয়া নিখুঁত কার্য্য-ঐক্য না পাইয়া অনেকেই হতাশ হইয়া থাকেন। যেমন বাংলা নাটকের গঠনাদর্শ 'রোমান্টিক' অর্থাৎ একাধিক উপবৃত্তের (subplots) সমবায়ে একটি বৃহৎ এবং যৌগিক বৃত্ত (plot)

গঠন করা হয় বলিয়া, বৃত্ত দ্রুতলয়ে অগ্রসর হয় না। মূল রসের ধারা হইতে উপবৃত্তের বস্তুবিন্যাস মাঝে মাঝে বেশ দূরে চলিয়া যায়। এক সঙ্গে একাধিক বৃত্ত সম্পূর্ণ করিতে চেষ্টা করা হয় বলিয়া নাটকে এমন ঘটনারও সমাবেশ করিতে দেখা যায় যাহাদের সহিত প্রধান বৃত্তের কোনরূপ যোগ নাই। ফলে নাটকের ঘটনা-বিন্যাসে যত বাহুল্য আসে তত নিবিড়তা আসে না, রসে যত বৈচিত্র্য আসে রসনিষ্পত্তিতে তত তীব্রতা ও সান্দ্রতা আসে না। এক কথায়, বাংলা নাটক রোমাণ্টিক-নাটকের গঠনের মতই শিথিলবন্ধ বিলম্বিত চালে চলে। বাঁধুনির এই শৈথিল্য দেখিয়া কেহ কেহ এমন কথাও বলিয়া থাকেন—যে বাংলা সাহিত্যে নাটক নাই—নাটক নামে যাহা আছে তাহা রোমাঞ্চের নাট্যরূপ। এই ধরণের মন্তব্যের মধ্যে যতটা চমক আছে ততটা বহুদর্শিতা নাই। অবশ্য নাটককে—উইলিয়াম আর্চার মহাশয়ের ভাষায়—"art of crisis" বলিলে এবং উপন্যাসকে "art of gradual devolopment" বলিলে—রোমাণ্টিক গঠনের সব নাটককেই রোমাঞ্চ-ধর্মী নাটক না বলিয়া উপায় নাই। বিশ্ববিখ্যাত নাট্যকার শেকস্‌পীয়রের রোমাণ্টিক-আদর্শে-গঠিত নাটককেরও তাহা হইলে, অব্যাহতি নাই। নাই যে তাহার প্রমাণ আছে। শেকস্‌পীয়রের নাটকে—উপবৃত্ত-যুক্ত বৃত্ত তথা "orchestration of life" অর্থাৎ জীবনের ঐকতান দেখিয়া, 'ক্লাসিকাল" ঐক্য-ভক্ত গোঁড়া ফরাসীরা শেকস্‌পীয়রকে—"a barbarian of genius" বলিতে কুণ্ঠা বোধ করে নাই। কার্য্য-ঐক্য, কাল-ঐক্য স্থান-ঐক্য বিষয়ে যাঁহারা শুচিবায়ুগ্রস্তের মতো অতিপরায়ণ, রেসিন্ ও কর্ণেই প্রমুখ নাট্যকারদের নাটক দেখিয়া যাহাদের নাট্যবোধ বদ্ধমূল হইয়াছে, সেই সব ফরাসীদের কাছে শেকস্‌পীয়রের যৌগিক বৃত্তের নাটক বা হিউগোর নাটক—"Mere bustle" বলিয়া মনে হইবে বই কি। কারণ ক্লাসিকাল ভক্ত ফরাসীদের কাছ—"After all it is the moment not the story that is dramatic" (পল ল্যাণ্ডিস্)। "Six plays by Corneille and Racine"—গ্রন্থের ভূমিকায় অধ্যাপক পল ল্যাণ্ডিস্—শেকস্‌পীয়রের রীতির সঙ্গে কর্ণেই-রেসিনের রীতির তুলনা করিতে গিয়া লিখিয়াছেন—"There can

be no doubt that the latter method is better adapted to the brief time of a stage presentation, and that the former is more the method of the novel" এখন শেকস্‌পীয়র যে রীতিতে নাটক রচনা করিয়াছেন তাহাকে 'নভেল-সুলভ' বলা হইয়াছে বলিয়া কেহ যেমন এ কথা বলিবেন না যে শেকস্‌পীয়রের নাটক নভেলের নাট্যরূপ, তেমনি রোমান্টিক নাটকের আদর্শে বাংলা নাটক গড়িয়া উঠিয়াছে বলিয়া, বাংলা নাটককে রোমান্সের নাট্যরূপ বলাও সঙ্গত হইবে না। তবে প্রধান রসের ধারা হইতে বস্তু-বিন্যাস বহুদূরবর্ত্তী হইলে এবং রসের ধারা ব্যাহত হইলে—শৈথিল্যকে অবশ্যই দোষাবহ বলিয়া নিন্দা করিতে হইবে।

এই প্রসঙ্গেই বাংলা ঐতিহাসিক নাটকের গঠন-গত এবং রস-গত রোমান্টিক প্রকৃতি সম্বন্ধে দুই একটি কথা উত্থাপিত করা যাইতে পারে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—ইংরেজি রোমান্টিক রীতির নাটকের আদর্শ দ্বারা আমাদের নাটকের গঠন নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। তারপর সংস্কৃত নাটকের গঠনেও, স্থান ঐক্যের, কাল-ঐক্যের এবং কার্য্য-ঐক্যের নিয়মের বাড়াবাড়ি নাই বলিয়া রোমান্টিক রীতির পরিকল্পনার সহিত দেশীয় সংস্কারের কোন বিরোধ ঘটে নাই। ধরা যাক, যদি ইংরেজের বদলে ফরাসীরা ভারতের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইত এবং কর্ণেই-রেসিন আদর্শ নাট্যকারের আসনে অধিষ্ঠিত হইতেন তাহা হইলে সংস্কৃত নাটকের সংস্কার ফরাসীদের ঐক্য-নিষ্ঠা দ্বারা নিশ্চয়ই বাধাপ্রাপ্ত হইত এবং দুইয়ের সমন্বয়ে নূতন রীতি উদ্ভাবিত হইত অথবা ক্লাসিকাল রীতির প্রভাবে—ক্লাসিকাল আদর্শে বাংলা নাটক গড়িয়া উঠিত। তাহা হয় নাই বলিয়া ইংরেজি রোমান্টিক গঠনের সহিত আমাদের রোমান্টিক সংস্কারের সহজেই মিল ঘটিয়া গিয়াছে রোমান্টিক আদর্শে বাংলা নাটক গঠিত হইয়াছে। মাইকেল মধুসূদন কেশব চন্দ্র গাঙ্গুলীর কাছে—"কৃষ্ণকুমারী" নাটক সম্পর্কে যে পত্রখানি লিখিয়াছিলেন, তাহাতে আমাদের প্রকৃতি, সংস্কৃত নাটকের প্রকৃতি এবং বাংলা নাটকের গঠনাদর্শ সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য ইঙ্গিত পাওয়া যায়। আমাদের প্রকৃতি

সম্পর্কে তাঁহার মন্তব্য—"I must here tell you, my dear G, what, I dare say, you will allow at least to some extent, viz, that we Asiatics are of a more romantic turn of mind than our European neighbours"

এই কারণেই—In the great European drama you have the stern realities of life, lofty passion and heroism of sentiment, with us it is all softness, all romance—আর সংস্কৃত নাটক, বলা যাইতে পারে—"dramatic poems"। বাংলা নাটকের গঠন গোড়া হইতেই রোমাণ্টিক আদর্শ বা রীতি অনুসরণ করিয়াছে কেন, আগেই আলোচনা করা হইয়াছে। কেশব গাঙ্গুলী মহাশয়ের—কৃষ্ণকুমারী নাটকে 'sub-plot' যোজনা করিবার প্রস্তাবে তাহারই সমর্থন পাওয়া যায়। কৃষ্ণকুমারী কাহিনী "barren of incidents" হওয়া সত্ত্বেও, কেশব গাঙ্গুলীর নির্দ্দেশ অনুসারেই মধুসূদন .Sub-plot যোজনা করিয়া, "variety of actiion" সৃষ্টির চেষ্টা করেন। এই ভাবে বাংলা নাটকে রোমাণ্টিক রীতি অনুসৃত হইতে থাকে এবং ক্রমে রীতিটি বাংলা নাটকের মজ্জাগত হইয়া হইয়া দাঁড়ায়। বাংলা নাটকে রোমাণ্টিক গঠনই নিয়ম; ক্লাসিকাল গঠন নিয়মের ব্যতিক্রম।

রোমাণ্টিক রীতি যে মজ্জাগত হইয়াছে, তাহার আর একটি কারণ মনে হয়—বাংলা নাটকের শৈশবেই—রোমান্স সাহিত্যের বিস্ময়কর প্রভাব প্রতিপত্তি। গল্প-রসের চমৎকারিত্বের প্রতি যে রোমান্সের বেশী লোভ, বঙ্কিমচন্দ্রের ও সমসাময়িক লেখকদের উপন্যাস ও গল্প সাহিত্য সেই রোমাঞ্চেরই জমজমাট আবহাওয়া সৃষ্টি করে এবং বাঙালীর রুচিকে গল্পরসলোলুপ করিয়া তুলে। ফলে সর্বত্র রোমাণ্টিকতার প্রশ্রয় ঘটে। কাব্যে—উপন্যাসে রোমাণ্টিকতার ভরা জোয়ার দেখা দেয়।

নাটকেও সেই জোয়ারের জল প্রবেশ করে। এমন কি ঐতিহাসিক এবং সামাজিক নাটকের ক্ষেত্রেও—যেখানে বাস্তবতার মাধ্যাকর্ষণের টান সব চেয়ে

বেশী সেখানেও—রোমান্টিকতার বন্যা বহিয়া যায়। ইহার জন্য আংশিক দায়ী অবশ্য আমাদের শিল্পীদের ঐতিহাসিক চেতনার দৈন্য, দেশে প্রকৃত ইতিহাসের অভাব। ইতিহাসের নামে কিংবদন্তী-ভরা আজগুবি যে সকল কাহিনী প্রচলিত ছিল তাহা বাস্তববোধ অপেক্ষা উৎকল্পনাকেই বেশী শক্তি যোগাইয়াছে। জনসাধারণের ঐতিহাসিক চেতনা বলিয়া বাস্তববোধ বলিয়া যাহা ছিল, তাহাতে সত্য-মিথ্যা প্রায় একাকার হইয়াই ছিল। সুতরাং তাহাকে না-থাকা বলাই ভাল। শিল্পীদের বাস্তবতার ধারণাও এই কারণে যথার্থ বাস্তব হইতে বেশ খানিকটা দূরেই সরিয়া ছিল। রবীন্দ্রনাথের ভাষা ধার করিয়া বলা যাইতে পারে তাঁহার চোখে অনেক ছায়াই কায়াময়ী এবং অনেক কায়াই মায়াময়ী বলিয়া মনে হইয়াছে। ফলে রোমাঞ্চের ভাবোচ্ছ্বাস, ঘটনার আকস্মিকতাও চমকপ্রদতা, কল্পনার বেপরোয়া বিলাস প্রভৃতি অব্যাহতগতিতে সর্বত্র বিচরণ করিতে থাকে। ঐতিহাসিক এবং সামাজিক নাটকের ক্ষেত্রেও তাহারা বাধা প্রাপ্ত হয় না।

অবশ্য আর একটা কারণেও ঐতিহাসিক এবং সামাজিক নাটক পুরোদস্তুর বাস্তব হইয়া উঠিতে পারে নাই। কারণটি আর কিছুই নহে—নাটকের ধারণা। প্রচলিত ধারণা অনুসারেই, প্রতিযুগে নাটকের প্রকৃতি গড়িয়া উঠে। নাটককে একাধারে 'poetical' এবং 'theatrical' হইতে হইবে—এই সংস্কার যখন প্রবল তখন নাট্যকারের সত্তা স্বভাবতই দ্বিধাবিভক্ত। তাঁহার একদিকে কবিসত্তা অন্যদিকে নাট্যকার-সত্তা। এই দুই সত্তার সামঞ্জস্য না ঘটিলে কি হয় মধুসূদন আত্ম-বিশ্লেষণ করিতে গিয়া সুন্দরভাবে একস্থলে ব্যক্ত করিয়াছেন—লিখিতেছেন—"In the Sarmistha I often stepped out of the path of the Dramatist, for that of the poet. I often forgot real in search of the poetical. In the persent play I mean to establish a vigilant guard over myself.

I shall not look this way or that for poetry ; if I find her before me I shall not drive her away, I shall endeavour to

create characters who speak as nature suggests and not mouth-mere poetry." মধুসূদন যে দ্বন্দ্বে ভুগিয়াছেন পরবর্তী অনেক নাট্যকারই—শুধু আমাদের দেশেই নহে, অন্যান্য দেশেও এই দ্বন্দ্বে ভুগিয়াছেন—কবি-সত্তা এবং নাট্যকার-সত্তার মধ্যে সন্তোষজনক সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে পারেন নাই। যাহাদের কবি-সত্তা প্রবল তাহারা চরিত্র-সৃষ্টি করিতে গিয়া গালভরা বাগবিন্যাসে কল্পনার তানবিস্তারে মাতিয়া, উঠিয়াছেন এবং যাহাদের নাট্যকার-সত্তা প্রবল তাহারা ভাবোচ্ছ্বাসে মাতিয়া না উঠিলেও, চমকপ্রদ ঘটনা, চরিত্র ও ভাবাবেগ দেখাইয়া দর্শকদের মাৎ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই কারণেই কবি ও নাট্যকারের সমন্বয় খুব কম নাটকেই পাওয়া গিয়াছে এবং তাহা পাওয়া যায় নাই বলিয়াই বাংলা ঐতিহাসিক নাটকে—সামাজিক নাটকেও—বাস্তবতার মায়া তেমন জমাট বাঁধিতে পারে নাই।

তবে বাংলা নাটকের পক্ষে ভরসার কথা এই যে সর্বতোভাবে নির্দোষ এবং অবিসংবাদিত অনবদ্য নাটক পৃথিবীতে খুব কমই আছে, নাই বলিলেও চলে। শেক্‌সপীয়র যে শেক্‌সপীয়র তাঁহার নাটকও সর্বতোভাবে নির্দোষ নহে। কবি-মনীষী টলষ্টয় তাঁহার "শেক্‌সপীয়র ও নাটক" প্রবন্ধে (১৯০৬), 'কীঙলীয়র' নাটকের সমালোচনায় যে সব মন্তব্য করিয়াছেন তাহা অন্ধ বিশ্বাসীদের পক্ষে মোহমুদ্গরের কাজ করিতে পারে বলিয়া, "রাশিয়ান লিটারেচার" গ্রন্থের লেখক রিচার্ড হেয়ারের জবানিতে উদ্ধৃত করিতেছি—The position in which the characters in king Lear are quite arbitrarily placed are so unnatural that the reader or spectator is unable either to sympathise with their sufferings or even to be interested in what he reads or hears. The characters speak, not an individual language of their own, but always one and the same Shakesperian affected unnatural language, which not only could they not speak, but which no real people could ever have spoken any

where. They talk at great length about quite irrelevant matters, guided more by the sound of words and by puns than by thought —and they all talk alike..............................Shakespeare's characters continually do and say not merely what is unnatural to them, but what is quite arbitrary and senseless.

Everything is melodramatically exaggerated, the speeches, the actions of the characters and their consequences ; there is no sense of proportion..... sincerity is totally absent in Shakespere's works......artificiality was deliberate" এই দীর্ঘ উদ্ধৃতি দেওয়ার উদ্দেশ্যকে কেহ যদি, বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া স্বদেশের কুকুর মাথায় করিবার প্রবৃত্তি বলিয়া ব্যাখ্যা করেন তাহা হইলে খুবই ভুল করিবেন। আমি শুধু এইটুকুই দেখাইতে চাহিয়াছি যে—টলষ্টয়ের মতো মনীষী—সেক্‌সপীয়রের মতো নাট্যকার সম্পর্কে এমন সব কথা বলিয়াছেন যাহা আমাদের বাংলা নাটকের বিরুদ্ধে হামেশাই বলা হইয়া থাকে। বিদেশের সবই ঠাকুর আর স্বদেশের সবই কুকুর অথবা স্বদেশের সবই ঠাকুর আর বিদেশের সবই কুকুর—এই দুই সঙ্কীর্ণ মনোভাব লঘুচেতার লক্ষণ এবং উহাকে নিন্দা করিবার উদ্দেশ্যেই আমি টলষ্টয়ের মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়াছি। সেক্‌স্‌পীয়রকে ছোট অথবা বাংলা নাটককে শেক্‌স্‌পীয়রের নাটকের সমকক্ষ করিবার উদ্দেশ্য লইয়া যে কোন কথা বলিতেছি না—এই কথাটাই বিশেষভাবে বলিবার কথা।

বাস্তবিক খুবই আশ্চর্য্যের কথা—বিদেশী নাটক বিচার করিবার সময় আমরা নাট্যকারের দেশ, যুগ, পরিবেশ ও প্রথা সম্বন্ধে খুবই সচেতন থাকিয়া বিচারে অগ্রসর হইয়া থাকি, কিন্তু বাংলা নাটকের কথা উঠিলে সেই সব চেতনা হারাইয়া ফেলি। শয়তানকেও ন্যায্য প্রাপ্য মিটাইয়া দেওয়ার যে নীতি আছে সেটুকুও পর্য্যন্ত আমরা মানিতে চাহি না। আমরা মুখেই বলি—"the first necessity for appreciation is a recognition of the convention

of the theater for which the plays were written." (Introduction —Six plays By Corneille and Racine.)। কিন্তু কার্য্যকালে—এই সূত্র প্রয়োগ করিতে চাহি না। বাংলা নাটকে বাঙালীর এবং ভারতীয় জীবনের পুরুষার্থ সাধনার রূপ প্রকাশ পাইবে, বাঙালী জীবনের রূপ ও রসবোধ দ্বারা নাটকের প্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত হইবে—ইহাই স্বাভাবিক। ধরা যাক আমাদের পৌরাণিক নাটকের কথা। আমাদেরই পৌরাণিক কাহিনীকে দৃশ্য রূপ দিয়া তাহা সার্থক হইবে। গ্রীসের পৌরাণিক নাটকের বা খৃষ্টীয় 'মিরাকেল-প্লে'র বা 'মরালিটি প্লে'র রূপ-রস তাহাতে না পাইলে, তাহাদের 'নাটক' বলা হইবে না—এ কেমন কথা! আমাদের ধর্ম্মমূলক নাটকে আমাদেরই মোক্ষ সাধনার বা মুক্তি সাধনার বা নির্বাণ লাভের বা ভগবদ্ভক্তির রূপ ব্যক্ত হইবে। খৃষ্টানধর্ম্মের পরম পুরুষার্থের সাধনার সহিত আমাদের পরম পুরুষার্থের সাধনার পার্থক্য অবশ্যই আছে; আমাদের নাটকেও সে পার্থক্য অবশ্য প্রকটিত হইবে।

যাঁহারা সাকার ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন, যাঁহারা বিশ্বাস করেন, 'অবতার রূপে ভগবান মর্ত্ত্যে এবং মানুষের ঘরে জন্মগ্রহণ করিতে পারেন এবং যে ভাবে তাঁহাকে ভজনা করেন তিনি সেই ভাবেই তাঁহাকে কৃপা করেন, তাঁহাদের পৌরাণিক নাটকে নররূপে নারায়ণের উপস্থিতি, অথবা রাখাল-বেশে কৃষ্ণের আবির্ভাব, কিরাত-বেশে মহাদেবের উপস্থিতি—এই জাতীয় ঘটনার বিন্যাস, নিশ্চয়ই অপ্রত্যাশিত নহে। আধুনিক বস্তুবাদী রুচির কাছে দেবতার মর্য্যাদা থাক বা না থাক ভারতবর্ষের পৌরাণিক নাটকে দেবদেবীর লীলা অপাংক্তেয় নহে। সুতরাং পৌরাণিক নাটকের বিচার করিতে গিয়া দেবতার সাকার লীলা দেখিয়া নাসিকা কুঞ্চন যিনি করিবেন, তিনি—রুচির দিক দিয়া যত আধুনিক হউন, সমালোচক হিসাবে গোড়ায় ভুল করিয়া বসিবেন। কারণ পৌরাণিক পরিবেশ স্বীকার করিয়া লইয়াই পৌরাণিক নাটক বিচার করিতে হইবে। যাঁহারা স্থিতধী সমালোচক তাঁহারা অবশ্য এ কথা স্বীকার করিবেন এবং করিলে দেখিতে পাইবেন যে বাংলা নাট্য সাহিত্যে যেমন অনেক মন্দ নাটক আছে তেমনি

অনেক ভাল নাটকও আছে। পৌরাণিক ঐতিহাসিক, সামাজিক, চরিত বাংলা নাটকের সব কক্ষেই ভাল-মন্দের সহিত দেখা হইবে। সর্ববিষয়ে উৎকৃষ্ট নাটক দুর্লভ এ বিষয়ে সন্দেহ নাই, কিন্তু উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি যে কিছু নাই এ কথা সত্য নহে। শেক্‌সপীয়র, ইবসেন 'বার্নার্ড শ, চেকভ্‌ প্রভৃতির মতো বড় নাট্যকার আমাদের দেশে নাই এ যত বড় সত্য কথা, তত বড় সত্য কথা এই যে, গিরিশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, ক্ষীরোদপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল প্রভৃতি এবং আধুনিক নাট্যকারগণের কেহ কেহ নাট্যকার হিসাবে নগণ্য নহেন। উপসংহারে আমার কামনা এই—অন্ধ ভক্তি এবং অন্ধ অভক্তি, দুইটি অভিশাপ হইতেই বাংলা নাট্য-সমালোচনা মুক্ত হউক। বাংলা নাটকের প্রতি অভক্তি ও অবজ্ঞা দেখাইবার আগে সমালোচকরা যদি বাংলা নাটকের সহিত একটু প্রত্যক্ষ পরিচয় রাখিতে চেষ্টা করেন তাহা হইলেই আনন্দিত হইব।

এই গ্রন্থ রচনাকালে অনেকেই অনেক ভাবে আমাকে সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে অধ্যক্ষ শ্রীপ্রশান্ত কুমার বসু, ভূতপূর্ব্ব রামতনু-অধ্যাপক ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য্য এবং অন্যান্য সহকর্মিদের কাছে আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক ডাঃ শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয় একটি 'মুখবন্ধ' লিখিয়া দিয়া আমাকে বিশেষভাবে অনুগৃহীত করিয়াছেন। তাঁহাকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি। নাট্যকার "বনফুল" গ্রন্থ ও নির্দেশাদি দিয়া যে সাহায্য করিয়াছেন তাহার জন্য তাঁহাকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। প্রেসিডেন্সী কলেজের অনুজোপম অধ্যাপক শ্রীদেবীপদ ভট্টাচার্য্য তাঁহার কলেজ লাইব্রেরী হইতে দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া দিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন, তাঁহাকেও আমি ধন্যবাদ জানাইতেছি। নিবেদন ইতি—

শ্রীসাধনকুমার ভট্টাচার্য্য

দিগ্বিজয়ী

নট-নাট্যকার যোগেশ চৌধুরী

নট-খ্যাতি এবং নাট্যকার-খ্যাতি একাধারে দুর্লভ সমাবেশ, উভয়ের প্রতি—স্পর্দ্ধা আরো দুর্লভ এবং দুইটিই যেখানে সমান প্রতিদ্বন্দ্বী সেখানে তো সোনায় সোহাগা। দুর্লভ সমাবেশের দৃষ্টান্ত হিসাবে আমরা, অন্যের মধ্যে, আমাদের গিরিশচন্দ্রের নাম করিতে পারি। তাঁহার নাম করিতেই বোধ হয় এই প্রশ্নই বড় আকারে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায়—নট-গিরিশ বড়, না নাট্যকার-গিরিশ বড়? বলা বাহুল্য, এ প্রশ্নের নির্ভুল উত্তর দেওয়া খুব সহজসাধ্য নহে। প্রতিভাসম্পন্ন প্রত্যেক নট-নাট্যকার সম্পর্কেই এই প্রশ্ন বা সমস্যা কম-বেশী আছে। নট-নাট্যকার যোগেশচন্দ্র সম্পর্কেও এই প্রশ্ন স্বাভাবিক সুতরাং প্রাথমিকও বটে।

যোগেশচন্দ্র শক্তিমান নট এবং নাট্যকার এ কথাটি বলার সঙ্গে সঙ্গে এই কথাটিও বলা দরকার যে নাট্যকার-যোগেশচন্দ্র অপেক্ষা নট-যোগেশচন্দ্র অধিকতর সুখ্যাত। 'যোগেশ চৌধুরী' এই নামটি কানে পৌঁছিতেই দশের মনে প্রথমেই যিনি উপস্থিত হন তিনি "নট-যোগেশচন্দ্র"—বিশেষতঃ অতি স্বাভাবিক—অভিনয়ে-দক্ষ অভিনয়-অভিমান—শূন্য, প্রথমশ্রেণীর অভিনেতা যোগেশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়, এবং পরে আসেন বহু-অভিনীত 'সীতা' প্রভৃতি নাটকের নাট্যকার যোগেশচন্দ্র। যোগেশচন্দ্রে নট ও নাট্যকারের প্রতিদ্বন্দ্বিতায়, নাট্যকার অপেক্ষা নটেরই জয় অধিক ঘোষিত হইয়াছে। সংক্ষেপে বলা যায়—নাট্যকার অপেক্ষা নটের খ্যাতি অধিক।

এই নট-যোগেশচন্দ্র সম্পর্কে জনৈক নাট্য-রসিক সমালোচক যাহা লিখিয়াছেন তাহা স্মরণীয়। তিনি লিখিয়াছেন—"যোগেশবাবু, মনোরঞ্জনবাবু এবং প্রভা তিনজনেই অল্পবিস্তর শিশিরবাবুর শিক্ষাধারায় প্রভাবান্বিত। যোগেশবাবু সকলকে অতিক্রম করিয়া একেবারে স্বাভাবিক অভিনয়ের ধারায় আসিয়া

পড়িয়াছেন। সামাজিক নাটকে এইরূপ স্বাভাবিক অভিনয়ই ছিল গিরিশচন্দ্রের বৈশিষ্ট্য। যোগেশবাবুর যদি অন্ততঃ অপরেশবাবুর মতও জলদগম্ভীর স্বর থাকিত, তবে সামাজিক নাটকে দানীবাবুর পরেই তাঁহার নাম সোল্লাসে ঘোষিত হইত" (ভারতীয় নাট্যমঞ্চ)। সামাজিক নাটকে দানীবাবুর পরে যাঁহার নামই সোল্লাসে ঘোষিত হউক, শিশিরবাবুকে সম্মুখে রাখিয়াও বলা যাইতে পারে যে স্বাভাবিক অভিনয়-রীতি যোগেশচন্দ্রের মধ্যে পূর্ণতর সম্ভাবনার স্তরে প্রবেশ করিয়াছে। একথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে শিশিরকুমারের অভিনয়ে নাটকীয়তার সহিত স্বাভাবিকতার এক চমৎকার সমন্বয় ঘটিয়াছে —বিশেষতঃ শিশিরকুমার যেন স্বাভাবিকতাকে নাটকীয়তার সহিত অন্তরঙ্গভাবে মিলাইয়া দিয়াছেন, কিন্তু একথাও সত্য শিশিরকুমারের অভিনয় একেবারে নাটকীয়তা—মুক্ত নয়, তাঁহার আঙ্গিক ও বাচনিক অভিনয়ে আভিনয়িকতার ছাপ সুস্পষ্ট। অন্তপক্ষে যোগেশচন্দ্র নাটকীয়তাকে স্বাভাবিকতার স্তরে নামাইয়া আনিয়াছেন; তাহাতে নাটকীয়তা ও স্বাভাবিকতা এমনভাবে মিশিয়া গিয়াছে যে যোগেশচন্দ্রের অভিনয় যেন নাটকীয়তাকে শুষিয়া লইয়া শুধু স্বাভাবিকতাকেই প্রতিফলিত করিতে থাকে। নাটক ও জীবনের ব্যবধান যোগেশচন্দ্রের অভিনয়ে প্রায় লোপ পাইয়াই গিয়াছে। স্বাভাবিক অভিনয়ে যোগেশচন্দ্র আরো এক ধাপ অগ্রসর। যোগেশচন্দ্র এখানে 'সহজিয়া'।

এই নাট্য-রসিকতা যোগেশচন্দ্রের জীবনে আগন্তুক কোন ব্যাপার নহে। যোগেশচন্দ্রের পরিবেশ এবং সেই পরিবেশের সহিত তাঁহার যোগাযোগ বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলেই আমরা নাট্যরসিকতার ইতিহাস এবং সঙ্গে সঙ্গে যোগেশচন্দ্রের নাট্যকার-মানসের গঠনটিও মোটামুটি ধরিতে পারিব।

বংশ পরিচয়

'রূপমঞ্চ' পত্রিকার ১৩৫৫-৫৬ চৈত্র-বৈশাখ সংখ্যায় যোগেশচন্দ্রের ভ্রাতা "শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ততীর্থের সক্রিয় সহযোগিতায়

সংগৃহীত" তথ্য হইতে জানা যায়—"২৪ পরগণার বসিরহাট মহকুমার অন্তর্গত 'চারঘাট' নামক একটি গণ্ডগ্রামে আজ হইতে প্রায় ষাট বৎসর পূর্ব্বে যোগেশচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা স্বর্গীয় বিরাজমোহন চৌধুরী, মাতা স্বর্গীয়া বীরেশ্বরী দেবী।" অতি শৈশবে পিতৃহীন হইলেও, পিতার প্রতিভা-সত্তাটি, মনে হয়, তাঁহার সম্মুখেই ছিল। পিতা বিরাজমোহন ছাত্রজীবনে শুধু ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখ খ্যাতনামাদের সান্নিধ্য ও সহযোগিতাই লাভ করেন নাই, ঈশ্বরচন্দ্রের প্রভাবে তিনি "বঙ্গ-বিধবা" নামক একখানি নাটিকাও রচনা করিয়াছিলেন এবং বন্ধু-বান্ধবে মিলিয়া বহরমপুরে অভিনয়ও করিয়াছিলেন। যোগেশচন্দ্রের নাট্যরসিকতা এই হিসাবে একরকম পৈতৃকই বলা যাইতে পারে। অভিনয়-রসের আস্বাদ তিনি কৈশোরেই পাইয়াছিলেন। জানা যায়—"যোগেশচন্দ্র যখন নবম শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন, তখন তাঁহার রচিত "সীতার বনবাস" নামক একখানি ক্ষুদ্র নাটিকা তাঁহার জননী ক্রোধে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছিলেন। যোগেশচন্দের ভগিনীপতির চেষ্টায় গ্রামে ইতর ভদ্র মিলিয়া একটি যাত্রার দল গড়িয়া তুলিয়াছিল। যোগেশচন্দ্র যখন প্রবেশিকার ছাত্র, তখন হইতেই তিনি ইহার প্রতি অনুরাগী হইয়াছিলেন। কয়েকবার এই দলে তিনি তাঁহার ভগিনীপতির আগ্রহে অতি প্রশংসিত ভাবে "জনার" চরিত্র অভিনয় করেন।" নট-নাট্যকারের পত্তন এখানেই।

শিক্ষা দীক্ষা

গ্রাম্য পাঠশালার পাঠ শেষ করিয়া তিনি "টাকীর নিকটবর্ত্তী বেগুকাঁটী গ্রামে তাঁহার এক পিসিমাতার গৃহে অবস্থান করিয়া টাকী গভর্ণমেণ্ট স্কুলে অধ্যয়ন করেন।"—(প্রফুল্ল বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত "যোগেশচন্দ্র")

১৯০৮ সালে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। কলিকাতায় আসিয়া বা থাকিয়া কলেজীয় শিক্ষা গ্রহণ করিবার মত তাঁহাদের আর্থিক সঙ্গতি ছিল না বটে, কিন্তু যাহা থাকিলে আর্থিক অসঙ্গতির বাধা অতিক্রম করা

বার যোগেশচন্দ্রের তাহাই ছিল প্রচুর—ছিল অসাধারণ শিক্ষানুরাগ ও অধ্যবসায়। "নিজের চেষ্টায় কলিকাতায় আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করিয়া মেট্রোপলিটান কলেজে এফ. এ. পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে থাকেন"—(সুরেশচন্দ্র)। কিন্তু, সাহিত্যের কামড়ই শুধু কচ্ছপের কামড় নহে, বাতিকমাত্রই কচ্ছপের কামড়—একবার ধরিলে সহসা ছাড়িতে চাহে না। যোগেশচন্দ্রের ছিল—নাট্য-বাতিক। "তখন বাংলার রঙ্গমঞ্চ একদিকে গিরিশচন্দ্রের ও অন্যদিকে দ্বিজেন্দ্রলাল—এই দুই মহারথীর প্রতিভায় উদ্দীপিত।...ইহাদিগের সহিত পরিচয়কে ঘনিষ্ঠতর করিবার জন্য তিনি প্রতি রবিবারেই পড়াশুনার ক্ষতি করিয়াও তাঁহাদিগের সান্নিধ্যে কাটাইতেন। এজন্য গিরিশ পরিবারের সহিত তাঁহার পরবর্তী জীবনে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ঘটে "(সুরেশচন্দ্র)"। কিন্তু রঙ্গমঞ্চের সহিত ঘনিষ্ঠতা করিতে যাইয়া, যোগেশচন্দ্র পরীক্ষা-পাশের দিক হইতে একটু দূরে সরিয়া গেলেন—এফ. এ. পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইলেন এবং অগত্যা—"সাংসারিক অসচ্ছলতায় জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রতিষ্ঠিত মেট্রোপলিটান বিদ্যালয়ের বড়বাজার শাখার শিক্ষকরূপে যোগদান করেন" (সুরেশচন্দ্র)।

শিক্ষক যোগেশচন্দ্রের নাট্য-রচনা

তবে কচ্ছপ ঠিক কামড়াইয়া ধরিয়াই ছিল নাট্যরচনার ঝোঁক সমানই ছিল। "স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলালের অনুসরণে বাঙ্গালীর নবজাগ্রত জাতীয়তাকে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য যোগেশচন্দ্র "রাজস্থান" হইতে গল্পাংশ সংগ্রহ করিয়া কয়েকখানি নাট্য রচনা করেন। আশা ছিল তাঁহার এই রচনাগুলি দানিবাবুর প্রভাবেই বাঙ্গলার রঙ্গমঞ্চে প্রবেশাধিকার লাভ করিতে পারিবে। কিন্তু সে আশা তাঁহার সফল হয় নাই" (সুরেশচন্দ্র)।

তবে, আশা ছাড়িবার পাত্র তিনি ছিলেন না। শরীর পাত করিয়াও তিনি মন্ত্রের সাধন করিতেছিলেন। তাঁহার নাট্যরচনার বিরাম ছিল না।

প্রবন্ধকার

ইতিমধ্যে যোগেশচন্দ্র গিরিশচন্দ্রের সামাজিক নাটকের উপর প্রবন্ধ লিখিয়া "বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ" হইতে শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধের জন্য স্বর্ণপদক লাভ করেন এবং 'বসিরহাট সাহিত্য সম্মেলন' হইতে সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধ লিখিয়া শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করিয়া, একশত টাকা পুরস্কার প্রাপ্ত হন। এইভাবে প্রবন্ধকার-খ্যাতি লাভ করিয়া, যোগেশচন্দ্র "তত্ত্ববোধিনী"-পত্রিকাগোষ্ঠীর সহিত পরিচিত হইলেন এবং "তত্ত্ববোধিনী" পত্রিকায় বহুদিন ধরিয়া যোগেশচন্দ্রের সাহিত্যবিষয়ক নানা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় "।

"এই সময় যোগেশচন্দ্র তাঁহার পুরাতন কর্ম্মক্ষেত্র "মেট্রোপলিটান স্কুল" পরিত্যাগ করিয়া কর্পোরেশন ষ্ট্রীটস্থিত বর্ত্তমান সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রোডে 'ওরিয়েন্টাল ট্রেনিং একাডেমিতে' বাংলা ভাষার প্রধান শিক্ষকের পদে যোগদান করেন। (সুরেশচন্দ্র)। এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন—তাঁহার অভিন্নহৃদয় বন্ধু শ্রীনগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়। উভয়ে দীর্ঘকাল এক কক্ষে একত্র বাস করিয়াছিলেন। এবং একে অন্যের প্রেরণা-স্বরূপ ছিলেন। আগুনের পক্ষে যেমন বাতাস লেখকের পক্ষে তেমনি সমজদার শ্রোতা এবং উৎসাহদাতা। নগেন্দ্রনাথ যোগেশচন্দ্রের প্রতিভা-আগুনে উৎসাহ-বাতাস অবিরাম যোগাইতেন।

*"এইখানে থাকিয়াই তিনি তাঁহার শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক নাটক "নাদিরসাহ" রচনা করেন"।

অসহযোগ আন্দোলনে

কিন্তু সংসার তাহার কর আদায় করিবেই—একচক্ষু হরিণ কখনই নিষ্কৃতি পায় নাই। পরিবার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দারিদ্র্যের চাপ যোগেশচন্দ্রের জীবনে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিতে লাগিল—নৈরাশ্য ও অবসাদ যোগেশচন্দ্রের মনকে অষ্টেপৃষ্ঠে ঘিরিয়া ধরিল।

যোগেশচন্দ্র শিক্ষকতার বদলে জমিদারী সেরেস্তার কর্মচারীর শান্তিময় জীবন

খুঁজিতেছিলেন। প্রাণের আগুন কি অত সামান্ত শান্তিবারিতে শান্ত হয়? অসহযোগ আন্দোলনের ঢেউ আসিতেই যোগেশচন্দ্র তাহাতে ঝাঁপ দিলেন। "সংসারী যোগেশচন্দ্র অকস্মাৎ দুঃসাহসী বীরের মত চাকুরির পত্রচ্ছায়া পদদলিত করিয়া বৈচিত্র্যের আশায় অসহযোগী হইয়া সহর ছাড়িয়া তাঁহার জন্মভূমিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখানে আসিয়া তিনি একদল মুসলমান কারিগরের সহায়তায় মোটা সুতার দেশী কাপড় তৈয়ারী করিতে মাতিয়া উঠিলেন।" বস্তুতঃ এই অসহযোগ তো শুধু ব্রিটিশের সহিত অসহযোগে সীমাবদ্ধ থাকিল না, সংসারেরও সহিত অসহযোগ হইয়া উঠিল। দারিদ্র্যের ক্লেশ অসহ্য ও শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইল। নাট্য-রসিকের প্রাণ সূতা কাটিয়া বা বেচিয়া তৃপ্তি পাইবে—এ আশাই অন্যায়।

অধ্যাপক শিশির ভাদুড়ী মহাশয়ের আনুকূল্য

এই বিপন্ন প্রতিভাকে প্রকৃতিস্থ করিতে যিনি অগ্রসর হইলেন তিনি নিজেও অসাধারণ নট-প্রতিভার অধিকারী—অধ্যাপক শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী এম, এ মহাশয়। কোন এক দূর আত্মীয়ের (সুধাবাবুর) গৃহে দুইজনের পরিচয় হইয়াছিল। অধ্যাপক থাকা কালেই শিশিরবাবু যোগেশচন্দ্রের নিজের মুখেই 'নাদিরশাহ' নাটকখানি শুনিয়াছিলেন এবং বোধ হয় তখনই যোগেশচন্দ্রের মধ্যে এক নট-নাট্যকারের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া প্রীত হইয়াছিলেন। তারপর ১৯২১ সালে—বেঙ্গল থিয়েট্রিকাল কোম্পানী'র (ম্যাডান থিয়েটার কোম্পানী'র বাঙ্গলা শাখা) মঞ্চে, ১০ই ডিসেম্বর নাট্য-রসিক শিশিরবাবু আলমগীরের ভূমিকায় প্রথম অবতীর্ণ হইয়া যে নবযুগের সূচনা করিলেন তাহারই উদার আকাশে যোগেশচন্দ্রের প্রতিভা আত্মবিকাশের সুযোগ লাভ করিল। শিশিরবাবু ম্যাডান কোম্পানীর সহিত সম্পর্ক বেশী দিন রাখিতে পারেন নাই। ফলে "শিশিরকুমার তখন ম্যাডান কোম্পানীর চাকুরী ছাড়িয়া দিয়া তাজমহল ফিল্ম কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা করিতে উদ্যুক্ত হইয়াছেন। এই সুযোগে খদ্দরের

ব্যবসায়ে, বিপন্ন যোগেশচন্দ্রকে তাঁহার পল্লীগৃহ হইতে আপনার পার্শ্বে আনয়ন করেন।"

'সীতা নাটকের রচনা ও অভিনয়

যোগেশচন্দ্রের নট-জীবনে প্রথম পদক্ষেপ—শরৎচন্দ্রের "আঁধারে আলো"র নির্বাকচিত্রে দেওয়ানের একটি ক্ষুদ্র ভূমিকায়। তথনও যোগেশচন্দ্র রঙ্গমঞ্চের পাদপ্রদীপের সম্মুখে দাঁড়ান নাই। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে বড়দিনের প্রদর্শনীতে (ইডেন গার্ডেনে) শিশির ভাদুড়ী প্রযোজিত দ্বিজেন্দ্রলালের "সীতা" অভিনয়ে তিনি অংশ গ্রহণ করেন নাই বটে, কিন্তু তিনি শিশির সম্প্রদায়ের একজন হিসাবে সঙ্গে সঙ্গেই ছিলেন। কে জানিত তখন যে এই 'সীতা'র পাশেই, শেষ পর্য্যন্ত তাঁহাকেই "সীতা" মূর্ত্তি নির্মাণ করিয়া স্থাপনা করিতে হইবে। ঘটনা এমনি একটি ধারা ধরিয়াই অগ্রসর হইল। শিশিরবাবু মনোমোহন পাঁড়ের নিকট হইতে মনোমোহন থিয়েটার-বাড়ী ভাড়া লইয়া 'মনোমোহন নাট্যমন্দিরে'র প্রতিষ্ঠা করিলেন। লেসি ও প্রযোজক শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী মহাশয় দ্বিজেন্দ্র-লালের 'সীতা' লইয়া দর্শকদিগকে অভিবাদন করিতে সঙ্কল্পিত ছিলেন; কিন্তু প্রতিপক্ষের বাধায় সঙ্কল্পের পরিবর্ত্তন করিতে হইল। নাট্যকার যোগেশচন্দ্রের সুবর্ণ সুযোগ বা পরীক্ষা উপস্থিত হইল। অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই [সুরেশচন্দ্র বলেন ৭ দিনের মধ্যে, প্রফুল্ল বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন ১৫ দিনের মধ্যে] যোগেশচন্দ্রকে "সীতা" নাটক রচনা করিতে হইল। ৬ই আগষ্ট মনোমোহন নাট্য-মন্দিরে সীতা অভিনীত হইল। শিশিরবাবুর "রাম"-এর ভূমিকায় অভিনয় যত স্মরণীয় হইল, তত সুখ্যাত হইলেন—সীতা নাটকের নাট্যকার যোগেশচন্দ্র চৌধুরী। বাঙ্গালীর কাছে সেইদিন হইতেই যোগেশচন্দ্রের অন্যতম পরিচয়—'সীতা'র নাট্যকার। সীতা নাটক আজও বাঙ্গলা রঙ্গমঞ্চের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ —(বিশেষতঃ শিশিরবাবু যখন রামের ভূমিকায়)। "সীতা"'র সহিত বাঙলা রঙ্গমঞ্চের অনেক গৌরব-স্মৃতি যুক্ত হইয়া আছে—আসল 'সীতা'র পাতাল প্রবেশ

এক অর্থে দুর্ভাগ্যেরই বিষয়, কিন্তু "সীতা"র আমেরিকার নিউইয়র্ক মহানগরীতে আমন্ত্রণ ও পরিবেষণ (পাতাল প্রবেশ) এক মহাগৌরবের নিদর্শন। অন্য কোন সীতার বা নাটকের ভাগ্যে এ সৌভাগ্য ঘটে নাই। * [নাট্যকার—শম্বুকের ভূমিকায় অবতীর্ণ]।

সীতার অভিনয় দীর্ঘকাল ধরিয়া চলিয়াছিল—অভিনয়ের তারিখ ৬ই আগষ্ট ১৯২৪ হইতে পরবর্ত্তী নাটকের অভিনয় তারিখ—১৩ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ৪ মাসের ব্যবধান। "সীতা"র পরে ধরা হইল দ্বিজেন্দ্রলালের "পাষাণী"। ১৯২৫—মনোমোহন নাট্যমন্দিরে নূতন নাটক অভিনীত হয়—"জনা" (৩রা জুন) * [বিদূষকের ভূমিকায় যোগেশচন্দ্র] এবং পুণ্ডরীক—১৩ই আগষ্ট—১৯২৬ **খ্রীষ্টাব্দে—"নাট্যমন্দির" প্রতিষ্ঠিত হইল** এবং ২৬শে জুন রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জ্জন' লইয়া উহার উদ্বোধন হইল। ১৫ই আগষ্ট 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস' অভিনয়ে যোগেশচন্দ্র যুধিষ্ঠির হইলেন। * ১লা ডিসেম্বর ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের "নরনারায়ণ" অভিনীত হইল—যুধিষ্ঠিরের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইলেন যোগেশচন্দ্র। ১৯২৭ খ্রীঃ—নাট্যমন্দিরে শরৎ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের 'ষোড়শীর' অভিনয়ে (৬ই আগষ্ট) যোগেশচন্দ্র জনার্দ্দন রায়ের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন "শেষরক্ষায়" (৭ই সেপ্টেম্বর) সাজিয়াছিলেন—'নিবারণ'।

'দিগ্বিজয়ী'-র রচনা ও অভিনয়

'সীতা' হইতে দিগ্বিজয়ী—পুরো চার বছরের ব্যবধান। তবু এ পর্য্যন্ত নাদিরশাহের কোন গতি হয় নাই, অথচ সীতা রচনার অনেক আগে 'নাদিরশাহ' রচিত। এই নাটকখানি, তাঁহার অভিন্নহৃদয় বন্ধু প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে একত্রে যখন ওরিয়েন্টাল ট্রেণিং একাডেমি শিক্ষা ভবনে বাস করিতেছিলেন, তখনই রচনা করিয়াছিলেন। নগেন্দ্রনাথ বলেন—যোগেশচন্দ্র একদিনে এক একটি দৃশ্য রাত্রি জাগিয়া লিখিতেন এবং তাঁহার শয্যাসঙ্গী বন্ধুটিকে অকালে জাগাইয়া না শুনাইলে তিনি খুশী হইতেন না।

এইরূপে নাটকখানি সীতার বহু পূর্ব্বেই যোগেশচন্দ্রের শিক্ষকতা জীবনে রচিত" (সুরেশচন্দ্র)। বলা বাহুল্য—দিগ্বিজয়ী 'নাদিরশাহ' নাটকেরই সুসংস্কৃত রূপ।

কিন্তু, দিগ্বিজয়ী নাটকের 'উৎসর্গ'-পত্রে, নাট্যকার—'নাট্যজগতে দিগ্বিজয়ী' বন্ধুবর শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী মহাশয়কে যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে একটু খট্‌কা লাগিতে পারে। লিখিয়াছেন—"শিশিরবাবু, এ নাটক আপনিই লিখতে ব'লেছিলেন ; নাম করণেও আপনার ইঙ্গিত ছিল"। কথা শুনিয়া অবশ্যই মনে হইতে পারে যে শিশিরবাবু বলার পরেই যোগেশবাবু যেন নাটকখানি রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। 'দিগ্বিজয়ী' নামকরণেও শিশিরবাবুর নির্দ্দেশ ছিল। নাদিরশাহ নাটক আমরা পাই নাই, সুতরাং উহার রূপ-রস সম্পর্কে কিছুই জানি না। তবে দিগ্বিজয়ীর রূপ-রস যে অনেক পরিমাণে শিশিরকুমারের পরিকল্পনা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

তারপর, নামটি 'নাদিরশাহ' না করিবার মূলে আর যে কারণই থাকুক—১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত, বরদাপ্রসন্ন দাসগুপ্ত—রচিত "নাদিরশাহ" নাটকখানির প্রতিক্রিয়াও একটু ছিল বলিয়া মনে হয়। আর মনে হয়—নামকরণের মূলে আছে অধ্যাপক শিশিরকুমার ভাদুড়ী মহাশয়ের সেই মননশীল মনটি, যে মনে 'নাদিরশাহ' কথাটি প্রবেশ করিতেই একটি জীবনদর্শনের ভাবাদর্শ, super-man এর philosophy জাগিয়া উঠিয়াছিল—তৈমুরলঙ্, জুলিয়াস সিজার, নেপোলিয়ন প্রভৃতি উচ্চশির দিগ্বিজয়ীদের "Vaulting amibition"—ও উহার শোচনীয় পরিণতির কথা উদিত হইয়াছিল।

দিগ্বিজয়ীর প্রথম অভিনয়—নাট্যমন্দিরে শুক্রবার, ২৮শে অগ্রহায়ণ ১৩৩৫ ; (ইংরেজী—১৪ই ডিসেম্বর ১৯২৮)। শিশিরকুমারের অভিনয় স্পর্শে নাটকখানি তখনকার একটি শ্রেষ্ঠ আকর্ষণে পরিণত হইয়াছিল। নাট্যকারও অকপটে স্বীকার করিয়াছেন—"অভিনয়ের দিক দিয়া নাটকখানির (ঐতিহাসিক, ব্যক্তিগত, জাতিগত এবং ভাবগত) সমগ্ররূপই শিশিরকুমারের পরিকল্পনা। অবাস্তবভাব অর্থাৎ Airy nothing-কে কি করিয়া রূপে-রসে-রঙে মূর্ত্ত ও

মহামায়ার চর	মৃত্যুঞ্জয়	১৯৩৯
পরিণীতা	শ্রীপতি	১৯৪১
দুই পুরুষ	শিবনারায়ণ	১৯৪২

*রূপমঞ্চের 'সুরেশচন্দ্রের সক্রিয় সহযোগিতা সংগৃহীত' তালিকা এইরূপ :—

[আলমগীর—রামসিংহ, তপতী—দেবদত্ত, সাজাহান—দিলদার, সুজা; বিল্বমঙ্গল—সাধক, রমা—গোবিন্দ গাঙ্গুলী, বেণী; সধবার একাদশী—ঘটিরাম ডেপুটি, বলিদান—রূপচাঁদ, করুণাময়; প্রফুল্ল—যোগেশ, মদন ঘোষ; চন্দ্রগুপ্ত—কাত্যায়ন, বাচাল; ষোড়শী—এককড়ি; জনার্দ্দন, মহামায়ার চর—মৃত্যুঞ্জয়; নন্দরাণীর সংসার—পরেশ চৌধুরী, মহিমারঞ্জন; প্রতাপাদিত্য—বিক্রমাদিত্য, বসন্ত রায়; মহানিশা—রাধিকাপ্রসন্ন; পরিণীতা—শ্রীপতি; মুক্তির উপায়—ফকিরচাঁদ; সীতা—শম্বুক, বাল্মীকি; চন্দ্রশেখর—শ্রীনাথ; দুই পুরুষ—শিব নারায়ণ; বাংলার মেয়ে—উপেন্দ্রনাথ; পথের সাথী—বসন্ত সেন; মানময়ী গার্লস স্কুল—দামোদর, চরিত্রহীন—শিবপ্রসাদ; দিগ্বিজয়ী—আলি আকবর; পথের শেষে—দুর্গাশংকর; মেঘমুক্তি—প্রোঃ ঘোষ; মাটির ঘর—সত্যপ্রসন্ন] * আর একটি তালিকায় দুই চারখানি নাটকের নাম বেশী পাওয়া যায়।

যেমন—[রঘুবীর—সখারাম; সর্ব্বহারা—শ্যামল; গৈরিক পতাকা—রামদাস স্বামী; কমলাকান্ত—কমলাকান্ত; স্বামী-স্ত্রী—মিঃ দাস; সরলা—গদাধর; চিরকুমার সভা—রসিক; কর্ণার্জ্জুন—ভীষ্ম; গৃহলক্ষ্মী—উপেন্দ্র; শাস্তি কি শান্তি—উপেন্দ্র; পোষ্যপুত্র—রজনীনাথ; মন্ত্রশক্তি—রমাবল্লভ; সাবিত্রী—অশ্বপতি; বিদ্রোহী বাঙালী—চিন্তাহরি; মেবারপতন—সগর সিংহ।

এ তালিকা সম্পূর্ণ বলিয়া দাবী করিবার স্পর্দ্ধা আমার নাই...মঞ্চে ও পর্দ্দায় যোগেশচন্দ্র বহু ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছেন। ভূমিকার সম্পূর্ণ তালিকা দেওয়ার মত তথ্য আমার হাতের কাছে না থাকায় দিতে পারিলাম না]

যোগেশচন্দ্রের নাট্যকার প্রতিভা

ইচ্ছা, জ্ঞান ক্রিয়া বিনা না হয় সৃজন
তিনের তিন শক্তি মেলি প্রপঞ্চ রচন। —(চৈতন্য চরিতামৃত)

প্রতিভা মানুষের স্বাভাবিক শক্তিরই বিশেষ বিকাশ—জ্ঞান কল্পনা ও কর্ম শক্তিরই বিশেষ সংযোগ ও অভিব্যক্তি। এমন কোন মানুষ নাই, থাকা-সম্ভবও নহে—যাহার মধ্যে জ্ঞানবৃত্তি, অনুভববৃত্তি, কল্পনাবৃত্তি এবং কর্মবৃত্তির ক্রিয়া একেবারেই অসৎ। প্রকাশের আবেগ জীবনের আবেগের সহিত এক হইয়া মিশিয়া আছে—যেখানে জীবন সেখানেই "কর্ম" (willing) সেখানেই—অনুভব (feeling) এবং সেখানেই জ্ঞান (knowing)। কিন্তু ইহা "সামান্য" সত্য। বিশেষ সত্য এই যে প্রত্যেক 'সামান্য'ই বহু বিশেষ লইয়া গঠিত এবং প্রত্যেক 'বিশেষ' একে অন্য হইতে স্বতন্ত্র---প্রত্যেকেই বিশিষ্ট। প্রত্যেক মানুষ জগৎকে জানে, অনুভব করে এবং কর্মে প্রবৃত্ত হয়—ইহা সাধারণ সত্য, কিন্তু বিশেষ সত্য এই, প্রত্যেকের জ্ঞান অনুভব কর্মের শক্তি ও প্রকৃতি সমান নহে। কবি বা শিল্পী যাঁহারা, তাঁহারা এই জ্ঞান-প্রেম-কর্মের বিশেষ শক্তির অধিকারী তথা "নব নব উন্মেষশালিনী বুদ্ধির" অধিকারী। তবে এখানেও পার্থক্য আছে। সব কবি-প্রতিভা সমান নহে। একের সহিত অন্যের যে শক্তি-গত পার্থক্য দেখা যায়, তাহার কারণ বা উৎস খুঁজিতে বাহির হইলে দেখা যাইবে—একের সহিত অপরের যে পার্থক্য তাহা জ্ঞান-অনুভব-ইচ্ছা শক্তিরই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার একটা পরিণতির—নব নব উন্মেষশালিনী বুদ্ধি শক্তিরই তারতম্যের ফল॥ এই বুদ্ধি ব্যাপারটি খুবই জটিল। ইহার মধ্যে আছে "জ্ঞানের" অভিজ্ঞতা, স্মৃতির ধারণা, অনুভবের আবেগ ও কল্পনা এবং "ইচ্ছার" বাসনা—এই সমস্ত কিছুর সহায়তায়, নব নব উন্মেষে বুদ্ধি আপনাকে ব্যক্ত করিতে সক্ষম হয়। যাহাকে আমরা সাধারণত **কবি-মানস** বলিয়া থাকি তাহা কবি চিত্তের এই জ্ঞান-অনুভব-ইচ্ছা শক্তির বিশেষ সংগঠন—প্রকাশ সম্ভাবনা। ইহা অবশ্য স্থায়ী কোনো কিছু নহে, পরিবর্ত্তনশীল।

সাধারণতঃ ইচ্ছাশক্তি বাসনারূপে নিয়ন্ত্রিত করে বিষয়বস্তু নির্ব্বাচন—ঘটনা বা চরিত্রের পরিণাম; আর জ্ঞান-অনুভবে প্রকাশ পায়—জীবন-সমালোচনায় এবং জীবনের সহিত জীবন যোগ করার সামর্থ্য। বস্তুত কবি প্রতিভার বিচার, শেষ পর্য্যন্ত কবির 'জীবন সমালোচনা'—বৈশিষ্ট্যের এবং 'জীবনের রূপ' সৃষ্টির সামর্থ্যের বিচার। বিষয়বস্তু নির্ব্বাচনের মধ্যে শিল্পীর বাসনার বা অভিযোজন ভঙ্গীর প্রথম পরিচয় পাওয়া যায়। এমনকি বাহ্য প্রেরণায় কবি যেখানে ভিন্ন বিষয়বস্তু নির্ব্বাচনে বাধ্য হন সেখানেও কবির জীবন-সমালোচনার বৈশিষ্ট্য প্রকাশ না পাইয়া যায় না। এ কথা খুবই সত্য—"a writer is hardly likely to concern himself with a story or a character unless these have some meaning to him and seem important in his general experience of life. We do not pick our favourite stories of any kind, any more than we pick our favourite historical personages or our preoccupying abstractions, by chance. We pick them because they represent aspects of experience which, however submerged the connection, are relevant to our own experience" [Drama from Ibsen to Eliot— (1952) By Raymond Williams.] অবশ্য শুধু বিষয়বস্তু নির্ব্বাচনের মধ্যেই মনোভঙ্গীর সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় না; সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়…চরিত্রসৃষ্টির মধ্যে—বিশেষতঃ পরিণতির মধ্যে। তবে নাট্যকার-প্রতিভার ইহা একদিক মাত্র। প্রতিভার রূপদক্ষতার দিক—প্রকাশ পায় রূপায়ন-শক্তির মধ্যে—সংগঠনে বা ঘটনা বিন্যাসে চরিত্র-সৃষ্টিতে—ভাবোদ্দীপকতায় বা রস-পরিণতিতে। নাট্যকার-প্রতিভা নির্দ্ধারণ করিবার সময় এই কথাটি অবশ্যই মনে রাখা দরকার—নাটক জীবনেরই দৃশ্য কল্প-রূপ। সুতরাং জীবনের রূপ-রসের আস্বাদ সৃষ্টির ক্ষমতা যাঁহার যত বেশী তিনি তত বড় নাট্যকার;—যে নাটকে জীবনের রূপগত এবং রসগত মায়াঘোর (illusion) যত কম বা যত ব্যাহত, তাহা তত হেয় বা তত লঘু। কারণ সৌন্দর্য্য সেখানেই প্রমূর্ত্ত, যেখানে ভাব ও রূপের মধ্যে বাগর্থের মত সম্পৃক্তি

বিরাজ করে।—[(beauty is the unity of the idea and the image, the complete merging of the idea with the image) Vischer—হেগেলপন্থী শিল্পবিজ্ঞানীর—উক্তি, এন্. জি চেরনিশেভস্কির Aesthetic Relation of Art to Reality হইতে উদ্ধৃত]

স্রষ্টা যোগেশচন্দ্র

যোগেশচন্দ্রের নাট্যকার-প্রতিভার বা সৃষ্টির সংখ্যাগত হিসাবের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় যে—নাট্যকার—মোট ১৪ খানি নাটক রচনা করিয়াছেন এবং উহাদের মধ্যে ৯ খানি মৌলিক রচনা এবং ৫ খানি উপন্যাসের নাট্যরূপ। **মৌলিক রচনা—৯ খানি**...(১) সীতা, (২) দিগ্বিজয়ী (৩) বিষ্ণুপ্রিয়া (৪) পূর্ণিমামিলন (৫) রাবণ (৬) নন্দরাণীর সংসার (৭) মাকড়সার জাল (৮) মহামায়ার চর (৯) পরিণীতা। তবে এই মৌলিকদের মধ্যেও কয়েকখানি আবার বিদেশী নাটকের ছায়া-অবলম্বনে রচিত অর্থাৎ ভঙ্গ যেমন (ক) পূর্ণিমা-মিলন—"সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী নাট্যকার মলিয়রের 'School for husbands' নামক—নাটক অবলম্বনে রচিত (খ) মহামায়ার চর—'নাটকখানির গল্পাংশ একখানি সুবিখ্যাত ইংরাজী নাটক হইতে গৃহীত'' (নাট্যকার)॥ সুতরাং সীতা (রামায়ণ), দিগ্বিজয়ী (ইতিহাস), বিষ্ণুপ্রিয়া (চৈতন্য-জীবনী) রাবণ (রামায়ণ) বাদ দিলে খাঁটি মৌলিক থাকে (১) নন্দরানীর সংসার (২) মাকড়সার জাল (৩) পরিণীতা। যাহা হউক যোগেশচন্দ্রের নাট্যকার-প্রতিভা নির্দ্ধারণ করিবার সময় আমাদের উল্লিখিত নয়খানি নাটকই সম্মুখে রাখিয়া চলিতে হইবে। প্রথমতঃ যোগেশচন্দ্রের নাটকগুলির বিচারাত্মক সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যাউক।

(১) **সীতা**। সীতা রচনার ইতিহাস আগেই উল্লেখ করা হইয়াছে নাট্যকার নিজেও স্বীকার করিয়াছেন—"স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয়ের সীতা আমার চোখের সামনে অনেকবার অভিনীত হ'য়েছিল। সে নাটকের

অনেকগুলি চিত্র ও চরিত্র আমার সমস্ত কল্পনাকে একেবারে আচ্ছন্ন করেছিল ; সেজন্য আমার এই সীতা নাটকের কোন কোন জায়গায় স্বর্গীয় রায় মহাশয়ের নাটকের একটু আধটু ছায়া পড়তে পারে—তবে আমি দ্বিজেন্দ্রলালের প্রভাব অতিক্রম করার যথেষ্ট চেষ্টা পেয়েছি।"

বাহ্য প্রেরণার তাগিদে নাট্যকার 'সীতা' কাহিনী অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু রূপায়নের প্রকৃতি, তাঁহার অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর জীবনদর্শনের স্পর্শে, অনেক পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল। সীতা-নাটকে রামের জীবনকে সমাজ-সত্য ও ব্যক্তি-সত্যের জটিল এক দ্বন্দ্ব-ক্ষেত্রে পরিণত করা হইয়াছে। সমাজ-সত্যের (General-will) সহিত দ্বন্দ্বে ব্যক্তি-সত্তার (Individual-will) যে ট্র্যাজেডি, সেই ট্র্যাজেডিকেই রূপ দেওয়া হইয়াছে। নাট্যকার রাম-চরিত্রের মাধ্যমে 'ধর্ম্ম'কে শাস্ত্রবিধির আওতা হইতে মুক্ত করিয়া "হৃদয়ের অনুশাসনে" পরিণত করিতে অর্থাৎ ব্যক্তিকেন্দ্রিক করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, সত্যের প্রমাণ শাস্ত্রে না খুঁজিয়া মর্ম্মে খুঁজিয়া দেখিবার কথা বলিয়াছেন। নাটকে, সমাজবিধির সঙ্গে দ্বন্দ্বে রামের হৃদয়-ধর্ম্মের পরাজয় দেখানো হইয়াছে, ফলে নাটকখানি বিয়োগান্ত নাটকে পরিণত হইয়াছে বটে কিন্তু যে পক্ষের পরাজয় ঘটিয়াছে, লোকচিত্তে সেই পক্ষই যেন যথার্থভাবে জয় লাভ করিয়াছে। রাম অকুণ্ঠচিত্তে ঘোষণা করিয়াছেন—"হৃদয়ের ধর্ম ছাড়া, অন্য ধর্ম মানিতে নারিব, প্রভু।"......"রাজ্য নাহি চাই, সহস্র সাম্রাজ্য হ'তে, রাজার কর্ত্তব্য হ'তে শ্রেষ্ঠতর জানকীর প্রেম"

রামের সংশয়ী প্রশ্নে—"কে বলিবে ?

শাস্ত্রের বচন সত্য—কিম্বা সত্য
এই মোর মর্ম্মভাঙ্গা—
মর্ম্মের কাহিনী !

বাল্মীকির উচ্চ ঘোষণা—"বৎস,

মর্ম্মের কাহিনী।

মর্ম্ম যারে সত্য বলি দেয়
দেখাইয়া সেই সত্য, অন্য সত্য নাই।"

মর্মের সহিত ধর্মের দ্বন্দ্বে মর্মকেই বড় স্থান দিয়াছে॥ রাম স্পষ্টভাবেই ঘোষণা করিয়াছেন—"রাজধর্ম ডুবুক অতল জলে—
হৃদয়ের ধর্ম সনে
যদি তার না হয় মিলন
হৃদয়ের উপবাস—
আর আমি সহিতে না পারি॥"

সীতা নাটকে নাট্যকার জটিল এক সামাজিক সমস্যাকে পুরাতন একটি কাহিনীর সাহায্যে আলোচনা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন—যে বিধি বিধানের ফলে ব্যক্তি-হৃদয় দলিত মথিত হয়—হৃদয় শুকাইয়া মরে, সই সমাজ-বিধির কাছে আত্মসমর্পণ করিলে সমাজ—ধর্ম রক্ষা পায় বটে কিন্তু প্রকৃত ধর্ম রক্ষা পায় কি? মর্ম বড় না লোকধর্ম বড়? সত্য কোথায়? শাস্ত্রে না মনে? যেখানে ধর্মের সঙ্গে মর্মের এত বড় বিরোধ, সেখানে আত্মার চরম সঙ্কট—শ্রেয় প্রেয় উভয়কে হারানোর সঙ্কট নয় কি?—এই সব প্রশ্নেরই সমালোলোচনা করিয়াছেন॥ এই সঙ্কট দিয়াই রামের পরিস্থিতি গঠিত—এই দ্বন্দ্বের নিরুপায় ও নিষ্ফল সমাধান প্রচেষ্টায় রামের ট্র্যাজেডি। দ্বন্দ্বটি তথা ট্র্যাজেডিকে তীব্রতর করিবার অবকাশ অবশ্য, নাটকে আরো আছে—রাজধর্ম ও হৃদয়ধর্মের দ্বন্দ্ব সর্বত্র সমান শক্তিমান হইয়া উঠিলে নাটকখানি আরো উৎকৃষ্ট সৃষ্টি হইয়া উঠিত।

বিশেষ লক্ষণীয় নাটকের উপস্থাপনা-রীতি॥ নাট্যকার স্থান-ঐক্য" (unity of place) এর প্রতি খুব বেশী দৃষ্টি দিয়াছেন। এই প্রবণতার ফলে—বহু ঘটনাকে একত্র সংহত করিতে গিয়াছেন, ফলে, কিছু কিছু অসঙ্গতি-দোষের স্পর্শ লাগিয়াছে। সাধ্যমত নাট্যকার দৃশ্য-সংখ্যা কমাইতে এবং কোন কোন স্থলে লোপ করিতেও চেষ্টা করিয়াছেন।

(২) দিগ্বিজয়ী ঐতিহাসিক নাটক—নাদিরশাহের জীবন অবলম্বনে অতিমানব

চরিত্র রহস্য—তাঁহাদের বিস্ময়কর উত্থান এবং শোচনীয় পতন উপস্থাপনা করিবার চেষ্টা। এক হিসাবে নাটকখানি 'ঐতিহাসিক' বটে, কিন্তু অন্য হিসাবে—একখানি ভাবলক্ষ্য নাটক, কারণ নাট্যকার নিজেই লিখিয়াছেন—"ইহার মূল ভাবটি (Theme) চিরন্তন" এবং সেই ভাবটি বোধ হয় এই—সালে বেগের ভাষায়—"পৃথিবীতে অনেক প্রতিভা পথহারা হয়ে নভঃস্খলিত জ্যোতিষ্কের মত কোথায় ঘূর্ণিপাকের অন্ধকারে ডুবে গেছে" এবং অভিমানবরা নিজেদের মৃত্যুবাণ নিজেদের শক্তির মধ্যেই বহন করেন—শক্তির মদে শক্তির অপব্যবহার করিয়াই তাঁহারা শোচনীয় ভাগ্যবিপর্য্যয়ের সম্মুখীন হন। নাদিরশাহের উত্থান ও পতন এই তত্ত্বের সুন্দর দৃষ্টান্ত এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই; কিন্তু নাট্যকার নাদিরশাহে যে পরিমাণ অভিমানবতার রঙ মিশাইয়াছেন এবং চরিত্র-পরিকল্পনায়, শেষ দিকে যে ভাবে ইতিহাসনিরপেক্ষ স্বাধীন কল্পনার আশ্রয় লইয়াছেন, তাহাতে নাটকখানির বাস্তবিক গাম্ভীর্য্য তথা আত্মিক গুরুত্ব অনেক হ্রাস পাইয়া গিয়াছে। নাদির অভিনেয় চরিত্র হিসাবে প্রত্যেক অভিনেতারই বাঞ্ছিত, নাটকখানিও সুন্দর একখানি সংহত "Well-made-play" তারপর, নাটকে ভাব-বস্তুর প্রাচুর্য্যও কম নহে এবং স্থলে স্থলে রস-নিষ্পত্তির মাত্রাও (incidental success) উপেক্ষনীয় নহে, কিন্তু সামগ্রিক আবেদনের দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে দেখা যাইবে, নাটকখানিতে ট্র্যাজেডি সংবিদ্ (Tragic impression) তেমন অব্যাহতভাবে জমাট বাঁধিতে পারে নাই; অবাস্তব ঘটনা পরিকল্পনার জন্য ট্র্যাজেডি-যোগ্য গাম্ভীর্য্যের হানি হইয়াছে—"philosophy of Nadir" এবং "history of Nadir" এর সংমিশ্রণে এক "hybrid production" হইয়া পড়িয়াছে॥ (আলোচনা দ্রষ্টব্য) অবশ্য ট্র্যাজেডির রূপ ও রস নাটকে না পাওয়া যায় এমন নহে; কিন্তু উচ্চাঙ্গের ঐতিহাসিক ট্র্যাজেডির জন্য যেরূপ বাস্তবিক পরিস্থিতি আবশ্যক, যেরূপ নিঃসংশয় কল্পনা ও অনিবার্য্য-ঘটনা-পরিণাম দেখান দরকার, তাহা এ নাটকে পাওয়া যায় না॥

এই নাটকে উপস্থাপনা রীতি আরো সংহত হইয়াছে। প্রথম চারিটি অঙ্কে একের বেশী দৃশ্য নাই, পঞ্চম অঙ্কে—দৃশ্য সংখ্যা মাত্র দুই (৩) বিষ্ণুপ্রিয়া—'ভাবরসাত্মক পঞ্চাঙ্ক নাটক'। ...শ্রীগৌরাঙ্গের পারিবারিক জীবনের রস ও কারুণ্য আশ্রয় করিয়া তাঁহার সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর নামে এই নাটক রচিত হইল।"......"বিরহের ভিতর দিয়াই যে মিলন সেই মিলনকেই বৈষ্ণব কবিগণ শ্রেষ্ঠ মিলন বলিয়া ইঙ্গিত করিয়াছেন। ভাবের দিক দিয়া এই নাটকে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের এবং শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর জীবনে সেই সাত্ত্বিক বিরহই একমাত্র অবলম্বন। ইহা মিলনের চেয়েও বড়। যে কথা বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী মুখে কোনদিন বলিতে পারেন নাই, অথচ যে অন্তর্গূঢ় বেদনা তাঁহার জীবনের ক্ষণিক মিলন ও দীর্ঘ বিরহকে এক সূত্রে বাঁধিয়া তাঁহার জীবনকে পবিত্র, শুভ্র ও সুন্দর করিয়া তাঁহার জগদ্বরেণ্য দেবতা স্বামীর পাশে তাঁহার যথাযোগ্য আসন নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছে সেই কথা এবং সেই বেদনাই এই নাটকের প্রাণ" (নাট্যকার) আপাতদৃষ্টিতে নাটকখানি করুণরসাত্মক মনে মনে হইতে পারে বটে, কিন্তু আসলে ইহার পরিণতি ঠিক করুণ নহে—যে সাত্ত্বিক বিরহ মিলনের বড়, সেই বিরহই এখানে স্থায়ী। যেখানে বিষ্ণুপ্রিয়া চৈতন্যের সঙ্গে ভাব-সম্মিলনে এক হইয়া আছেন সেখানে বিষ্ণুপ্রিয়ার বিরহ মিলনমাধুর্য্যে মণ্ডিত, এবং সেখানেই বিষ্ণুপ্রিয়া বলিতে পারেন—"কে বলে তিনি সন্ন্যাসী? আমি জানি তিনি সন্ন্যাসী নন। তিনি বিরহী, কৃষ্ণবিরহী—বিষ্ণুপ্রিয়াবিরহী" ভাব-সম্মিলনে বিষ্ণুপ্রিয়া দুঃখ বেদনার অতীত—চৈতন্যময়। "ভাব"-নাট্য হিসাবে নাটকখানি বাংলা নাট্য সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি।

৪। **পূর্ণিমামিলন**—একখানি "রঙ্গ-নাট্য" (Gay Comedy) সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী নাট্যকার মলিয়রের—School for Husbands নামক নাটক অবলম্বনে রচিত..... তবে মূল নাটকের ভাবটি ব্যঙ্গ (satire), পূর্ণিমামিলন ব্যঙ্গ নয়, রঙ্গ। মূলে যাহা "স্কুল" ছিল তাহা আমি "রসিকসম্মেলনে" পরিণত করিবার চেষ্টা করিয়াছি" (নাট্যকার)।

৫। রাবণ—রাবণ—চতুরঙ্ক একখানি পৌরাণিক বা রামায়ণ-বিষয়ক নাটক। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার রঙ্গমঞ্চে রাবণ-চরিত্র প্রদর্শনের একটা লক্ষনীয় প্রতিযোগিতা দেখা যায়। নাট্যনিকেতনে ১৫ই আগষ্ট শিবপ্রসাদ কর-প্রণীত "স্বর্ণলঙ্কা অভিনীত হয়—নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী রাবণের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন; ২৭শে সেপ্টেম্বর নবনাট্যমন্দিরে—সুরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—প্রণীত "সরমা" অভিনীত হয়—রাবণের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী মহাশয়—তারপর ১২ই ডিসেম্বর রংমহলে অভিনীত হয় যোগেশচন্দ্রের "রাবণ"—ভূমিকায় অভিনয় করেন—ভূমের রায়। (অভিনয় নাকি একটুও জমে না!)

রাবণ-চরিত্রে মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বের যত সম্ভাবনা আছে, সেইগুলি প্রদর্শন করাইবার চেষ্টা সকলের মধ্যেই কমবেশী লক্ষ্য করা যায়। রাজা-রাবণ ভ্রাতৃবৎসল-রাবণ এবং ভক্ত-রাবণের পারস্পরিক দ্বন্দ্বের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় জটিল রাবণ-চরিত্র দেখাইবার প্রতিযোগিতা খুবই উপভোগ্য। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের রাবণ-চরিত্রটির সহিত যোগেশচন্দ্রের রাবণ-চরিত্রের তুলনা সহজেই মনে আসিতে পারে এবং তুলনা করিলে দেখা যাইবে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের রাবণ দ্বন্দ্ব-গভীরতার দিক দিয়া উন্নততর সৃষ্টি হইলেও যোগেশচন্দ্রের রাবণ নূতনতর ভাব কল্পনায় সমৃদ্ধ। যোগেশচন্দ্রের রাবণ অতিশয় আত্মসমীক্ষণপটু। রাবণের আসল দ্বন্দ্ব—আত্মার ও দেহের প্রবৃত্তির দ্বন্দ্ব। রাবণ আত্মায় ব্রাহ্মণ, দেহে—রাক্ষস। সীতার প্রতি তাঁহার যে কামনা তাহা আত্মারই অবোধ বিষ্ণু-প্রীতির আবেগ। রাবণ নিজেই বলিয়াছে—

"পবিত্র ব্রাহ্মণ বীর্যে জনম আমার,
বিষ্ণু প্রীতি আত্মায় জড়িত—
বিষ্ণু-হিংসা দীক্ষা কেবা দিল ?

... ...

আত্মাধার একদিকে—
দেহ অন্য পথে।

রাক্ষসের কলুষ কামনা দিয়ে
ব্রাহ্মণের সংস্কার কাহারা করিল লোপ?
আমার আত্মীয় আজ নাই ত্রিসংসারে॥
... ...
আজ আমি ভাগ্যবান—
সীতার পেয়েছি দেখা।...

সীতা আজ রাবণের কাছে পরম ইষ্ট......সীতার কাছে আত্মদান করিয়া রাবণ ইষ্টের চরণে আত্মদানের আনন্দ পাইতে চাহেন। এই নাটকে রাবণ প্রকাশ্যভাবে ভক্তে পরিণত হইয়াছে—তাঁহার প্রার্থনা—"

আমার প্রার্থনা—

সীতারাম নামগান গাহি রসনায়,
চক্ষে হেরি রামসীতা যুগল-মিলন
কর্ণে শুনি সীতারাম প্রণব-ঝঙ্কার।"

যোগেশচন্দ্রের নাটকে অতিপ্রাকৃত প্রবণতা এবং ভক্তিরসের প্রাধান্য খুবই প্রকট। ইহা সত্ত্বেও অর্থাৎ রামকে পূর্ণব্রহ্ম রূপে এবং রাবণকে ভক্ত রূপে দেখাইয়াও, নাটকে করুণ-রসের তথা ট্র্যাজেডির আবেশ সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইয়াছেন। নাটকের পরিণতি বিশেষভাবে বিষাদ ভারাক্রান্ত হইয়া আছে—নাট্যকারের ইহা বড় কৃতিত্বেরই প্রমাণ।

৯। "নন্দরাণীর সংসার"—"করুণরসাত্মক সামাজিক নাটক"—চতুরঙ্ক। এই নাটকে নাট্যকার বাঙলা সমাজের এক "নিষ্ঠুর চিত্রকে" রসে-রূপে ফুটাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। "এই নিষ্ঠুর চিত্র" কি তাহা তিনি নিজেই ভূমিকায় ব্যক্ত করিয়াছেন—"প্রাচীনের মধ্যে অনেক সদ্‌গুণ আছে, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের মধ্যেও যথেষ্ট প্রাণশক্তি ও মহত্ত্ব আছে। তবু জানিনা কাহার দোষে—ঘরে বাইরে কোথাও আজ বাঙ্গালীর সুখ নাই, আনন্দ নাই। প্রবীণে নবীনে যোগ নাই, প্রৌঢ়ের সঙ্গে তরুণের মিল নাই, বুদ্ধিমানের কাজ নাই—, স্বামী স্ত্রীর

মর্মকথা বুঝিতে পারে না, স্ত্রীও স্বামীর বৃহৎ অনুষ্ঠানের সহায় হয় না—ভাল করিতে গেলে মন্দ হয়। শিক্ষিত সহৃদয় যুবক মনে করেন—আঘাত দিয়া এই জাতিকে বাঁচাইব। কাছে গিয়া দেখেন যাহাকে আঘাত দিবেন—সে মুমুর্ষু! তাহার প্রাণশক্তি বুঝি নিঃশেষ হইয়াছে।" আঘাত-দেওয়ার-মুখপাত্র মতিলালের মুখেই নাট্যকার নিজের বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন—"যে অসত্য আর কৃত্রিমতার মাঝখানে সারা বাংলা দেশের নরনারী বাস ক'রছে তা ম্যালেরিয়া-কলেরার জীবাণুর চেয়েও ঢের বেশী মারাত্মক। এ ভাবে এ রকম "ভাবের ঘরে চুরি" ক'রে একটা জাত বাঁচতে পারে না।" নাট্যকার অবশ্য জানেন না—'কি করা উচিত' তবু শুধু এই কথাই বলিতে চাহেন—"এ না—এ হ'তে পারে না।"

নাট্যকারের সাধ খুব প্রশংসনীয় বটে কিন্তু সাধ্যের নিদর্শন খুব অনবদ্য হইয়াছে এ কথা বলা যায় না। যুগের দ্বন্দ্ব-জটিল জীবন সম্পর্কে নাট্যকারের ধারণা স্পষ্ট হইয়া উঠিলে, চরিত্র-কল্পনা আরো বাস্তবিক এবং নাটকের গতি পরিণতি আরো ট্র্যাজিক হইতে পারিত। কৌতূহল বহু ধারায় ছড়াইয়া পড়ায় রস-সংবেদনা দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে।

৭। **মাকড়সার জাল**—নাটকখানিকে "Crimo-social" নাটক অপরাধ-প্রবণ সামাজিক নাটক বলিয়া "রঙমহল বিজ্ঞাপন দেওয়ায় নাট্যকার "নিবেদন"-এ জানাইয়াছিলেন—"রঙমহলে" এই নাটকখানিকে crimo-social নাটক বা "অপরাধ প্রবণ সামাজিক" নাটক বলিয়া বিজ্ঞাপিত করা হইয়াছে। বিশিষ্ট দর্শকগণও নাট্যাভিনয় দেখিয়া নাটকখানিকে সাধারণ ডিটেকটিভ গল্পের নাট্যরূপ মনে করিয়াছেন"............................... মূল নাটকের আখ্যান ভাগে অপরাধের কথা থাকিলেও ডিটেকটিভ নাটক লেখা আমার উদ্দেশ্য ছিল না। মানব-চরিত্রের অন্তর্গূঢ় রস ও ভাব প্রকাশের জন্যই শিক্ষিত ভদ্র অপরাধীর জীবনের ঘটনা আশ্রয় করিয়াছি।" নাট্যকারের উদ্দেশ্য যাহাই হউক, নাটকখানি সৃষ্টি হিসাবে "মেলোড্রামা"র পর্য্যায় অতিক্রম করতে পারে নাই। নাটকের প্রধান চরিত্রে (সুরেন্দ্রনাথ) এমন কোন তীব্র দ্বন্দ্ব ফুটিয়া

উঠে নাই যাহাকে ঠিক "ট্রাজিক" বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। মাকড়সার জাল একখানি উচ্চাঙ্গের "মেলোড্রামা"। (মনে রাখা দরকার—মেলোড্রামাতেও উত্তম-অধম বিচার প্রযোজ্য)

৮। "মহামায়ার চর":—অলৌকিক রহস্যময় ঘটনা অবলম্বনে "করুণ রসাশ্রিত গার্হস্থ্য নাটক"। নাটকখানির গল্পাংশ একখানি সুবিখ্যাত ইংরেজী নাটক হইতে গৃহীত......নাটক যে অলৌকিক রহস্য কাহিনী আছে, সেই কাহিনীটুকুই আমার ইংরেজী নাট্যকারের নাটক হইতে লওয়া। বাকী লৌকিক এবং সাংসারিক তাহা আমারই"।......মহামায়ার চর আমাদের এই সংসার......ইহার আদি আমাদের জানা নাই, অন্তও অজ্ঞাত—মাঝখানে কয়দিনের সুখদুঃখ, তাহাও নিরবচ্ছিন্ন নয়—সুখের সঙ্গে দুঃখ জড়ানো। দুঃখও নিরবচ্ছিন্ন নয়—সুখের সঙ্গে দুঃখ জড়ানো। দুঃখও চিরন্তন নয়। এই সুখদুঃখ মিশ্রিত আলোছায়ায় ঘেরা জীবনচিত্র আঁকিবার চেষ্টা করিয়াছি।" নাট্যকার অলৌকিককে প্রতিষ্ঠা দেওয়ার উদ্দেশ্য লইয়া এই নাটক রচনা করিয়াছেন। 'শচীন' নামক চিত্রটির কথাই নাট্যকারের বক্তব্য বলিয়া আমরা ধরিতে পারি— "বিজ্ঞান অলৌকিক স্বীকার করতে চায় না—সামাজিক মানুষ অলৌকিক— বিশ্বাস করে না, হেসে উড়িয়ে দেয়; কিন্তু অলৌকিক আছে অলৌকিক সুন্দর। মানুষ নিজেই অলৌকিক। ভ্রূণ থেকে আরম্ভ করে তার দেহের মৃত্যু পর্যন্ত তার সমস্ত Physio ogical development লৌকিক—শুধু কার্য্যকারণের শৃঙ্খলে, সীমাবদ্ধ, কিন্তু তার মন তো লৌকিক নয়—অসীম বিরাট আশ্চর্য্য মানব-মন॥" এই কথাটিকে প্রকাশ করিবার জন্য তিনি যে কাহিনী পরিকল্পনা করিয়াছেন—চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন বিশেষতঃ মৃত্যুঞ্জয় এবং উমাবতীর চরিত্র— তাহা খুবই—চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। এই নাটকে নাট্যকার উপস্থাপনা রীতিতে নূতন কৌশল যোজনা করিয়াছেন—চলচ্চিত্রে যেমন, flash back করা হয় এখানেও সেই রীতি প্রয়োগ করিয়া—অতীত ঘটনাকে উদ্‌ভাসিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন॥

(৯) **পরিণীতা—"সামাজিক নাটক"**—জমিদার ও ব্যবসায়ী দুই পরিবারের দ্বন্দ্বের পটভূমিকায় "কমেডি" ॥ নাটকে যে ভাব-বস্তুকে প্রচার্য্য করা হইয়াছে তাহা জমিদার শ্রীপতির মুখেই প্রকাশ পাইয়াছে—সত্যকে স্বীকার করবার সাহস যার আছে সেই modern।......Modern হচ্ছে চির কিশোর সত্য। "নিবেদনেও" একই কথা বলা হইয়াছে—"নব যুগের বাণী যিনি শুনিতে পান, বলিতে পারেন—তিনিই modern।" নাট্যকারের স্বীকৃতি—আধুনিক বলিতে আমি যা বুঝি, এ নাটকে তাহাই দেখাইবার প্রয়াস পাইয়াছি ॥

এইবার **প্রতিভার গুণ মাত্রার দিকটি** আলোচনা করা যাইতে পারে। তবে গোড়াতেই এই কথাটা বলিয়া লওয়া ভাল—যে, প্রতিভার সম্যক পরিচয় দেওয়ার অবকাশ এখানে নাই এবং নাই বলিয়াই সামান্য লক্ষণটি নির্দ্দেশ করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতে হইবে।

প্রথমে নাটকের সংজ্ঞা সম্পর্কে, যোগেশচন্দ্রেরই—(তিনটি) উক্তি (সতর্ক বাণী হিসাবে) স্মরণ করিয়া লওয়া যাউক॥ যোগেশচন্দ্রের মতে—বস্তু নাটক নয়! ঘটনা বাস্তব হউক অবাস্তব হউক, ঘটনা নাটক নয়। অর্থাৎ ভাব এবং রসই নাটকের প্রাণ"—(খ) লিখিত নাটক গানের স্বরলিপির মত নাট্যাভিনয়ের স্বরলিপি মাত্র। প্রকৃত রসিক নাট্যামোদী ছাড়া নাটকের সত্যকার পাঠক নাই" ॥ (গ) আধুনিক নাটক মানে আধুনিক—টেকনিকের নাটক। প্রাচীন ঘটনা লইয়াও আধুনিক নাটক লেখা যায়।"

(রচনা-রীতি)

প্রথমতঃ যোগেশচন্দ্র নাটকের গঠনে আধুনিক রীতি প্রয়োগ করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন এবং আধুনিক রীতি—তিনি যেটুকু প্রয়োগ করিয়াছেন তাহা এই যে "স্থান-ঐক্য" (unity of space) বজায় রাখিবার দিকে তিনি খুব সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়াছেন 'দিগ্বিজয়ীর ভূমিকাতে তিনি লিখিয়াছেন—"অভিনয় সম্পূর্ণরূপে নবযুগোপযোগী—করিবার নিমিত্ত আমি আধুনিক নাট্য-রচনা-রীতি

(Ibsenian Technique) অবলম্বন করিয়াছি।" দেখা যায় নাটকে—মোট পাঁচটি অঙ্ক, প্রথম চারি অঙ্কে একের বেশী দৃশ্য নাই এবং পঞ্চম অঙ্কে মাত্র দুইটি দৃশ্য। স্থান-ঐক্য লক্ষ্য হওয়ায় নাটক ও অভিনয় একদিকে যেমন নবযুগোপযোগী হইয়াছে, অন্যদিকে এই রীতির দিকে অধিকতর ঝোক পড়ায়, একস্থলে অনেকগুলি ঘটনা এবং পাত্রপাত্রীর সমাবেশ করিতে হইয়াছে, ফলে কয়েকস্থলে অনৌচিত্য-দোষের স্পর্শ এড়ানো সম্ভব হয় না।

অধিকন্তু নাট্যকার উন্নত অভিনয় রীতির—মঞ্চব্যবস্থা ও আলোক-সম্পাতাদির সুযোগে, ঘটনার "পশ্চাদ্‌বৃত্তি" (flash-back-রীতি)—ঘটাইয়া, নতুন রীতির নাটক রচনা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। (মহামায়ার চর—দ্রষ্টব্য)

দ্বিতীয়তঃ, নাট্যকার মনোবিজ্ঞানের নূতন জ্ঞান প্রয়োগ করিয়া, পুরাতন বিষয়বস্তুতে নূতন ভাব সঞ্চার করিয়া, যুগের বিশেষ দৃষ্টি কোণ হইতে জীবন-সমালোচনার প্রশংসনীয় চেষ্টা করিয়াছেন। রাম শূদ্রক, রাবণ বিষ্ণুপ্রিয়া নাদির প্রভৃতি পুরাতন হইলেও নূতন সৃষ্টি।

সমস্যা-সচেতনতা

তৃতীয়তঃ, সামাজিক নাটক সৃষ্টিতে নাট্যকার যথেষ্ট সমস্যা-সচেতনতার ও আন্তরিকতার পরিচয় দিয়াছেন, তবে সমস্যার স্বরূপ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা না থাকায় (নিজেই বলিয়াছেন—'জানিনা কাহার দোষ'...) তাঁহার নাটকে বাস্তবিকতার মায়া ঘোর তেমন জমাট বাঁধিতে পারে নাই। 'নন্দরানীর সংসার' বা মাকড়সার জাল প্রভৃতি নাটকের উদ্দেশ্য খুবই প্রশংসনীয়; কিন্তু যে রূপ ও রসের উপায়ে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে তাহা উৎকর্ষের দিক দিয়া তত প্রশংসনীয় হইতে পারে নাই।

উপস্থাপনায় ভাবতান্ত্রিকতার প্রাধান্য

চতুর্থতঃ—কোন কোন চরিত্র সৃষ্টিতে, বিশেষতঃ দ্বন্দ্ব-রূপায়নে, নাট্যকারের গভীর সহৃদয়তার বা সহানুভূতির পরিচয় পাওয়া যায়—একথা অবশ্যই স্বীকার্য;

তবে একথাও অনস্বীকার্য্য যে—সৃষ্টিতে রূপতান্ত্রিকের বাস্তব-রতি অপেক্ষা ভাবতান্ত্রিকের আত্মরতির আধিক্য বেশী দেখা যায়। এই কারণেই কোন কোন ক্ষেত্রে চরিত্র তাহার বাস্তব পরিবেশ হইতে যেন আলগা হইয়া পড়িয়াছে; এমন কি অনেক ক্ষেত্রে দূরে সরিয়া পড়িয়া, অনেক পরিমাণে গুরুত্ব হারাইয়া ফেলিয়াছে। নাদির-চরিত্রটি ইহার বড় একটি দৃষ্টান্ত। শেষদিকে নাদির পরিবেশ হইতে এত বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে—যে ঐতিহাসিক ব্যক্তি হিসাবে নাদিরকে প্রায় চেনাই যায় না; সঙ্কল্পে ও আচরণে নাদির যে পরিমাণে বাস্তব হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছে, সেই পরিমাণে চরিত্রটি গুরুত্ব হারাইয়া বসিয়াছে। কোন কোন ক্ষেত্রে, পরিস্থিতির অবাস্তবতায় চরিত্রের আকর্ষণ হ্রাস পাইয়া গিয়াছে। ('মহামায়ার চর', 'নন্দরানীর সংসার', 'পরিণীতা' প্রভৃতি দ্রষ্টব্য)।

যুগধর্ম—সেবায় প্রগতিশীল

পঞ্চমতঃ—নাট্যকার যোগেশচন্দ্র যে সকল ভাব প্রচার করিতে চেষ্টা করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় যে তিনি—(ক) শূদ্রককে মুখপাত্র করিয়া সমাজের বঞ্চিত ও লাঞ্ছিতদের অধিকার প্রতিষ্ঠার কথা উচ্চ কণ্ঠেই প্রচার করিয়াছেন—শূদ্রক দৃঢ়কণ্ঠে বলিয়াছে—

স্বজাতির সংস্কার করিয়াছি শুধু;
দিয়াছি তাদের আমি সেই অধিকার
বিপ্রজাতি বঞ্চনা করেছে যাহা;—
মানবের ক্ষুদ্র স্বার্থনীতি তুচ্ছ করি
মানিয়াছি ঈশ্বরের বিধি।

যে বিধিতে ব্যক্তি-অধিকার সঙ্কুচিত—ব্যক্তিব মর্ম আহত, সেই বিধিকে সত্যের বা ধর্মের মর্য্যাদা দিতে তিনি কুণ্ঠিত। বাল্মীকি এই সত্যের মুখপাত্র—"মর্ম যারে সত্য বলি দেয় দেখাইয়া, সেই সত্য,—অন্য সত্য নাই" রাম এই ধর্মের ধ্বজা ধারণ করিয়াছেন—"

"হৃদয়ের ধর্ম ছাড়া
অন্য ধর্ম মানিতে নারিব, প্রভু!
শুষ্ক শাস্ত্রের বচন
লোকাচার, সমাজ নিয়ম
যার চাপে নির্দোষীর বুক ভেঙ্গে যায়
তারে সত্য বলি মানিব না।"

বংশ-আভিজাত্যের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা নাদিরের মুখে উচ্চারিত হইয়াছে—"বংশ-পরিচয় অনাবশ্যক। আমি চাই, বংশের নয়, নিজের পরিচয়ে মানুষ দাঁড়াবে। আভিজাত্য যেন আজ এই সিরাজী বেগমের মত ক্রীতদাসীকেও অভিবাদন করতে শেখে—" নাদিরের মুখে "সবার উপরে মানুষ সত্য"—এই মহিমাও প্রচারিত হইয়াছে—"যে আভিজাত্য মানুষকে তুচ্ছ করে, আমি তাকে ঘৃণা করি। আভিজাত্যের চেয়ে মানুষ শ্রেষ্ঠ, কেননা আভিজাত্য মানুষ সৃষ্টি করে না, মানুষই আভিজাত্যের স্রষ্টা"।

তারপর, রহমতের মুখে 'সাম্প্রদায়িক' ধর্মের সংকীর্ণতাকেও ধিক্কার দেওয়া হইয়াছে এবং সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের প্রতিষেধ করিতে সিতারার কণ্ঠে ঘোষণা করা হইয়াছে—"আমি সব ধর্মকেই সত্য বলে জানি, সেই জন্য কোন বিশেষ ধর্মের গণ্ডীর জন্য ব্যস্ত হইনি"। এই ভাবে ধর্মীয় সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে নাট্যকার সমালোচনা প্রকাশ করিয়াছেন। **যোগেশচন্দ্রের নাটকের influence value উল্লেখযোগ্য**

অধ্যাত্মবাদী, অতিপ্রাকৃত—বিশ্বাসী

তবে নাট্যকার সংস্কারের দিক দিয়া মূলতঃ প্রাচীন-পন্থী। দার্শনিক দৃষ্টিকোণ তাঁহার অধ্যাত্মবাদীরই দৃষ্টি কোণ। দৈবে বিশ্বাস, অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস, দেহ-নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র আত্মায় বিশ্বাস তাঁহার মজ্জাগত। তাঁহার ধারণা—"ভগবৎকৃপা না থাকিলে শুধু মানুষের চেষ্টায় কোন কার্য্যই সুসিদ্ধ হয় না" শুধু তাহাই নহে;

দেখা যায় "নন্দরানীর সংসার"-এ নাট্যকার পাশ্চাত্য শিক্ষিত, পুরুষকার-বিশ্বাসী এবং নাস্তিক মহিমারঞ্জনকে স্ত্রী নন্দরানীর দৈব বিশ্বাসে ফিরাইয়া লইয়া দ্বন্দ্বের সমাধান করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। মহিমারঞ্জনের শেষ উক্তি—"কে জানে—হয়ত গোবিন্দদেব আছেন।—খুবই সংকেতপূর্ণ।

উপসংহারে এ কথা অবশ্যই বলা যাইতে পারে যে—যোগেশচন্দ্রে সমর্থ রসস্রষ্টার শক্তি সামর্থ্যের মাত্রা প্রশংসনীয় পরিমাণেই আছে—অর্থাৎ কাহিনীকে সন্ধি বিভক্ত করিবার—সন্ধির ঘটনাগুলিকে যথাসম্ভব একত্র সন্নিবেশিত করিবার শক্তি তাঁহার আছে (খ) চরিত্রে ভাব-দ্বন্দ্ব পরিকল্পনা করিবার শক্তিও যথেষ্ট মাত্রায় পাওয়া যায় এবং অনুভাব-ব্যভিচারী ভাবের কল্পনায় সহৃদয়তার সদ্ভাবও অনেক ক্ষেত্রে উচ্চ প্রশংসারই যোগ্য, (গ) কল্পনা-শক্তি এবং ভাবনা-শক্তি খুব দুর্বল নহে—সমাজকে অশান্তি দ্বন্দ্ব ও অনাচার হইতে মুক্ত করিবার সাধ ও তাঁহার ঐকান্তিক, কিন্তু যে মূল শক্তিটি উল্লিখিত শক্তিসমূহকে একটি সামবায়িক ঐক্য দান করিয়া মাধুর্য্য—ঐশ্বর্য্যের, রূপের ও ভাবের আনন্দ-সঙ্গতি সৃষ্টি করে, নাট্যকারের ব্যক্তিত্বে সেই শক্তির দুর্বলতা আছে। ভাবের কেন্দ্রাতিগ প্রবণতার—উচ্ছ্বাসময়তার এবং রূপের কেন্দ্রানুগ প্রবণতার—বাস্তবিকতার, অনবদ্য সাহিত্য সৃষ্টি করিবার জন্য কবি-মানসে যেরূপ মাত্রাস্পর্শকাতরতা থাকা দরকার, তাহার ঘাট্‌তি আছে বলিয়াই প্রথম শ্রেণীর স্রষ্টার মধ্যে বাস্তবতার এবং গভীরতার যে সমন্বয় পাওয়া যায় তাঁহার রচনায় তাহা সম্ভব হয় নাই। অবশ্য এই জাতীয় প্রথম শ্রেণীর শিল্পী—শুধু দুর্লভই ন'ন সুদুর্লভ; আর তাহা শুধু আমাদের দেশের সম্বন্ধেই নহে—সকল দেশের সম্পর্কেই প্রযোজ্য।

আর একটি কথা বলিয়া এ প্রসঙ্গ শেষ করা যাক—যোগেশচন্দ্রের অভিনয়-রীতি ব্যক্তি-মানসের যে স্বাভাবিক প্রকাশ-রীতি হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, চরিত্র সৃষ্টিতেও বিশেষতঃ সামাজিক চরিত্র সৃষ্টিতে তাহার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। "রামের" কথা বাদ দিলে, যোগেশচন্দ্রের ট্র্যাজিক চরিত্রগুলি নিরুদ্ধ আবেগকে উচ্ছ্বাসের মধ্য দিয়া ব্যক্ত না করিয়া কয়েকটি ব্যভিচারী ভাবের সাহায্যে সহজ

অথচ অধিকতর তীব্রতার সহিত ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছে। যোগেশচন্দ্রের অভিনয়ে আবেগ যেমন অনুচ্ছ্বসিত, চরিত্র-সৃষ্টিতেও—নিরুদ্ধ আবেগটি দু'একটি ভাবব্যঞ্জক কথা বা আঙ্গিক সংকেতে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। চরিত্র-সৃষ্টির এই রীতি খুবই প্রশংসনীয়। নাদির শা', মৃত্যুঞ্জয়, মহিমারঞ্জন রাবণ, যে কোন চরিত্র বিশ্লেষণ করিলেই এই প্রয়োগ লক্ষ্য করা যাইবে। এ ক্ষেত্রে যোগেশচন্দ্র উচ্চপ্রশংসার অধিকারী। এ কথাও অবশ্য বলা যাইতে পারে যে—আবেগকে নিরুচ্ছ্বাস অভিব্যক্তি দেওয়ার ব্যাপারে যোগেশচন্দ্রের এই বৈশিষ্টাটুকু খুব কম নাট্যকারের মধ্যেই পাওয়া যায়। যোগেশচন্দ্র প্রথম শ্রেণীর "নাট্যকার-প্রতিভার" অধিকারী না হইলেও, বাংলার শক্তিমান নট-নাট্যকারগণের মধ্যে অবশ্য বিশিষ্ট স্থান দাবী করিতে পারেন।

নাদিরশাহের ইতিহাস ও তাৎপর্য্য

'অগ্নি আখরে আকাশে যাহারা লিখেছে আপন নাম'—নাদির তাঁহাদেরই একজন এবং এমন একজন যাঁহার নাম শুধু নামবাচক একটি শব্দমাত্র নহে—অদ্ভুত এক ভাব-ব্যঞ্জনার ধ্বনি-সমষ্টি। বস্তুতঃ নাদির আজ আর শুধু একটি ব্যক্তির নাম নহে—অভিধা মাত্র নহে, "নাদির" শব্দটি একটি ব্যঞ্জনা—অবাধ অত্যাচার নির্ব্বিচার লুণ্ঠন, নির্ম্মম নিষ্ঠুরতা—পৈশাচিক হত্যা প্রভৃতির সংকেতে পর্য্যবসিত। কিন্তু প্রবচনে নাদির যে ভাবানুষঙ্গের (association) প্রতীক হউক না কেন, নাদিরের ঐতিহাসিক পরিচয় যাহারা জানেন তাহাদের কাছে "নাদির" শব্দটির ব্যঞ্জনা এত সংকীর্ণ নহে। নাদিরকে আমরা 'এশিয়ার সন্ত্রাস', 'বিধাতার মূর্ত্তিমান অভিশাপ' প্রভৃতি যত কিছুই বলি না কেন এ কথাও ভুলিবার নহে যে তিনি পুরুষকারের এক বিস্ময়কর উৎক্ষেপ আত্ম-প্রতিষ্ঠার এক ঐকান্তিক অন্ধ আবেগ, সামরিক শক্তির এক উদ্দাম ও অপ্রতিহত গতি-বেগ। দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম মদায়ত্তন্তু পৌরুষম্—নাদির এই সত্যেরই যেন এক নূতন অবতার। অতি-সাধারণের মধ্যেই

অতি-অসাধারণ কি ভাবে সম্ভাবনা-রূপে বিরাজ করে এবং উপযুক্ত সুযোগ পাইয়া, কি ঐকান্তিক অধ্যবসায় দ্বারা সুযোগকে সে আত্ম-বিকাশের উপায় করিয়া লয়, অতি-সাধারণ অবস্থার গুটি হইতে কিভাবে অতি-অসাধারণ বিচিত্র-শক্তি ব্যক্তিত্বের প্রজাপতি বাহির হইয়া আসে—তৈমুরলং, চেঙিস খাঁ, নাদির শাহ নেপোলিয়ন প্রভৃতি তাহার উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত। নাদির জ্ঞানের বিভূতি নহে সত্য, প্রেমের বিভূতি তাহাতে প্রকাশিত হয় নাই ইহাও সত্য ; কিন্তু নাদিরে যে শক্তির বিভূতি প্রকাশিত হইয়াছে তাহা অবশ্যই বিস্ময়জনক। কত ছোট আরম্ভের কত বড় বিরাট পরিণতি!

নাদির শাহ খোরাসান প্রদেশে আফ্‌সার-জাতির (tribe) "কুরিকৃলি"—শাখার একটি নগণ্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন—১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দের—২২শে নভেম্বর তারিখে (মীরজা মেহেদি-মতে)। তাঁহার পিতা ইমাম কুলি বেগ একজন মেষপালক। নাদিরের জন্ম হয় দূর্‌গাজ জিলার অন্তর্গত মোহাম্মদাবাদের নিকটবর্ত্তী একটি তাঁবুতে। কথিত আছে—[এন্‌সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা—১৪ সংস্করণ] নাদিরের বয়স যখন ১৮ বৎসর তখন একদল উজ্‌বেকী তাহাকে এবং তাহার মাকে চুরি করিয়া লইয়া যায় এবং ক্রীতদাস-রূপে বিক্রয় করিয়া দেয়। চার বৎসর পরে নাদির পলাইয়া পারস্যে চলিয়া আসেন এবং দর্‌গাজের শাসনকর্ত্তার অধীনে সৈন্যবিভাগে যোগদান করেন। ক্রমে কর্ম্মকুশলতায় তিনি শাসনকর্ত্তার প্রিয়পাত্র হন এবং জামাতার পদও লাভ করেন। পরে শ্বশুরের মৃত্যুর পরে নাদির তাঁহার স্থলে অভিষিক্ত হন। Lokhart নামক জনৈক গবেষক ঐতিহাসিক "Nadir"-নামক গবেষণা-গ্রন্থে এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—নাদির আফসার সর্দার এবং আবিবর্দ্দের শাসনকর্ত্তা বাবা আলি কুশা আহমদলুর অধীনে সৈনিকের কার্য্যে যোগদান করেন। ক্রমে তাঁহার দেহরক্ষি-বাহিনীর সেনাপতি এবং আরো ক্রমে জামাতা হন। এই প্রথমা পত্নীব গর্ভে ১৭১৯ খ্রীঃ ১৫ই এপ্রিল রেজা কুলির জন্ম হয়। কয়েক বৎসর যাইতে না যাইতেই প্রথমা পত্নীর মৃত্যু ঘটে।

নাদির অন্য পত্নী গ্রহণ করেন বটে কিন্তু শ্বশুর বদলান না—বাগ আলিরই অন্য এক কন্যাকে বিবাহ করেন। এই পত্নীর গর্ভে—নসরুল্লা ও ইমাম কুলি জন্ম গ্রহণ করেন।

বাগ আলি বেগ ১৭২৩ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন। (কেহ কেহ বলেন—নাদিরই শ্বশুরকে হত্যা করেন ..) নাদির যে-কোন কারণেই হউক শ্বশুরের পদ লাভ করিতে পারেন না। অগত্যা তিনি মাসাদে উপস্থিত হন এবং মালিক মহম্মদ মামুদের অধীনে কার্যাভার গ্রহণ করেন।

[তবে একটি কথা এখানেই বলিয়া রাখা ভাল—নাদিরের ইতিহাস আগাগোড়া 'প্রমাণ' দিয়া গাঁথিয়া তোলা সম্ভব হয় নাই। অনুমানের জোড়াতালি না দিয়া কেহই ইতিহাস দাঁড় করাইতে পারেন নাই। যেমন—নাদির কেন এবং কখন 'দস্যু-সর্দার' হন তাহা স্থির করা এক মহা সমস্যা হইয়াছে। এই সময়কার গতিবিধির ইতিহাস খুব স্পষ্ট নহে॥ এই সকল ক্ষেত্রে কিংবদন্তী ও ইতিহাস বাছিয়া লওয়া দুঃসাধ্য ব্যাপার এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।]

নাদিরের সময়ে পারস্যের অবস্থা নানাকারণে শোচনীয় হইয়া পড়ে। তখন সাফাভী বংশের রাজত্ব-কাল। ১৪৯৯ খ্রীঃ এই বংশের শাসনের আরম্ভ হয়, ১৭৩৬ খ্রীঃ নাদিরের অভ্যুত্থানে শাসনের অবসান। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে—শাহ হোসেনের শাসনকালে (১৬৯৪ খ্রীঃ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত) পারস্য ভীষণ এক সঙ্কটের সম্মুখীন হয়॥ নিম্নলিখিত কারণে এই বিশৃঙ্খলা বা সঙ্কট দেখা দেয়। (ক) শাহ ও শাসকবর্গের নৈতিক ও চারিত্রিক দুর্ব্বলতা, (খ) শাহ আব্বাসের নীতির ফলে—শাহজাদাদের ভীরুতা ও বিলাসপরায়ণতা (গ) সৈন্য-বিভাগের প্রতি উপেক্ষা ও অবহেলা *(ঘ) সিয়া-সুন্নীর উৎকট বিরোধ (ঙ) জাতিগুলির মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব (চ) পিটার দি গ্রেট-শাসিত রাশিয়ার সম্প্রসারণ-চেষ্টা (ছ) তুরস্কের—আজর বাইজান জর্জ্জিয়া ও শিরোয়াণে'র প্রতি লুব্ধ দৃষ্টি॥ পশ্চিমে তুরস্ক—উত্তর-পূর্বে রাশিয়া, পূর্বে আফগানিস্তান—এক কথায় চতুর্দ্দিকে শত্রু বেষ্টনী॥ এই বেষ্টনী ভেদ করিতে

বা আত্মরক্ষা করিতে হইলে চাই—অটুট ঐক্য এবং অদম্য সামরিক শক্তি অথচ সেখানেই পারস্যের চরম দৈন্য। সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বে, জাতিদ্বন্দ্বে সমগ্র পারস্য ছিন্নবিচ্ছিন্ন—বিলোপের বিপত্তির মুখে দণ্ডায়মান॥

১৭১৭ খ্রীষ্টাব্দে নানাস্থানে বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। শত্রুর পক্ষে এই বিশৃঙ্খলা মহাসুযোগ। ইতিমধ্যে আফগান মামুদ পারস্য আক্রমণ করেন। সুযোগ বুঝিয়া রাশিয়া ও তুরস্ক কতকগুলি প্রদেশ কুক্ষিগত করিতে চেষ্টা করে। ১৭২৪ খ্রীঃ তুরস্ক ও রাশিয়া পারস্যকে ভাগ বাঁটোয়ারা করিয়া লইবার জন্য চুক্তি করে। মামুদের আক্রমণের মুখে শাহ হোসেন আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হন। শাহজাদা তাহমাস্প্ রাজধানী ইস্পাহান হইতে পলাইয়া যান এবং—শাহ উপাধি গ্রহণ করেন। মামুদের মৃত্যুর পরে তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র ইস্পাহান, সিরাজ এবং দক্ষিণ পূর্ব-পারস্যের উপর অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখেন। তাহমাস্প্ খোরাসানে গিয়া সৈন্য সংগ্রহের চেষ্টা করেন কিন্তু বিশেষ কৃতকার্য হন না।

জাতির এই মহা সঙ্কটের সময়ে—সমগ্র পারস্য যখন তুরস্ক, রাশিয়া ও আফগানিস্থানের কবলে, দস্যু-সর্দার নাদির তাঁহার দলবল লইয়া তাহমাস্পের সঙ্গে যোগ দেন। জাতির দুর্যোগের রূপে নাদিরের সম্মুখে শক্তি তথা ভাগ্য পরীক্ষার এক মহাসুযোগ উপস্থিত। শাহের সৈন্যাধ্যক্ষরূপে নাদির মাতৃভূমির মুক্তিসংগ্রামে আত্মশক্তি নিয়োগ করেন॥ ১৭৩০ খ্রীঃ তিনি প্রথম আফগান-শক্তিকে বিতাড়িত করেন এবং তুরস্কের বিরুদ্ধে অবিরাম (৩ বার) অভিযান চালাইয়া পারস্যের পশ্চিমাঞ্চলের প্রদেশসমূহ উদ্ধার করেন॥ রাশিয়া-অধিকৃত প্রদেশ উদ্ধার করিতে ও বেশী বিলম্ব হয় না॥ তুরস্কের সহিত রাশিয়ার যুদ্ধ বাধিতেই নাদির রাশিয়ার উপর চাপ দেন এবং অধিকৃত প্রদেশ উদ্ধার করিতে সমর্থ হন। এই সময়েই তুরস্কের সঙ্গে একটা চুক্তি করিতে গিয়া তাহমাস্প্ সিংহাসন হারান—নাদির তাহমাস্পকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তাহার শিশুপুত্রকে সিংহাসনে স্থাপন করেন। (১৭৩৩)

তাহমাস্পের শিশুপুত্র শাহ তৃতীয় আব্বাস ১৭৩৬ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হয় তথা অস্ত্রের তরবারিমুখে পতিত হইবার যন্ত্রণা এড়াইয়া যায়। নাদিরের উচ্চাকাঙ্ক্ষার পথে যে ছোট একখানি কাঁটা ছিল তাহাও অপসারিত হয়। এইভাবে ১৭৩৬ খ্রীষ্টাব্দে নাদির—মেষপালক-পুত্র নাদির পারস্যের 'শাহ' হইয়া বসেন। প্রথমে নাকি তিনি শাহের মুকুট গ্রহণ করিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন—অবশ্য এই অসম্মতি কূটনৈতিক, তারপর শুধু সম্মতই হন না, সঙ্গে সঙ্গে দুইটি প্রতিশ্রুতিও আদায় করেন। এক নম্বর প্রতিশ্রুতি—সিংহাসন তাঁহার পুত্রপৌত্ররা বংশানুক্রমে ভোগ করিবে; দুই নম্বর—শিয়ারা সুন্নি মত গ্রহণ করিবে। প্রথমটিতে কেহই আপত্তি করিতে সাহস না পাইলেও, দ্বিতীয়টিতে মোল্লাবাসী (প্রধান মোল্লা) আপত্তি জানান এবং প্রাণ দিয়া শহীদ হওয়া ছাড়া আর কোন ফলই পান না।

[এই দুইটি সর্ত্ত বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে—নাদিরের ভবিষ্যৎ আচরণের মূলে যে দুইটি প্রধান প্রবৃত্তি কাজ করিয়াছে তাহাই এখানে প্রকাশ পাইয়াছে। নাদির মেষপালক পুত্র, নিরক্ষর ও সংস্কৃতিবর্জ্জিত। নাদিরের প্রতিপক্ষ সাফভীবংশীয়রা অভিজাত বা সংস্কৃতিমান শিয়ামতাবলম্বী। অভি-জাতদের বংশগৌরবের বিরুদ্ধে নাদিরের মধ্যে একটা প্রতিকূলতা থাকিবে ইহা খুবই স্বাভাবিক। এই অভিজাতদের গর্ব্বের বিরুদ্ধে নাদিরের যে সংগ্রাম তাহাই নানারূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। শিয়া-সুন্নিকে এক করার চেষ্টা— শিয়া-সম্প্রদায়ের আভিজাত্য-গর্ব্বের বিরুদ্ধে সংগ্রামেরই একটা রূপ। শিয়া-সুন্নি এক হইলে যেমন সাম্প্রদায়িক বিরোধ থাকিবে না, তেমনি থাকিবে না সুন্নি নাদিরের বিরুদ্ধে শিয়া-সম্প্রদায়ের বিদ্বেষ—অভিজাতদের শিয়া ধর্ম্ম চেতনার অভিমানও উন্নাসিকতা]

পারস্যের সম্রাট হইবার পরে উচ্চাকাঙ্ক্ষার আগুনে নাদিরের রক্ত টগবগ করিয়া ফুটিতে থাকে। তৈমুরলঙের মত তিনিও দিগ্বিজয়ের স্বপ্ন দেখিতে থাকেন। মৃত পারস্যকে তিনি শুধু তো সঞ্জীবিতই করেন নাই, দুর্ব্বল

জাতিকে তিনি এক অমিত বল যোদ্ধায় পরিণত করিয়াছেন। তিনি শুধু যে সমস্ত হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করিয়াছেন তাহা নহে, পারস্যকে এক বিরাট সাম্রাজ্যে পরিণত করিয়াছেন। নাদিরের দিকে আজ শত্রুরা বিস্মিত আতঙ্কে চাহিয়া আছে।

শাহ্ নাদিরের প্রথম লক্ষ্য হয়— কান্দাহার। ৮০,০০০ সৈন্য লইয়া তিনি অভিযানে বহির্গত হন। এক বৎসর অবরোধের পর কান্দাহার আত্মসমর্পণ করে—আফগানিস্তান পারস্যের অধীন হয়। আফগান ঘিল-জাইদের সহিত নাদির খুব বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার করেন। এই ঘিলজাই সৈন্যরা আমৃত্যু নাদিরের প্রিয়পাত্র ও অনুগত থাকে।

ইহার পর আসে **ভারতের পালা**। ভারতের সিংহাসনে তখন ঔরংজীবের অপদার্থ বংশধর মহম্মদ শাহ্। পলাতক আফগানদের আশ্রয় না দেওয়ার জন্য নাদির মহম্মদ শাহের কাছে পত্রে অনুরোধ জানান॥ মহম্মদ শাহ্ বিলাসে বেহুস। আমীর-ওমরাহরা নিজেদের স্বার্থের পুঁটুলি বড় করিতেই ব্যস্ত। অযোধ্যার সাদৎ আলি এবং দাক্ষিণাত্যের নিজাম উল-মুল্ক ক্ষমতা অধিকার করিবার জন্য প্রতিযোগিতায় লিপ্ত এবং ষড়যন্ত্র-সূত্রে একতাবদ্ধ॥ সকলেই বিষকুম্ভ এবং পয়োমুখ। ঘর পুড়ুক ছাই খাই'— নীতি ছাড়া আর কোন নীতি ইহাদে । শাহকে ঘিরিয়া আছেন এই সকল শকুনির দল। শাহ্ পত্রের উত্তরটা পর্য্যন্ত দেন না। ফলে নাদির ১৭৩৮ খ্রীঃ ভারতবর্ষ অভিযানে অগ্রসর হন। দিল্লীর ষাট মাইল উত্তরে কর্ণাল রণক্ষেত্রে নাদিরের সহিত মোগল সৈন্যের শক্তি-পরীক্ষা হয়। পরীক্ষার ফল যাহা হইবার তাহাই হয়— বহু মোগল সৈন্যের প্রাণ হরণ করিয়া জয়লক্ষ্মী নাদিরের শিবিরে প্রবেশ করেন। সাদৎ আলি বন্দী হন। অগত্যা নিজাম উল-মুল্‌ককে নাদিরের শিবিরে সন্ধির প্রস্তাব দিয়া প্রেরণা করা হয়। শেষ পর্য্যন্ত সম্রাটকেও দন্তে তৃণ করিয়া নাদিরের সম্মুখে উপস্থিত হইতে হয় এবং মুকুট অর্পণ করিয়া বশ্যতা স্বীকার করিতে হয়।

নাদির বাদশাহের বশ্যতাকে উদঘোষিত করিবার জন্ত, বিশেষত দিল্লীর রাজকোষ হস্তগত করিবার জন্তই— সদর্পে দিল্লী পর্য্যন্ত অগ্রসর হন। বাদশাহ ভারতের ঐশ্বর্য্য নাদিরের পদে সমর্পণ করিয়া, সর্বতোভাবে সেবা করিয়া মুকুটটি রক্ষা করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু এই অবস্থাটি অনেকের মনঃপূত হয় না। ঘর না পুড়িলে ছাই খাওয়ার সুযোগ যাহাদের হইবে না তাহাদেরই কেহ নাদিরের মৃত্যু সংবাদ রটনা করিয়া দেয়। ফলে বাদশাহের সৈন্তদের এবং নাগরিকদের দ্বারা নাদিরের সৈন্ত আক্রান্ত ও হতাহত হয়। নাদির প্রথমতঃ বিক্ষোভ দমন করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত নির্বিচার হত্যার আদেশ দিয়া নিজে একাকী একটি মসজিদে গিয়া অবস্থান করেন। নাদির সৈন্তের নির্বিচার হত্যা-লীলায়, দেখিতে দেখিতে দিল্লী শব-পুরীতে পরিণত হয়। নিরুপায় মোগল সম্রাট নাদিরের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া যুক্তকরে দয়া ভিক্ষা করেন। নাদির সম্রাটের প্রার্থনা পূর্ণ করেন—হত্যা-লীলা বন্ধ করিবার আদেশ দেন। এইভাবে নাদির তাঁহার ভারত অভিযান শেষ করেন—প্রচুর ধন-রত্ন, ময়ুর-সিংহাসন এবং বাদশাহ-কন্তাকে পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করিয়া ধূমকেতু নাদির ভারতের আকাশ হইতে বিদায় গ্রহণ করেন।

ইহার পর, নাদির বোখারা-অভিযানে-ব্যাপৃত পুত্র রেজা কুলির সহিত মিলিত হন। (১৭৪০) রেজা কুলি পিতার সুযোগ্য পুত্র—পিতার মতই দুঃসাহসী এবং পিতার মতই যোদ্ধা। পিতা কিন্তু পুত্রের এই বীর্য্যবত্তাকে অকুণ্ঠচিত্তে অভিনন্দন জানাইতে পারেন না—পুত্রের প্রতি পিতার ঈর্ষা জন্মে। এই ঈর্ষা একটি ঘটনায় দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠে এবং রেজার সুন্দর দুইটি চক্ষু পুড়াইয়া দেয়। নাদিরকে একবার কয়েকজন পাঠান গুলি করিয়া মারিবার চেষ্টা করে। গুলি নাদিরের কাণের পাশ দিয়া চলিয়া যায় বটে কিন্তু সন্দেহের ধোঁয়ায় তাঁহার মন কালো হইয়া যায় এবং ক্রোধের বারুদে আগুন লাগিয়া যায়। তাহার মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়—গুলির পিছনে রেজাকুলির অদৃশ্য হস্ত আছে। রেজাকে অন্ধ করিবার আদেশ দিয়া তিনি প্রতিবিধান করেন। ইহার

জন্ত পরে অবশ্য তিনি মনস্তাপ কম ভোগ করেন নাই বটে, কিন্তু গোড়াতেই পুত্র-বিদ্রোহের জড় মারিয়া রাখেন। রেজা বীরের মত পিতার শাস্তি মাথা পাতিয়া গ্রহণ করেন এবং বলেন—"এই চক্ষু আমার নয় এ সমগ্র ইরাণ জাতির চক্ষু"।

"বোখারা" অভিযান সম্পন্ন করিয়া নাদির "খিবা" অধিকার করেন (১৭৪০) এবং পারস্তকে এক বিরাট সাম্রাজ্যে পরিণত করেন। এখানেই যদি নাদির তাহার অভিযানে পূর্ণচ্ছেদ টানিয়া দিতেন, তাহা হইলে নাদির ইতিহাসে স্বদেশ-ভক্তবীররূপে স্মরণীয় হইয়া থাকিতেন। কিন্তু তাহা না করিয়া তিনি "লেস্‌গাই" অভিযানে উদ্যত হন। দাঘিস্তানের এই লেসগাই জাতিরা খুবই দুর্দ্ধর্ষ। ইহাদের উপর নাদিরের আক্রোশও ছিল। কারণ নাদিরের দাদাকে ইহারা হত্যা করে। কিন্তু যিনিই এই জাতিকে পরাজিত করিতে গিয়াছেন, তিনিই নিজের বিনাশ ডাকিয়া আনিয়াছেন। নাদিরের জিদ—দমন না করিয়া ছাড়িবেন না—ভ্রাতৃ-হত্যার প্রতিশোধ না লইয়া ছাড়িবেন না। এদিকে প্রজাদের ধনপ্রাণের ক্ষতির অন্ত নাই। ভারত হইতে যে ধনসম্পত্তি আনিয়াছেন তাহাতে হাত না দিয়া নাদির নতুন করিয়া প্রজার ধন শোষণ করিতে থাকেন। ১৭৪১-৪২ এক বৎসর ধরিয়া বার বার আক্রমণ করিতে গিয়া নাদির শুধু ধন-প্রাণই নষ্ট করেন, তেমন কোন কেন, কোন ফলই পান না। নাদিরের চাহিদা প্রজাদের সহ্যের সীমা ছাড়াইয়া যায়। তারপর তুরস্ক অভিযানের প্রস্তুতিতে এবং সেই যুদ্ধে ধনপ্রাণের ক্ষয় ক্ষতিতে প্রজাদের মধ্যে সক্রিয় প্রতিরোধের স্পৃহা জাগ্রত হয়। অনিবার্য্য অসন্তোষ এখানে ওখানে বিদ্রোহের আকারে উৎক্ষিপ্ত হয়।

দরবন্দ ও তবরশরণ, শিরোয়ান, জর্জ্জিয়া, দাঘিস্তান—অস্ত্রাবাদ,—চারিদিকে বিদ্রোহের আগুন জলিয়া উঠে। তখন নাদির অনেকটা পাগলের মত। রক্ত দিয়া বিদ্রোহের আগুন নিভাইতেই তিনি অভ্যস্ত। অভ্যস্ত পথেই তিনি অগ্রসর হন। প্রতি দৃষ্টিতে তিনি হিংসা দেখেন—প্রতি আচরণে তিনি গোপন ষড়-যন্ত্রের গন্ধ পান। হত্যার আদেশ ছাড়া নাদিরের মুখে কথা নাই—প্রত্যেকটি নাগরিকের প্রাণে আতঙ্ক, প্রত্যেকটি পার্শ্বচর সন্ত্রস্ত—কখন কাহার হত্যার আদেশ

হয়। এমন দিন যায় না—যেদিন প্রাণদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয় না। একদিকে—প্রত্যেকের উপর করভার—রাজকর রাজকোষে জমায়েৎ করিবার আদেশ; অন্যদিকে সন্দেহের উৎকট আক্রমণ। আত্মীয়-স্বজন কাহারও অব্যাহতি নাই—রাজকর কড়ায় গণ্ডায় চুকাইয়া দেওয়ার আদেশ। ভ্রাতুষ্পুত্র আলির উপরও পরোয়ানা—অবিলম্বে কর চাই।

ঐতিহাসিকরা বলেন—এই সময়ে নাদিরের অনেক পরিমাণে ক্ষিপ্তের অবস্থা। আতঙ্ক যত বেশী তত অমানুষিক অত্যাচার—যত আতঙ্ক তত সন্দেহ আর তত কল্পিত ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার প্রাণপণ প্রচেষ্টা। এই উন্মত্তের হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিবার পথ তখন একটিমাত্রই খোলা—নাদিরকে অপসারিত করা। সালে বেগ প্রভৃতি দেহরক্ষীরাই নাদির হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন এবং নাদিরের নিদ্রিত অবস্থায়, শিবিরে প্রবেশ করিয়া—অস্ত্রাঘাত করেন। দেশের-গৌরব এবং দেশের-আতঙ্ক নাদিরের এইভাবে দিগ্‌বিজয়ী জীবনের উপর যবনিকাপাত হয়।

নাদির সম্পর্কে ঐতিহাসিক তথ্য মোটামুটি এইটুকুই পাওয়া যায়। আর যাহা পাওয়া যায় তাহা কিংবদন্তী। [ঐতিহাসিক স্যার মর্টিমার ডুর্যাণ্ড ইতিহাস ও কিংবদন্তী মিলাইয়া নাদিরশাহের একখানি সুখপাঠ্য জীবনী লিখিয়াছেন”—এই জীবনীই নাট্যকারের সহায় হইয়াছে। (নাট্য-কাহিনী= ইতিহাস+কিংবদন্তী)]

এখন, ইতিহাস হইতে বিযুক্ত করিয়া না দেখিলে, নাদিরকে, সামন্ততান্ত্রিক সমাজের মত একটি সমাজের একজন ব্যক্তিহিসাবে, উচ্চাকাঙ্ক্ষাসম্পন্ন দুঃসাহসী ও দুর্দ্ধর্ষ যোদ্ধা হিসাবে, রণ-কুশল সৈন্যাধ্যক্ষ এবং স্বৈরাচারী একজন শাসক বা শাহ হিসাবেই দেখিতে হইবে; আর বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে হইবে, নাদিরের এই বিস্ময়কর উত্থানের এবং শোচনীয় পতনের কারণগুলিকে। ঐতিহাসিক তাহার সমাজ-বিজ্ঞানের জ্ঞানালোকে অবশ্যই নাদিরের মধ্যে কোন অলৌকিক শক্তির প্রেরণা দেখিতে পাইবেন না,—আবিষ্কার করিবেন—সেই সামাজিক অবস্থাটি

যাহাকে নাদিরের "পরিবেশ" বলা চলে, দেখিতে বলিবেন,—ব্যক্তি-নাদিরের দেহমনের বৈশিষ্ট্য এবং এই পরিবেশের সহিত ব্যক্তির বুঝাপড়া করার ইতিহাস-টুকু এবং দেখাইবেন,—কেমন করিয়া নাদির তিলে তিলে শক্তির অধিকারী হইয়াছেন, কেমন করিয়া প্রত্যেকটি জয়ের মধ্য দিয়া তিনি দেশবাসীর শ্রদ্ধাভক্তি, ভয়ের পাত্র হইয়া উঠিয়াছেন তথা ব্যক্তিত্বের আকর্ষণী শক্তির পরিধিকে সম্প্রসারিত করিতে করিতে পারস্যের সম্রাট হইয়া বসিয়াছেন, আবার কেমন করিয়া ভুল নীতির জন্য, মুক্তিদাতা নাদিরশাহ্ স্বদেশবাসীর শ্রদ্ধাভক্তি ও আস্থা হারাইয়া সমগ্র দেশকে শত্রুশিবিরে পরিণত করিয়াছেন এবং একদা-অনুগত বন্ধু-বান্ধবদেরই হস্তে নিষ্ঠুরভাবে নহত হইয়াছেন। অবশ্য ব্যক্তির মধ্যে নানা কামনা-বাসনার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বা দ্বন্দ্বের ফলে ব্যক্তির মানসিক প্রকৃতিতে যে পরিবর্তন ঘটিয়াছে, তাহাও ঐতিহাসিক উল্লেখ করিতে না পারেন এমন নহে। এক কথায় ঐতিহাসিক নাদিরকে রাজনৈতিক-অর্থ নৈতিক অবস্থার মধ্যে রাখিয়াই দেখিতে বা দেখাইতে চেষ্টা করিবেন। তারপর মনস্তত্ত্ববিদের কাছে নাদিরের আচরণ—"manic-depressive insanity"-র লক্ষণ বলিয়া প্রতিভাত হইতে পারে। নাদিরকে 'Self-elation'-এর 'exaltation'-এর এক উৎকট নিদর্শনও বলা যাইতে পারে। এক্ষেত্রেও দেখান যাইতে পারে—নাদির "displays an attitude of lofty superiority, an exaggerated belief in his own capacities, there is nothing he can not achieve ; he feels and therefore* believes that physically and mentally he is a superman. His excitement is an excitement of a particular kind ; it is not specifically amorous or fearful or curious or altruistic, it is the excitement of an intensified self.assertion unbalanced, unchecked by any effective self criticism or by deference to any other person—" (Outline of Abnormal Phychology.—356) সংক্ষেপে—মনঃসমীক্ষকের চোখে নাদির অহং-প্রতিষ্ঠার এক উৎকট বিকৃতি। নাদির নিজেকে অতিমানব মনে করিলেও এবং অতিমানব বলিয়া উচ্চকণ্ঠে

ঘোষণা করিলেও—তাহার অতিমানব—অভিমান মনের বিকৃতি মাত্র—বাস্তবিক কোন ব্যাপার নয়।

দিগ্বিজয়ী নাটকে নাদির

কিন্তু নাট্যকার পুরোপুরি ঐতিহাসিকের বা মনস্তাত্ত্বিকের মনোভঙ্গী লইয়া নাদির-চরিত্র উপস্থাপিত করিতে যান নাই। তিনি নাদিরের উপর "অতিমানব" দর্শনের দিব্য আলোক প্রক্ষেপ করিয়াছেন। নাদির তাঁহার কাছে "অতিমানব" —("Superman" না বলিয়া "Overman" বলাই সঙ্গত) নাদিরের জীবনের ইতিহাস এখানে গৌণ—উপায়, "নাদিরের জীবনের····তত্ত্বকথা" (philosophy) মুখ্য বা লক্ষ্য। নাট্যকারের নিজের স্বীকৃতিকেই সাক্ষ্য হিসাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে—"নাদিরের জীবনের যে তত্ত্বকথা (philosophy) আমি এই নাটকে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি, তাহা ইতিহাস-বিরোধী নয়।" অবশ্য শুধু 'তত্ত্বকথা' হইলে বলিবার কিছুই থাকিত না, এখানে 'তত্ত্বকথা'কে নাট্যকার অতিমানব-রহস্যে মণ্ডিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

নাট্যকারের এই উক্তি অবশ্য স্বীকার্য্য—"নাটকের অনেক চরিত্র এবং দৃশ্য ঐতিহাসিক। কোন স্থলেই আমি ইচ্ছা করিয়া ইতিহাসের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করি নাই এবং নাটকের বাহিরের ঐতিহাসিক রূপটিকেও অবহেলা করি নাই"; ইহাও স্বীকার্য্য—স্বাধীন কল্পনায় নাট্যকারের এবং ঔপন্যাসিকের চিরন্তন অধিকার আছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও অবশ্য—স্বীকার্য্য ঐতিহাসিক চরিত্র অবলম্বনে নাটক রচনা করিতে গেলে **বাহিরের ঐতিহাসিক রূপটি** রক্ষা করাই বাস্তবতার পক্ষে যথেষ্ট নয় বরং কল্পনার পাখায় ভর দিয়া উড়িবার স্বাধীনতা যতই থাক, স্বাধীনতাকে স্বৈরাচারের বিশৃঙ্খলা বা অসঙ্গতি হইতে মুক্ত রাখিতে হইবেই। বাহিরের ঐতিহাসিক রূপের কাঠামোতে ব্যক্তি-চরিত্রের যে প্রতিমা স্থাপন করিতে হইবে তাহাকে ব্যক্তি-হিসাবে বাস্তবিক এবং আদর্শায়নের দিক দিয়া চিত্তাকর্ষক ও সঙ্গতিময় করিয়া তুলিতে হইবে। অন্যথা, বাহিরের রূপগত

বাস্তবতা সত্ত্বেও, অন্তরের অসঙ্গতিতে, সৃষ্টির মহিমা (high seriousness) ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িবেই। নাট্যকারের কাছে "নাদিরের-ইতিহাস" এবং নাদিরের তত্ত্ব-কথা—এই দুইটির প্রথমটি যেন "রূপ" (Form) এবং দ্বিতীয়টি যেন "ভাব" (Content)। তিনি ঐতিহাসিক ঘটনা-রূপ 'রূপে'র মধ্যে অতিমানবের পতন -তত্ত্ব-রূপ "ভাব"কে অঙ্গ দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—এই নাটকে নাট্যকার 'অতিমানবের ট্র্যাজেডি' অঙ্কনের চেষ্টা করিয়াছেন—কক্ষচ্যুত জ্যোতিষ্কের মত পথহারা প্রতিভার পতন দেখাইতে চাহিয়াছেন। কিন্তু উদ্দেশ্যের প্রতি একলব্য-দৃষ্টি না থাকায়, "ঐতিহাসিক-নাদির", "ব্যক্তি-নাদির" এবং "অতিমানব-নাদির এই তিন সত্তার মধ্যে পূর্ণ সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারেন নাই। কোন চরিত্রে বহু সত্তা থাকাই দোষাবহ ব্যাপার নহে—কিন্তু বহু সত্তার মধ্যে একটা সঙ্গতি না থাকিলে চরিত্রের "ঐক্য" তথা জীবন-ভাষ্য (criticism of life) হিসাবে গুরুত্ব কমিয়া যায়—এ কথা অবশ্যই স্বীকার্য্য।

নাদিরকে পুরাদস্তুর ঐতিহাসিক নাদির রাখিয়াই সুন্দর একখানি ট্র্যাজেডি রচনা করা চলে। যিনি একদিন দেশের মুক্তিদাতারূপে বন্দিত তিনিই এক দিন দেশবাসীর হস্তে, অনুগত এবং বহুবিশ্বস্ত দেহরক্ষীর হস্তে নিহত। শোচনীয় পরিণামই বটে! আবার এই ট্র্যাজিডির নিমিত্তকে বাহিরের ঘটনায় রাখিয়া, হৃদয়ের হাহাকারের মধ্যেও স্থাপন করা সম্ভব—এই ট্র্যাজেডি নাদিরের ব্যক্তি সত্তার ট্র্যাজেডি স্নেহার্ত্ত এবং প্রেমার্ত্তের আত্মক্ষয়ের ট্র্যাজেডি। আর এক ট্র্যাজেডি ও কল্পনা করা যাইতে পারে—ইহা অতিমানব নাদিরের ট্র্যাজেডি—বিরাট আদর্শের অপরিপূরণের জন্য ধর্ম্মাঘাতজনিত ট্র্যাজেডি—মহত্তম আদর্শের উদ্দীপনায় অস্থির ও নিষ্ফল সংগ্রাম করিতে করিতে শোচনীয় ভাগ্য-বিপর্য্যয় ঘটাইবার ট্র্যাজেডি—সমগ্র বিশ্বকে এক ধর্ম্মরাজ্য পাশে বাঁধিবার তথা সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মবুদ্ধির প্রেরণা হইতে মানব-সমাজকে মুক্ত করিবার জন্য সংগ্রাম করিতে গিয়া—ক্ষুদ্রবুদ্ধি মানুষের হাতেই প্রাণ দেওয়ার ট্র্যাজেডি। খ্রীষ্টোফার মার্লো "ট্যাম্‌বারলেন্ দি গ্রেট" নামক নাটকে দিগ্বিজয়ী তৈমুরলঙ্গের জীবনকে

যেরূপ—"tragic glass-এ" প্রতিফলিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন—তাহা অবশ্য এক্ষেত্রে ব্যবহার করার অবকাশ তেমন নাই। তৈমূরলঙ্গ অপ্রতিহত দিগ্বিজয়ী হওয়া সত্ত্বেও মরণশীল মানুষ—the scourge of god হওয়া সত্ত্বেও তাঁহাকে মৃত্যুর কাছে হার মানিতে হইবে! তাহার আর্ত্তনাদ—shall sickness prove me now to be a man that have been termed the terror of the world? নাদিরে এই ট্র্যাজেডির সুর সৃষ্টি করা একেবারে অসম্ভব না হইলেও ইতিহাস—অবাঞ্ছিত। যাহা হউক, নাট্যকার **ঐতিহাসিক-নাদির ব্যক্তি-নাদির** এবং **অতিমানব-নাদির** এই তিন নাদিরের উপাদানে দিগ্বিজয়ী নাটক রচনা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং তিনের সমবায়ে যে একক ব্যক্তি-সত্তাটি সেই সত্তারই ট্র্যাজেডি উপস্থাপিত করিয়াছেন। তবে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন—বিচার্য্য বিষয়। কিন্তু, যে কথা আগেই বলা হইয়াছে—নাট্যকার History of Nadir এবং Philosophy of Nadir-এর মধ্যে যাহাকে ঠিক অবিরোধ সমন্বয় বলে তাহা সৃষ্টি করিতে পারেন নাই। এ কথা সত্য, নাদিরশাহের **ইতিহাসের বাহিরের রূপটি** নাটকে আছে—[ভারত-অভিযানের পরে—দেশে ফিরিয়া গিয়া (রাজনৈতিক আর্থনৈতিক কারণে) দেশবাসীরই উপর অত্যাচার—সেই অত্যাচারের প্রতিক্রিয়ার ফলে দেশবাসীর হস্তে অপমৃত্যু], কিন্তু এ কথা সত্য নহে যে—**ইতিহাসের ভিতরের রূপটিও** পুরোপুরি রহিয়াছে। দেশবাসীর উপর অত্যাচার ইতিহাস-বিরোধী নহে বটে, কিন্তু অত্যাচারের মূলে যে কারণ আরোপ করা হইয়াছে তাহা কোন ইতিহাসেই লিখিত হয় নাই। স্বাধীন কল্পনার অধিকার স্বীকার করিয়া লইয়াও এ কথা বলা যাইতে পারে—নাদিরের মুখে "শাস্তি দানের তত্ত্বকথা" যাহা দেওয়া হইয়াছে (এই আশায়—যদি সেই শাস্তির ফলে সমস্ত ইরাণ-জাতির সজীব মূর্ত্তির একবার দেখা পাই") এবং তাঁহার আচরণে যে ভাবোদ্বেলতা প্রকাশ পাইয়াছে তাহাতে চরিত্রটি ঐতিহাসিক বাস্তবতার পরিধি হইতে বেশ খানিকটা দূরে সরিয়া পড়িয়াছে। অথচ জাতিপ্রীতির উৎসমুখ হইতেই

যে নিষ্ঠুরতম অত্যাচারসমূহ উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে—এই প্রস্তাবটি যুক্তিসঙ্গতভাবে প্রমাণিত বা উপস্থাপিত করিতে হইলে যেরূপ ঘটনা-বিন্যাস ও ভাব কল্পনার আয়োজন আবশ্যক তাহা এখানে নাই। নাদিরের অত্যাচারের উদ্দেশ্য—"জাতি-মঙ্গল, মানব-চির-প্রীতি"—এই সংস্কার সৃষ্টি হইতে পারে এমন অতিমানবীয় আদর্শপরায়ণতা নাদিরের মধ্যে কার্য্যতঃ প্রকাশ পায় নাই। নাদির বাস্তবিকই যে একজন অতিমানব—(সকল জাতির বিধাতা—নূতন রূপে প্রকটিত, দেশ-ধর্ম-নীতি তাঁহার স্বরূপে বিকশিত—তাঁহার পরম-অনুভূতি জাতিমঙ্গল, মানব-চির প্রীতি বোধ-অতীত—মঙ্গলাচরণ দ্রষ্টব্য) তাহা সর্বতোভাবে প্রকটিত হয় নাই। অতি মানবের বাহ্যলক্ষণ নাদিরে না আছে এমন নহে—"Energy intellect and pride—these make the superman—" এবং এগুলি নাদিরের আছে। নাদিরের নীতি—morality of masters (Herren-moral), Heerden moral—(morality of herd) নয়।

নাদিরের কাছেও—"To be brave is good"—(নীৎসে). All that increases the feeling of power, the will to power, power itself in man. What is bad ? All that comes from weak-ness (Nietzsche) কিন্তু ইহা বাহ্য লক্ষণ মাত্র। অতিমানবের সমস্ত শক্তি-সাহস নিয়ন্ত্রিত হওয়া চাই একটি কেন্দ্রগত মহান্ উদ্দেশ্য দ্বারা—"by some great purpose" কারণ—"To have a purpose for which one can be hard upon others, but above all upon one's self, to have a purpose for which one will do almost anything…that is the final patent of nobility, the last formula of the superman." মহান উদ্দেশ্য না থাকিলে এবং সঙ্কল্প ও কার্য্যে 'উদ্দেশ্য'-সাধনা ব্যক্ত না হইলে, শুধু শক্তির প্রকাশ মাত্রকেই অতিমানবত্ব বলা চলে না। নাদিরশাহের অতি-মানবীয় সঙ্কল্প—"আমি সমগ্র পৃথিবীতে একছত্র মহম্মদীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে চাই"—"আমি সমগ্র হিন্দুস্থানে নূতন শাসনতন্ত্র, নূতন ধর্ম্ম-তন্ত্র প্রচার কর্তে চাই।" কিন্তু এই সকল সঙ্কল্পের সহিত নাদিরের নিষ্ঠার যোগ নাই। ভারত জয়

করিবার পরে নাদির ভারতে কোন নূতন শাসনতন্ত্র বা ধর্ম্মতন্ত্র, কোনটিই প্রবর্ত্তন করেন নাই বা করিতে চেষ্টা করেন নাই অথবা ভারত বিজয়ের পরে—চীনে বা অন্য কোন দেশে তিনি অভিযান করেন নাই। কখনও সে সঙ্কল্প ব্যক্ত করেন নাই। অতিমানবীয় আদর্শের প্রতি নাদিরের আন্তরিক কামনা বা নিষ্ঠা থাকিলে, আদর্শ-চ্যুতি-জনিত অস্থিরতা বা বেদনা অবশ্যই দেখা দিত। কিন্তু আক্ষেপেরই কথা—নাট্যকার নাদিরকে অন্য দ্বন্দ্বের আবর্ত্তে জড়াইয়া লইয়া অতিমানবের মহান সঙ্কল্পটি একেবারেই ভুলাইয়া দিয়াছেন এবং অসিদ্ধির জন্য অতিমানবের মধ্যে যে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া প্রত্যাশিত তাহা ব্যক্ত করেন নাই। এই কারণে নাদিরের সঙ্কল্প 'মুখের কথা হইয়াই আছে নাদির চরিত্রের স্বাভাবিক সংস্কারে পরিণত হয় নাই। ফলে নাদির হইয়াছে 'ঘরে ও নহে পারে ও নহে—যে জন আছে মাঝখানে'—এমনি ধরণের একটি চরিত্র।

অতিমানবীয় প্রেরণা বা চেতনা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া জৈবিক প্রেরণায় অর্থাৎ হৃদয়ের সহজ কামনা-বাসনার দ্বন্দ্ব দেখাইতে পারিলে নাদিরশাহ চরিত্রটি বাস্তবতার দিক দিয়া আরো যুক্তিসঙ্গত হইতে পারিত। নাট্যকার নাদিরের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণের সময় যে পরিমাণে ইতিহাসকে অনুসরণ করিতে চেষ্টিত হইয়াছেন, সেই পরিমাণে ভাব-কল্পনার সহিত ঐতিহাসিক ঘটনা-বিন্যাসের সমন্বয় স্থাপন করিতে, কার্য্যকারণ যোগ রক্ষা করিতে, সচেতন হ'ন নাই। একটু সচেতন হইলে, নাদিরের ভারত হইতে পারস্যে প্রত্যাবর্ত্তন—রেজাকুলির প্রতি দণ্ডাদেশ—সিতারার প্রতি বহিষ্কার আদেশ—দেশবাসীর উপর নিষ্ঠুর অত্যাচার প্রভৃতি সমস্ত ঘটনা-পরম্পরাকেই অতিমানবীয় আদর্শের সহিত সঙ্গতি রাখিয়াই সন্ধি-সমন্বিত রূপ দিতে পারিতেন। সত্য বটে যে নাদিরের জীবনে যে ট্র্যাজেডি দেখানো হইয়াছে তাহা যৌগিক। দিগ্বিজয়ী নাদিরের ভিতরে-বাহিরে শোচনীয় পরিণতি ঘটিয়াছে—ভিতরে পুত্র বিযুক্ত হইয়াছে—হারেম বিরাক্ত হইয়াছে এবং সেই বিষ-ক্রিয়ার প্রতিষেধ করিতে

গিয়া প্রাণপ্রিয় পুত্রকে অন্ধ করিয়াছেন—প্রেমিক সিতাবাকে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন। ইহারই ফলে, স্নেহ ও প্রেমের তৃষ্ণায় তাহার হৃদয় বেদনায়ও অব্যক্ত হাহাকারে ভরিয়া গিয়াছে। আর বাহিরে অত্যাচারে অত্যাচারে দেশবাসীর সমস্ত শ্রদ্ধা ভক্তি আনুগত্য হারাইয়া বসিয়াছেন—সমগ্র দেশকে শত্রু শিবিরে পরিণত করিয়াছেন এবং শেষ পর্য্যন্ত গুপ্তঘাতকের আঘাতে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন। ইতিহাসের পটভূমিতে, পারস্ত সম্রাট ভারত-বিজয়ী বা দিগ্বিজয়ী নাদিরশাহের শক্তিমদমত্ত রাজনৈতিক জীবনের এবং পারিবারিক জীবনের ট্র্যাজেডি দেখাইবার অবকাশ নাদিরের ইতিহাসে প্রত্যক্ষ, কিন্তু অতিমানবতার আরোপ সহজ হইলেও অতিমানব—ধর্ম্মাঘাত-জনিত ট্র্যাজেডি দেখানর অবকাশ তেমন নাই। এই নাটকে ব্যক্তি-নাদির বা শাহ-নাদিরের ট্র্যাজেডির পরিকল্পনা যতটুকুই ব্যক্ত হউক না কেন অতিমানব-নাদিরের ট্র্যাজেডির ধ্যান নাট্যকারের মধ্যে স্পষ্ট আকার পায় নাই এবং পায় নাই বলিয়া নাদিরের পতনে অতিমানবের পতন-জনিত বিস্ময় বা বেদনা জাগে না।

নাট্যকার কিন্তু মূলতঃ অতিমানব-রূপেই নাদিরকে রূপ দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। মঙ্গলাচরণে তিনি নাদিরকে—"সকল জাতির বিধাতা"র যুগ-অবতার বলিয়া বন্দনা করিয়া লইয়াছেন, রহমতের মুখে নাদিরকে তিনি প্রশ্ন করিয়াছেন—"সম্রাট, আপনার জীবন এমন বিচিত্র যে তার সামঞ্জস্যের সূত্র আমরা সন্ধান করিতে পারিনি; পালন না পীড়ন, ধ্বংস না সৃষ্টি, ইরাণের মুক্তি না ইরাণ সাম্রাজ্যকে দাসত্বের কঠিন নিগড়ে বন্ধন—আপনার কার্য্যের যথার্থ উদ্দেশ্য কি?" নাদিরের মুখে উত্তর ও একটা দিয়াছেন—"আমি ঈশ্বরের প্রতিনিধি—জগতের শাস্তিদাতা।......যে মানুষের সামান্য ত্রুটী ও ক্ষমা করে না, জাতির ত্রুটী ক্ষমা করে না—সেই ক্ষমাহীন দয়াহীন বিচারক ঈশ্বর আমায় পৃথিবীতে পাঠিয়েছে—পাপীর দণ্ড বিধান করতে।" নাট্যকার এই অতিমানব-নাদিরকেই রূপ দিতে ইচ্ছা করিয়াছেন

কিন্তু যিনি বিধাতার যুগাবতার—ঈশ্বরের প্রতিনিধি—দেশ ধর্ম্মনীতি যাঁহার স্বরূপে বিকাশ, যিনি নীৎসের ভাষায় বলিলে—"Beyoud good and evil"—তাঁহার ট্র্যাজেডির যোগ্য রূপ এখানে ব্যক্ত হয় নাই। উদ্দেশ্য যাহাই হউক; এখানে কল্পিত হইয়াছে এক শক্তিমান দিগ্বিজয়ী ব্যক্তির ট্র্যাজেডি—শক্তির মাদকতায় যিনি নিজের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাকে নষ্ট করিয়াছেন ঘরে বাহিরে—শত্রু সৃষ্টি করিয়া জীবনকে জটিল আবর্ত্তের মধ্যে নিমজ্জিত করিয়াছেন এবং তথা শোচনীয় পরিণতি ঘটাইয়াছেন। অতিমানবের ট্র্যাজেডিকে নাট্যকার শেষ পর্য্যন্ত—ব্যক্তি-নাদিরের স্নেহের ও প্রেমের অবলম্বন হারাইবার ট্র্যাজেডি—পরিকল্পনার সংকীর্ণক্ষেত্রে গুটাইয়া আনিয়াছেন। বিচার করিয়া দেখা যাউক—সেই পরিকল্পনা কতদূর কার্য্যে পরিণত হইয়াছে।

দিগ্বিজয়ী নাটকের জাতি-পরিচয়

When men grow insolent with prosperity and trample on the prayers of the weak, then into their palaces into their inmost souls, there comes, says Homer, the dark figure of Ate. Who is Ate ? Ate is human infatuation, the blindness that darkens those who sin through pride. And she does not only blind ; She drives her victims to compass their own doom, 'God maddens first the man He would destroy."

[Literature And Psychology"
—F. L. Lucas]

নাট্যকার নাটকের 'নিবেদন'-অংশে লিখিয়াছেন—"'দিগ্বিজয়ী" নাটকখানি ঐতিহাসিক হইলেও ইহার মূল ভাবটি চিরন্তন, সেইজন্য ইহার কোন

ঐতিহাসিক নাম (অর্থাৎ 'নাদিরশাহ' এই নাম) দিলাম না............
এই সকল অতিমানবের জীবন কথা সঙ্গে সঙ্গে অনেক ব্যক্তি দেশও জাতির মর্ম্ম কথা আসিয়া পড়ে এবং নাটকও বিনা আয়াসে "ঐতিহাসিক নাটক" হইয়া উঠে। সে হিসাবে "দিগ্বিজয়ী" ঐতিহাসিক নাটক; কিন্তু এ কথাটা বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে, নাদিরের জীবনের যে তত্ত্ব কথা (Philosophy) আমি এই নাটক দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি, তাহা ইতিহাস-বিরোধী নয়।" এই 'নিবেদন' হইতে অনায়াসেই নাট্যকারে উদ্দেশ্য আবিষ্কার করা যায় এবং সিদ্ধান্তও করা যায় যে 'কাহিনীর উৎস' ভিত্তিতে নাটকখানি ঐতিহাসিক বটে, কিন্তু উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে নাটকখানি "তত্ত্ব-মুখ্য"; কারণ নাটকে "নাদিরের জীবনের তত্ত্বকথা"কেই মুখ্য উপস্থাপ্য করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বলাবাহুল্য, তত্ত্বমুখ্য নাটকে চরিত্র-চিত্রণ বা রস-সৃষ্টি অনাবশ্যক নহে।

তারপর প্রশ্ন—দিগ্বিজয়ী নাটককে ট্র্যাজেডি বলা যাইবে কি না? মার্লো যেমন তাহার ('ট্যামারলেন দি গ্রেট" নাটকের 'প্রোলোগ'-এ লিখিয়াছেন —"View but his picture in this tragic glass......" আমাদের নাট্যকার 'নিবেদন'-এ তেমন কোন কথা লেখেন নাই, সুতরাং নাটকখানি তাঁহার মতে কি তাহা জানিবার সুযোগ আমাদের নাই। অবশ্য এই সুযোগ না দিয়া একদিক দিয়া, তিনি উপকারই করিয়াছেন—তিনি সমালোচকের বুদ্ধি বিচারকে প্রভাবিত করিতে চেষ্টা করেন নাই—নাটকখানিকে নিজের শৈল্পিক মূল্যেই আত্ম পরিচয় দিতে বলিয়াছেন।

তবে নাট্যকার না বলিয়া দিলেও, নাটকখানি আপাতদৃষ্টিতে অবশ্যই ট্র্যাজেডি বলিয়া প্রতিভাত হইবে। নাদিরশাহের মত একজন দিগ্বিজয়ী সম্রাটের পতন যাহাতে উপস্থাপিত হইয়াছে, সেখানে— fall of a great monarch" এর সূত্র প্রয়োগ করিয়া, একরকম চক্ষু বুঝিয়াই বলিয়া দেওয়া যাইতে পারে—দিগ্বিজয়ী নাটক একখানি ঐতিহাসিক ট্র্যাজেডি। নাট্যকার অবশ্য নাটকের মধ্যে কোন কোন পাত্রের মুখে, নাদিরের ট্র্যাজিকত্বের

তথা নাটকখানির ট্র্যাজিকত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন॥ সালে বেগ—যেখানে বলেন—"পৃথিবীতে অনেক প্রতিভা পথ হারা হ'য়ে নভঃস্খলিত জ্যোতিষ্কের মত কোথায় ঘূর্ণিপাকের অন্ধকারে ডুবে গেছে, না হয় আর একটা যাবে" (৩য় অঙ্ক), সেখানে নাট্যকার নাদিরের ট্র্যাজেডির প্রকৃতির প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আবার পঞ্চম অঙ্কেও সালে বেগের মুখে ট্র্যাজেডির কারণটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন—'ঈশ্বর তাকে শক্তি দিয়েছিলেন অনন্ত, কিন্তু সে-শক্তির সদ্ব্যবহার সে করেনি"। প্রথম অঙ্কে জ্যোতিষীর মুখে নাদিরের পতনের তথা ট্র্যাজেডির কারণ প্রকাশ করিয়াছেন—"আপনি নিজে যদি আপনার শত্রুতা না করেন—জগতে কোন শত্রু আপনার কিছুই করতে পারবে না"। :তৃতীয় অঙ্কের শেষাংশে জনৈকা-"রমণী"র অভিশাপের মধ্য দিয়া নাট্যকার নাদিরের জীবনের ট্র্যাজেডির স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"স্ত্রীপুত্র কন্যা পারিবারিক জীবন বিষাক্ত হবে—নিখিল সংসার বিষাক্ত হবে.......তোমার সিংহাসন বিষাক্ত হবে—প্রজা বিষাক্ত হবে—হারেম বিষাক্ত হবে..."। এই সকল উক্তি সাজাইয়া গুছাইয়া আমরা নাট্যকারের পরিকল্পনাটি এইভাবে ব্যক্ত করিতে পারি—নাদির একটি প্রতিভা—অনন্তশক্তি দিয়া বিধাতা তাঁহাকে পাঠাইয়াছেন। কিন্তু এই শক্তির অপব্যয় করিয়া তিনি পথহারা হন—স্ত্রী-পুত্র-কন্যা বিশ্বসংসারকে শত্রু করিয়া তুলেন ; ফলে শোচনীয় পরিণতিতে তাঁহার জীবনের শেষ হয়॥

দেখা যাক, নাট্যকার কিভাবে এই পরিকল্পনাকে কার্য্যে পরিণত করিয়াছেন।

নাদির "পারস্যদেশকে তুর্কী রুশ আফগান, আরমনী উরাবেগী দস্যুর হাত থেকে উদ্ধার করেছেন। সমগ্র পারস্যজাতি একত্র হ'য়ে......নরসিংহের মাথায় স্বেচ্ছায় পারস্যের রাজমুকুট পরিয়ে দিয়েছে "অর্থাৎ নাদির শুধু এক-জন অনন্ত শক্তির অধিকারী বীর্য্যবান পুরুষ নহেন—দেশের-মুক্তিদাতা নাদির অদ্ভুত কর্মবীর—"প্রতিভা ও উদার নীতি নিয়ে জন সমাজের হৃৎপদ্ম

হতে এই মহাবীর অদ্ভুত হ'য়েছেন"........অদ্ভুত তাঁহার সাহস সূক্ষ্মগ্রাহী তাঁহার বুদ্ধি, বিস্ময়কর তাঁহার আত্মপ্রত্যয়—রহস্যময় আচরণ—"পঞ্চাশ রকম কাজ এক সঙ্গে করে—কোনটার উপর যে তার আকর্ষণ সহজে ধরা যায় না।"

অধিকন্তু আছে **পৃথিবী জয়ের উচ্চাকাঙ্ক্ষা**। তবে শুধু জয়ের জন্যই জয় নহে, কারণ নাদির তো" তৈমুরলঙ্গ কি চেঙ্গিসে খাঁর মত শুধু বিজয়ী দস্যু" নন। (নাট্যকারের কাছে)—নাদির একজন অতিমানব—সমগ্র পৃথিবীতে তিনি একছত্র মহম্মদীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে চাহেন, এক ধর্ম্ম রাজ্য পাশে খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত পৃথিবীকে বন্ধন করিতে চাহেন। তাঁহার ভারত অভিযানের উদ্দেশ্য অর্থসংগ্রহ নহে, ভারতবর্ষে নূতন শাসনতন্ত্র নূতন ধর্মতন্ত্র প্রচার করা সহস্র রাজকতার হাত হইতে ভারতবর্ষকে উদ্ধার করা। নাদিরের কাছে—"মুসলমান নামটি একটি বৃহৎ কল্পনা—অনেক ক্ষুদ্র জাতি আর ধর্ম্মকে এক করে বাঁচবার জন্য ও নামের সৃষ্টি হয়েছে"—এই উদার অনুপ্রেরণায়, এই অতিমানবীয় মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া নাদির দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়াছেন—তাঁহার কাছে—বংশ-পরিচয় অনাবশ্যক—নিজের পরিচয়ে মানুষ দাঁড়াবে ;—এই পুরুষকারই তিনি চাহেন। আভিজাত্যকে এবং দীনতাকে তিনি সমান মাত্রায় ঘৃণা করেন। কিন্তু নাদির তো শুধু সামান্য উচ্চাকাঙ্ক্ষা সম্পন্ন ব্যক্তি নহেন—তিনি যে অতিমানব —বিশ্ববিধাতারই মত "ইচ্ছার বিচিত্র শক্তির লীলা" দেখাইতেও চাহেন। [এই লীলার প্রথম অভিনয় হয় "পথের সুন্দরী" রাজপুত রমণী "সিতারা" কে প্রধানা মহিষী পদে অভিষিক্ত করায় এবং অভিজাত-কন্যা সিরাজীকে তাহারই পদতলে বসাইয়া অভিবাদন করিতে বাধ্য করায়—দ্বিতীয় অভিনয় হয়—দিল্লীতে নিষ্ঠুর হত্যা-লীলা—(শক্তির প্রকাশ—মাত্র মহতের লীলা" ?) দেখাইবার পরে, অত্যাচার প্রপীড়িতদের খাদ্য অর্থের প্রলেপ দিয়া বেদনা আরোগ্য করিবার অহঙ্কারের মধ্যে —"এই জীবন। এই শক্তি। এই আমি ! আমি হত্যা ও উৎসবকে যুগল অশ্বের মত এক রজ্জু দিয়ে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছি"]

এই অতিমানব 'সর্ব্বশক্তিমান নাদির শাহ দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়া ভারত অধিকার করিয়াছেন, ভারতের অপরিমেয় ধনরত্নের সঙ্গে একটি রমণী-রত্নও লাভ করিয়াছেন। এই রমণী সিতারা—"পথের সুন্দরী''। এই সুকণ্ঠী সুন্দরীর নয়নের অরুণ আভায় নাদিরের দৃষ্টি প্রসন্ন। সামান্ত ক্রীতদাসীকে নাদির "প্রধানা বেগম" এর আসন দান করিয়াছেন। এই হিন্দুস্থানের বালিকা সত্যই নাকি তাঁহার অন্তর স্পর্শ করিয়াছে এবং সেই স্পর্শে তিনি নূতন করিয়া যৌবন ফিরিয়া পাইয়াছেন।

কিন্তু নাদিরের পূর্ব প্রণয়িনী সিরাজী সিতারার এ সৌভাগ্যে স্বভাবতই ঈর্ষাপরায়ণা—ভ্রাতা আলির সাহায্যে সে পথের কাঁটা সিতারাকে অপসারিত করিতে চেষ্টিত। আলির এবং অন্তান্তদের ষড়যন্ত্রে দিল্লীতে বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে নাদির—'নির্বিচার হত্যার' আদেশ দেন—দিল্লী শ্মশানে পরিণত—হয়—বাদশাহের কাতর প্রার্থনায় "জগজ্জয়ী" সম্রাট ক্রোধ সংবরণ করেন। এখানে এই 'শক্তির মাদকতা'য় নাকি নাদিরের পতনের আরম্ভ। এই হত্যার আদেশ দিয়া নাদির তাঁহার—সালে বেগের মতে—অতীতকে হত্যা করিয়াছেন এবং ভবিষ্যতকেও হত্যা করিয়াছেন নাদির, নিজের সর্ব্বনাশ করিয়াছেন, পারস্ত সাম্রাজ্যের সর্ব্বনাশ করিয়াছেন—জগতের সর্ব্বনাশ করিয়াছেন। সালে বেগের মতে—মানব-চির-প্রীতির মানব-জাতির মুক্তির বৃহৎ আদর্শ হইতে নাদির ভ্রষ্ট হইয়াছেন, সাধারণ 'দস্যু'তে পরিণত হইয়াছেন। সালে বেগের আবিষ্কার—নাদির চান প্রভুত্ব চান পূজা—চান 'মানবের রক্তে স্নান করতে"।

মানব-জাতির মুক্তির কথা সালে বেগের মুখে শুনিয়া নাদির বলেন—"মানবের মুক্তির স্বপ্ন দেখ গে যাও। মানবের মুক্তি। ঈশা-মুশা দিতে পারেনি মহম্মদ বুদ্ধ দিতে পারে নি শত শত পয়গম্বর কতবার বিফল মনোরথ হয়ে পরাজিত হয়েছে—সেই মুক্তি দেবে তুমি ! * [হায়! এই কি সেই অতিমানব যিনি যুগাবতার! উদ্দেশ্যে যাহার মঙ্গলাচরণে বন্দনা করা হইয়াছে—

যুগে যুগে তুমি প্রকট নূতন রূপে
দেশ ধর্ম নীতি বিকাশ স্বরূপে—
বোধ অতীত তব পরম-অনুভূতি
জাতি-মঙ্গল, মানব-চির-প্রীতি.......

এই কথা অবশ্যই উঠিবে যে নাদির যদি অতিমানবই হন তাহা হইলে নাদিরের আচরণকে প্রচলিত নীতিসূত্র দ্বারা মাপিতে যাওয়া ঠিক নহে; আর দিল্লীর হত্যা-লীলাকেও পতনের কারণ হিসাবে কল্পনা করা চলে না—কারণ অতিমাবের আচরণ সাধারণের বোধ-অতীত"।—ধর্মনীতি তাহার স্বরূপেই বিকাশ॥ যে সালে বেগ এই হত্যা-লীলার জন্য নাদিরকে অভিযুক্ত করিয়াছেন—হত্যালীলার মধ্যে নাদিরের পতনের বীজ আবিষ্কার করিয়াছেন, তিনিই শেষ মুহূর্ত্তে ঘোষণা করিয়াছেন—"বন্ধু। তোমার কথাই সত্য। তুমি আমার কল্পনার চেয়ে সত্যই বৃহৎ।" সালে বেগের কল্পনার চয়ে বৃহৎ হওয়ার তাৎপর্য্য এই যে নাদির যে-সব নিষ্ঠুর আচরণ করিয়াছেন তাহা আপাত দৃষ্টিতে অন্যায় মনে হইলেও অন্যায় নহে—অতিমানবীয় উদ্দেশ্যেরই অঙ্গ॥ অথচ নাট্যকার এই হত্যা-লীলাকেই নাদিরের ট্র্যাজেডির প্রধান কারণ রূপে দেখাইতে চাহিয়াছেন। বাস্তবিক যে কার্য্যে অতীত ও ভবিষ্যৎ উভয়ই নষ্ট হইয়া যায় তদপেক্ষা গুরুতর কারণ আর কি হইতে পারে। কিন্তু এই হত্যালীলা নাদিরের পরবর্ত্তী জীবনকে এমন কোনভাবেই প্রভাবিত করে নাই যাহার জন্য তাহাকে কারণ বলা চলে। বস্তুতঃ হত্যার আদেশ, নাদিরের মনোবিকৃতিরূপ—কারণেরই কার্য্য অর্থাৎ নাদিরের ট্র্যাজেডির কারণ আরো গভীরে॥—মনোবিকারের মধ্যে নিহিত॥

যদি বলা যায় নাদিরের পতনের কারণ নিছক 'শক্তির মাদকতা' তাহা হইলে নাদিরের অতিমানবত্ব অবশ্যই ক্ষুণ্ণ হইতে বাধ্য। বৃহৎ বা মহৎ উদ্দেশ্য হইতে যিনি বিযুক্ত, অন্ততঃ—বৃহৎ বা মহৎ উদ্দেশ্যের জন্য যাঁহার আন্তরিক অভীপ্সাটুকুও প্রকাশ পায় না তিনি আর যাহাই হউন, নিশ্চয়ই অতিমানব নহেন। 'নাদির' অতিমানব—এই কল্পনা না করিয়া 'নাদিরের মধ্যে অতি-

মানবীয় শক্তির সম্ভাবনা ছিল কিন্তু তাহা মতি-বিকৃতির জন্য, প্রবৃত্তির অতিরেকের জন্য কার্য্যে পরিণত হইতে পারে নাই—এই পরিকল্পনা করিলেই, বর্ত্তমান অসামঞ্জস্য এড়ানো সম্ভব। কিন্তু নাট্যকারের অতিমানব—দৈব ইচ্ছারই অভিব্যক্তি এ কথা ভুলিলে চলিবে না।]

দিল্লীর হত্যালীলার পরে জনৈকা ভারতরমণীর মুখে দৈববানীর মত এক দীপ্ত অভিশাপ উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে। এই অভিশাপটিকে (পুত্র বিষাক্ত হবে, হারেম বিষাক্ত হবে, প্রজা বিষাক্ত হবে) নাট্যকার ট্র্যাজেডির অন্যতম কারণের মতই পরিকল্পিত করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, অভিশাপকে ট্র্যাজেডির কারণ হিসেবে দাঁড়করানো ঐতিহাসিক নাটকে খুবই অবাঞ্ছিত irrational"—ব্যাপার। আসলে, কি দিল্লীর হত্যা ব্যাপার, কি—এই অভিশাপ, কোনটিকেই নাদিরের ট্র্যাজেডির "কারণ" বলা চলে না, কারণ—পুত্র বিষাক্ত হওয়ার সহিত এবং প্রজা বিষাক্ত হওয়ার সহিত দিল্লীর হত্যাকাণ্ডের কোন কার্য্যকারণ-যোগ স্থাপিত হয় নাই। হত্যা-কাণ্ডের প্রতিক্রিয়ার ফলেই যে নাদিরের ভবিষ্যৎ নষ্ট হইয়াছে—ইহা নাটকে প্রমাণিত হয় নাই। (অভিশাপের সঙ্গে তৃতীয় অঙ্ক শেষ হইয়াছে)।

দেখা যাইতেছে—নাট্যকার, "**পুত্র**," "**হারেম**" ও "**প্রজা**" এই তিনটি 'অবলম্বন' বিষাক্ত করিয়া, নাদিরের জীবনকে ট্র্যাজিক' করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। পরিকল্পনা হিসাবে ইহা প্রশংসনীয়—কারণ হইাতে ট্র্যাজেডিকে বাহিরের ঘটনার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রাখিয়া অন্তর্বেদনার মধ্যে—অন্তর্দাহের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা প্রকাশ পাইতেছে॥ কিন্তু এই পরিকল্পনাকে কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে যেরূপ প্রস্তুতি আবশ্যক তাহা এখানে যথেষ্ট মাত্রায় আছে কি না তাহা অবশ্যই বিচার করিয়া দেখা দরকার।

পুত্রের বিষাক্ত হওয়া, নাদিরের পক্ষে তখনই ট্র্যাজিক হইতে পারে যখন নাদিরের পুত্রবাৎসল্য ঐকান্তিক। রেজাকুলিকে নাদির কত স্নেহ করেন—বিচারের আগে সে সম্বন্ধে কোন আভাসই পাওয়া যায় না। তবে চতুর্থ অঙ্কে,

বিচারের দৃশ্যে, নাদিরের নিজের মুখে পাওয়া যায়—"কিন্তু তোমার সমস্ত অপরাধের পরিধি আচ্ছন্ন ক'রে আছে তোমার প্রতি আমার সুন্দর অনাবিল পবিত্র, স্বার্থশূন্য স্নেহ; তুমি আমার জ্যেষ্ঠ সন্তান, একদিন তুমি আমার সর্ব্বস্বেরও অধিক ছিলে। সেদিনের স্মৃতি এখনো ম্রিয়মান হয়নি। আমি তোমার পিতা, বাইরে আমি কঠোর হ'তে পারি, কিন্তু তোমার কাছে স্নেহশূন্য নই"। সিতারার উক্তিতে পরোক্ষ সাক্ষ্য পাওয়া যাইতে পারে—'আমি জানি জাঁহাপনা কি মনোবেদনায় দিন কাটাচ্ছেন। তাঁর আহার নাই, নিদ্রা নাই, চিত্তের শান্তি একেবারে হারিয়ে ফেলেছেন। আমার আশঙ্কা হচ্ছে এতদিনে বুঝি ভারতবর্ষের অভিশাপ ফলতে আরম্ভ হ'য়েছে। নাদিরের উত্তেজনা হইতেও সাক্ষ্য সংগ্রহ করা যাইতে পারে "আজকার রাত্রি! আমার জীবনের বড় সঙ্কটাপন্ন রাত্রি!" অধিকন্তু এখানে তীব্র একটু অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্যে স্নেহ-পরায়ণতার সুন্দর অভিব্যক্তি আছে—"ঈশ্বর, ঈশ্বর, ঈশ্বর—যদি তুমি কেবল-মাত্র ভাবুকের কল্পনা আর ধর্ম্মব্যবসায়ীর পণ্য না হও, যদি মানুষের নিজের কৃতকর্মের ফলাফলের উপরেও তোমার কোনো কর্তৃত্ব থাকে, এই য়ুসুফজাই সৈনিক-পুরুষের বাক্য নিয়ন্ত্রিত কর—রেজা কুলীখাঁর বাক্য নিয়ন্ত্রিত কর!—(কার্যদ্বারা কারণ অতি সুন্দর মাত্রায় উদ্‌ভাসিত হইয়াছে)। তারপর, নাদিরের অন্তর্বিক্ষোভ "পুত্র বিষাক্ত হবে। সেই রেজা—জীবনের প্রথম-স্বর্ণরশ্মি। তখন কোথায় ছিল পারস্য-সাম্রাজ্য, কোথায় ছিল হিন্দুস্থানের ঐশ্বর্য, কোথায় ছিল ময়ূর-সিংহাসন, কোথায় ছিল—কোহিনূর-রত্ন, কোথায় ছিল ভারত নারীর প্রেম, কোথায় ছিল ভারত নারীর অভিশাপ!"—নাদিরের বাৎসল্যকেই প্রমাণ করে। সালে বেগের সাক্ষ্য—(৫ম অঙ্কে) ও অবশ্য গ্রাহ্য—"তারপর, উদ্দাম পিতৃস্নেহ—তুমি জান না রহমৎ কি ভালই বাস্‌তো ঐ রেজাকে"। এক্ষেত্রে বলা বলা যাইতে পারে—বাৎসল্যের প্রমাণ আগে না পাওয়া গেলেও কার্যক্ষেত্রে নাদিরের প্রতিক্রিয়া এবং অন্যান্যের মন্তব্যের মধ্যে বাৎসল্যের পরিচয় যথেষ্ট-মাত্রায় দেওয়া হইয়াছে এবং পুত্র বিষাক্ত করিয়া ট্রাজিক-সংবেদনা সৃষ্টির

আয়োজন যথেষ্টই হইয়াছে। কিন্তু আয়োজনকে যত যথেষ্ট বলিয়াই আমরা মনে করি না কেন, ট্র্যাজিক সংবেদনার মাত্রা খুব তীব্র হইয়াছে ইহা প্রমাণ করা চলে না। রেজাকুলিকে দণ্ড দেওয়ার পরে পিতৃ-হৃদয়ে যে বেদনা বিক্ষোভ স্বাভাবিক, তাহার কিছুই দেখা যায় না; ইতিহাসের-নাদির পুত্রের জন্য যেটুকু অনুতাপ ভোগ করিয়াছিলেন সেটুকুও এখানে পাওয়া যায় না॥ আর একটা কথাও মনে করা দরকার :—দণ্ডাদেশের ঠিক পরেই, সালেবেগ—নাদির-চরিত্রের ভাষ্যকার—যে সকল কথার অবতারণা করিয়াছেন তাহাতে রসের অপগম বা বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে। নাদিরের মধ্যে বাৎসল্যের উদ্বোধ করিবার ঠিক পরেই,—তাহার সম্বন্ধে "পুত্র, পরিবার স্বদেশ, কিছুই তার আপনার নয়"—এই ধরণের উক্তি যোজনা করায়—নাদির 'একা' তাহার কোন "আত্মীয়" নাই—এই সব কথা বলায়, 'রসের পরিপন্থী প্রযোজনা হইয়াছে। কারণ পুত্র যদি নাদিরের "আপনার"ই না হয় তাহা হইলে পুত্র-বিচ্ছেদের বেদনাও তীব্র হইতে পারে না—পুত্র-বিষাক্ত-হওয়া তেমন শোচনীয় ঘটনাও হইতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ—**'হারেম' বিষাক্ত হওয়ার ঘটনা বিচার** করা যাউক। "হারেম" অর্থে এখানে বিশেষতঃ 'সিতারা'।— (সিরাজী নয়) সিতারা রাজপুত রমণী কিন্তু "পথের সুন্দরী"॥ নাদির সিতারার রূপ-যৌবন দেখিয়া প্রথম আকৃষ্ট হন এবং শেষপর্য্যন্ত তাহাকে বিবাহও করেন॥ এই বিবাহের মূলে—যাহাকে ঠিক "প্রেম" বলা হয়, তাহা নাই॥ সিতারাকে নাদির বিবাহ করেন—"ইচ্ছার বিচিত্র শক্তির লীলা" বা খেয়াল দেখাইবার জন্য ; তবে রূপজ মোহের জন্যও বটে—"তা' ছাড়া তোমার চোখ দু'টি বেশ ভাল—কণ্ঠও মন্দ নয়॥"— নাদিরেরই স্বীকৃতি। দ্বিতীয় অঙ্কে সিরাজীর ঈর্ষার মধ্য দিয়া অবশ্য নাদিরের সিতারা-আসক্তি ব্যক্ত করা হইয়াছে "যেদিন থেকে সে রাজপুত সয়তানীকে দেখেছে, সেদিন থেকে একবারও আমার সঙ্গে দেখা করেনি।" এই অঙ্কেই সিরাজীর বক্রোক্তির উত্তরে নাদিরকে বলিতে শোনা যায়—"তোমার কথা একেবারে—মিথ্যা নয় সিরাজী। এই হিন্দুস্থানের বালিকা সত্যই আমার অন্তর স্পর্শ করেছে—আমি নূতন ক'রে

যৌবন ফিরে পেয়েছি! তুমি দিয়েছিলে মত্ততা, এ দিয়েছে অমৃত॥" এই অমৃত পান করিবার পরে নাদিরের চরিত্রে কোন ভাবান্তর ঘটিয়াছে—এ কথা আমরা বলিতে পারি না। সিতারার প্রেমেও মোহের মাত্রা কম নাই। "গোস্তাকি মার্জ্জনা করবেন—আপনি সাতদিন ছাউনিতে যাননি"—তারা সাত-দিন আপনার দেখা পায়নি''—এই ঘটনাটি অমৃত পানের ফল বলিয়া মনে করা চলে কি? তারপর সিতারার সহিত আচরণেও অমৃতময় প্রেমের তেমন কোন উল্লেখযোগ্য পরিচয় ফুটিয়া উঠে নাই—প্রাণঢালা ভালবাসা বলিতে যাহা বুঝায় তেমন ভালবাসার অভিব্যক্তি নাদিরের মধ্যে দেখা যায় না। প্রেমিকের স্বভাব এবং প্রেমের আর্ত্তি নাদিরের মধ্যে এমন-কোন মাত্রায় দেখানো হয় নাই যাহার জন্য অমরা নাদিরের প্রেমিক-সত্তার ব্যথায় ব্যথিত হইতে পারি।

চতুর্থ অঙ্কে, অতি-নাটকীয় আকস্মিকতার সহিত, নাট্যকার নাদিরের প্রেমার্ত্ত রূপটি অঙ্কন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। নাদির নিজের মুখেই নিজের জীবন-ভাষ্য রচনা করিয়াছেন—"তোমার কাছে আমার এই প্রার্থনা, এ বিশ্বাস যেন না ভাঙে। যদি কোনদিন ভাঙে সিতারা—জানবে, সেই মুহূর্ত্তে আমার পতন আরম্ভ হবে—কারণ বাঁচবার মত আর কোনো অবলম্বন তখন আর থাকবে না। প্রশ্ন উঠিতে পারে—সিতারার প্রতি যে বিশ্বাস সেই বিশ্বাস—হারানোই কি তার পতনের কারণ? সিতারার প্রেমের মধ্যেই কি নাদিরের শক্তির মূল এবং পতনের বীজ নিহিত? এখানে দিগ্বিজয়ী এবং ''অতিমানব" নাদিরের মধ্যে অতিমানবীয় আদর্শ-আবেগ একেবারেই আচ্ছন্ন—প্রেমই সর্ব্বস্ব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। নাদির স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন—''ধর্ম্মের চেয়েও পৃথিবীতে ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ দান প্রেম। সে প্রেম যার জীবনে অসম্মানিত হয়, তার চেয়ে দুর্ভাগ্য পৃথিবীতে নাই। ঈশ্বর জানেন সিতারা, আমি তোমায় ভালবাসি।" অতিমানবে 'প্রেমিক-সত্তা' থাকিতে পারে না—এ কথা বলা উদ্দেশ্য নহে, কিন্তু এ কথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে যে-সত্তাই কল্পনা করা হউক, তাহাকে ঐকান্তিকভাবে ব্যক্ত করা চাই এবং সমগ্র সত্তার সহিত তাহাকে মিলাইয়া দেওয়া চাই। "Tragic

impression"—সৃষ্টি করিবার জন্য ভাবের যেরূপ ঐকান্তিকতা (seriosn-ness) ও আন্তরিকতা থাকা দরকার, তাহা এখানে কমই আছে ॥

ঈশ্বরের দোহাই দেওয়া সত্ত্বেও, যাঁহারা নাদিরকে চিনিয়াছেন তাঁহারা জানেন—(অবশ্য নাটক হইতেই চিনেন এবং জানেন)—যে নাদিরের প্রাণ কেহই স্পর্শ করিতে পারে নাই এবং কি প্রেমে কি স্নেহে নাদির কখন ঐকান্তিক নহেন। নাদিরের কাছে—"পুত্র, পরিবার, স্বদেশ কিছুই তার আপনার নয়।"

মার্লো'র 'ট্যাম্বারলেন দি গ্রেট'—নাটকে "জেনোক্রাটে"র জন্য ট্যাম্বারলেনের যে ঐকান্তিক আবেগ দেখান হইয়াছে ঐ ধরণের ঐকান্তিকতা এখানে দেখাইতে পারিলেই—সিতারা-বিচ্ছেদকে ট্র্যাজেডির উপযুক্ত 'উদ্দীপকে' পরিণত করা সম্ভব হইত। তাহা করা হয় নাই বলিয়া এবং নাদিরকে অভিমানবরূপে দেখাইবার মূল পরিকল্পনা করায় এবং স্নেহ-প্রেমের, পাপ-পুণ্যের লৌকিক সীমার উর্দ্ধে তাহার ব্যক্তিত্বকে স্থাপন করার চেষ্টা থাকায়,—'সিতারা-বিচ্ছেদ' বা হারেম-বিষাক্ত হওয়ার বেদনা তীব্র "ট্র্যাজিক সংবিদ" জাগাইতে পারে না। সত্য, সিতারার প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গেই—"ঈশ্বর, ঈশ্বর, সম্ভবতঃ তুমি নাই—যদি থাক, তুমি শুধু জগতের শাস্তিদাতা।"—এই আর্ত্তনাদটুকু নাদিরের গভীর বিক্ষোভ তথা সিতারা-আসক্তির নিদর্শন। তারপর পঞ্চম অঙ্কে, নাদিরের "ধীরে ধীরে প্রবেশ করিয়া কয়েকবার পরিক্রমণপূর্ব্বক বাহিরের আকাশের দিকে" চাহিয়া থাকা, সিতারার স্মৃতির মধ্যে মগ্ন হইয়া যাওয়া—এবং আক্ষেপের সঙ্গে বলা—সে একদিন বলেছিল, ধরা দিলেই ধরতে পারে, নইলে ধরে সাধ্য কার! সমস্ত ইরাণী সাম্রাজ্যে তাঁর চিহ্ন নাই। সম্ভবতঃ সে পলাতকাকে আর পাওয়া যাবে না!"—সিতারার প্রতি আসক্তির লক্ষণ বলা চলে, কিন্তু নাদিরের শোচনীয় পতনের বা পরিণামের সহিত সিতারা-বিতাড়নের কোন কার্য্যকারণ-যোগ স্থাপিত হয় নাই ॥ নাদির 'নিষ্ঠুর'—'ভয়াল মূর্ত্তি', 'সংহার মূর্ত্তি' লইয়া জনসাধারণের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছেন, তাহার কারণ যে সিতারা-বিচ্ছেদ জনিত জ্বালা বা বিক্ষোভ

তাহার কোন অভিব্যক্তি নাটকে নাই। নাদিরের নিষ্ঠুর আচরণের কারণ—নাটকের পাত্রপাত্রীরা সকলেই উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু কেহই পারে নাই—নাদির নিজে শেষে ব্যক্ত করিয়াছেন এবং যাহা ব্যক্ত করিয়াছেন তাহাতে এইটুকু প্রকাশিত হইয়াছে—"একটু একটু করে শাস্তির মাত্রা দিন দিন বাড়িয়ে চলি, এই আশায়,—যদি সেই শাস্তির ফলে সমস্ত ইরাণ-জাতির সজীব মূর্ত্তির একবার দেখা পাই"—অর্থাৎ নাদিরের 'শাস্তিদানের তত্ত্বকথা'—ইহাই, অন্তত "ঠিক এই না হ'লেও অনেকটা এই বটে"। নাদির অত্যাচার করিয়াছেন নিজের মৃত্যু এড়াইবার জন্য নহে অথবা শুধু অভিজাতদের ষড়যন্ত্র সমূলে বিনাশ করিবার জন্যও নহে—পুত্র বা হারেম বিষাক্ত হওয়ার জ্বালা জুড়াইবার নিস্ফল চেষ্টার জন্যও নহে, তাঁহার অত্যাচারের উৎস—প্রধানতঃ দেশপ্রীতি—ইরাণ-জাতির সজীব মূর্ত্তি দেখার নিগূঢ় বাসনা! এই বাসনা নিশ্চয়ই মহৎ এবং মহৎ বলিয়াই নাদিরের নিষ্ঠুরতাকে অতিমানবীয় প্রবৃত্তিরই একপ্রকার অভিব্যক্তি বলিতে হইবে। সুতরাং নাদিরের নিষ্ঠুর আচরণে আর যাহাই প্রকাশ পাক, শোচনীয়ত্ব প্রকাশ পায় না; ফলে ঐ নিষ্ঠুরতাকে পতনের লক্ষণ হিসাবেও গণ্য করা চলে না। পুত্র ও হারেম বিযাক্ত হওয়ার জন্যই যদি নাদির অপ্রকৃতিস্থ হইতেন এবং অন্তর্দাহ মিটাইবার জন্য, অত্যাচারের পর অত্যাচার করিয়া যাইতেন তাহা হইলেই, স্নেহ-প্রেম-হারানো ব্যাপার শোচনীয় (tragic) হইবার মর্য্যাদা লাভ করিতে পারিত। 'শাস্তিদানের তত্ত্বকথার' মধ্যে অতিমানবীয় প্রবৃত্তি আরোপ করায়, পূর্ব্ববর্ত্তী সংবেদনার ধারায় (impression) ব্যাঘাত-সৃষ্টি হইয়াছে—ছেদ পড়িয়া গিয়াছে—পুত্র বা হারেম বিষাক্ত হওয়ার ট্র্যাজিক তাৎপর্য্য পরিস্ফুট হইতে পারে নাই।

তৃতীয়ত :—প্রজা বিষাক্ত হওয়ার ব্যাপার। যে নাদির একদিন পারস্যবাসীর কাছে মুক্তিদাতা ছিলেন, সেই নাদিরেরই বিরুদ্ধে প্রজারা আজ বিক্ষুব্ধ! শোচনীয় ঘটনাই বটে! কিন্তু নাট্যকার প্রজা-বিষাক্ত-হওয়ার যে কারণ দেখাইয়াছেন তাহা যথেষ্ট নহে—যথাযথভাবে ইতিহাস-সম্মত ও নহে।

রেজাকুলিকে অভিজাতরা ভালবাসেন—সেই জন্যই নাদির অভিজাতদের উপর ইরাণের উপর অত্যাচার করিয়াছেন—ইহা আংশিক সত্য। আসল সত্য এই যে অর্থনৈতিক শোষণের চাপেই, যুদ্ধ-ব্যয়ের চাপেই প্রজারা বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে। আবার অভিজাতদের প্রতি বিদ্বেষই, নিষ্ঠুর আচরণের মূল কারণ তাহাও জোর করিয়া বলা যায় না, কারণ—শাস্তিদানের তত্ত্ব কথা যাহা শোনানো হইয়াছে তাহাতে দেখা যায়—ইরাণের সজীব মূর্ত্তি দেখার বাসনাই "অনেকটা" কারণ। এ কথা বলিতেই হইবে প্রজা-বিষাক্ত-হওয়ার রূপটি নাটকে তেমন প্রত্যক্ষভাবে ঐকান্তিকভাবে এবং ইতিহাসসম্মতভাবে উপস্থাপিত হয় নাই। এই কারণেই— প্রজা-বিষাক্ত-হওয়ার ব্যাপারটিতে—ট্র্যাজেডি-যোগ্য শোচনীয়তা ব্যক্ত হয় নাই।

উল্লিখিত-আলোচনা সম্মুখে রাখিয়া সিদ্ধান্ত করিতে গেলে (১) **প্রথমত** এই কথাটিই মনে হয় যে নাট্যকার নাদিরকে "অতিমানব" করিতে গিয়াই—(অবশ্য মঙ্গলাচরণে, অতিমানবের যে ধারণা প্রকাশ পাইয়াছে সেই অর্থে অতিমানব) চরিত্রটিকে ইতিহাসের বাস্তব-পরিবেশ হইতে বেশ খানিকটা বিযুক্ত ও অলৌকিক করিয়া ফেলিয়াছেন, তথা চরিত্রটির "high seriousness"এর সম্ভাবনাকে ব্যাহত করিয়াছেন। এক কথায় বলা যায়—নাদিরের চরিত্রে অতিমানবের ট্র্যাজেডি ফুটিয়া উঠে নাই। নাদির মুখেই অতিমানব ; তাঁহার কার্য্যে অতিমানব-আদর্শ-নিষ্ঠা ব্যক্ত হয় নাই॥ ফলে, মূল উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে যে নাট্যকার সমর্থ হন নাই এ কথা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। তারপর যদি মঙ্গলাচরণ-বর্ণিত অতিমানব হিসাবে না দেখিয়া, যদি লৌকিক প্রতিভা হিসাবেই নাদিরকে দেখা হয়—অর্থাৎ দেখা হয়, সামরিক প্রতিভা হিসাবে বা রাজনৈতিক প্রতিভা হিসাবে—'শক্তি-সাহস-অধ্যবসায়ের বিস্ময়কর ব্যক্তি-বিগ্রহ হিসাবে—এক অদ্ভুত ব্যক্তি হিসাবে, তাহা হইলেও, এ কথা বলিতে হইবে যে নাট্যকার নাদিরের জীবনকে যে-ভাবে উপস্থাপিত করিয়াছেন তাহাতে উচ্চাঙ্গ ট্র্যাজেডির গাঢ় রস নিষ্পন্ন হয় নাই। নাদিরের জীবনের ঘটনায় "awe and

grandeur" না আছে এমন নয় কিন্তু উচ্চাঙ্গের ট্র্যাজেডির জন্য শুধু "awe and grandeur"-ই তো যথেষ্ট নহে—উহার জন্য চাই জীবন লীলার ঐকান্তিক বাস্তবতা—high seriousness. দিগ্বীজয়ী নাটকে আর সবই আছে, নাই এই high seriousness—জীবনের ঐকান্তিক বাস্তব প্রকাশ, একটি একলব্য-লক্ষ্য। মনে করা যাউক, নাদিরের **সমগ্র ব্যক্তিটি**—নাদিরের ভিতর এবং বাহিরের সত্তা সমূহ লইয়া গঠিত। তাঁহার ভিতরে আছে—আত্মপ্রতিষ্ঠাকামী "অহং"—সত্তাটি (will to live and assert) আছে আত্মপ্রজনন কামনার আবেগ—অর্থাৎ "প্রেম", আছে স্নেহ…আছে বন্ধু-বাৎসল্য প্রভৃতি বৃত্তি, আর বাহিরে আছে—অহঙ্কারের বাস্তব অধিকার—বিরাট সাম্রাজ্য—অর্থাৎ সম্রাট-সত্তা। মোটামুটি ভাবে বলা যায়—নাদিরের 'অহং' স্নেহ-ধারায় পুত্র পৌত্রের সঙ্গে যুক্ত, প্রেম-ধারায় সিতার সঙ্গে যুক্ত এবং আত্ম-প্রতিষ্ঠাকামনা-ধারায়—প্রজার সঙ্গে যুক্ত॥ দেখা যাইতেছে নাদিরের মধ্যে রাজনৈতিক বাসনা আছে, জৈবিক বাসনা আছে—(স্নেহ-প্রেম) যাহা নাই তাহা হইতেছে নৈতিক এবং সামাজিক আবেগ (শাস্তিদানের মধ্যে যে ইরাণ প্রীতি তাহাকে সামাজিক আবেগ বলিলে অবশ্য ভিন্ন কথা)

নাট্যকার উক্ত তিনটি যোগ হইত—স্নেহ-যোগ প্রেম-যোগ এবং প্রতিষ্ঠা-যোগ হইতে—নাদিরকে বিযুক্ত করিয়া, সমগ্র ব্যক্তি-সত্তার মধ্যে বিয়োগ-জনিত নিঃস্বতা ও মর্মদাহ এবং শেষ পর্য্যন্ত মৃত্যু দ্বারা শোকাবহ পরিণাম ঘটাইয়া, ট্র্যাজেডি-সংবেদনা (tragic impression) সৃষ্টির পরিকল্পনা করিয়াছেন। পরিকল্পনা হিসাবে যে ইহা খুবই প্রসংসনীয় সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু পরিকল্পনাকে রূপ দিতে গিয়া, নাট্যকার বিয়োগ-জনিত বেদনা বা বিক্ষোভকে এমন মাত্রায় ব্যক্ত করিতে পারেন নাই, সংবেদনার পক্ষে যাহাকে যথেষ্ট বলা যায়। রসের ধারাটি অনুসরণ করিলেই ইহা উপলব্ধি করা যাইবে যে একটি ভাবের অভিব্যক্তি বা উদয় হইতে না হইতেই অন্য একটি ভাব—পরিপন্থী ভাব আসিয়া উহাকে প্রশমিত করিয়া ফেলিয়াছে। সংস্কৃত রসশাস্ত্রের পরিভাষায়

বলিলে বলা যায়—অকাণ্ডে রসচ্ছেদ ঘটানো হইয়াছে, "পরিপন্থিরসাঙ্গস্য বিভাবাদেঃ পরিগ্রহঃ"—দোষ ঘটিয়াছে এবং শেষ পর্য্যন্ত "প্রকৃতিবিপর্য্যয়"—দোষও (নায়কাদীনাং তৎস্বভাবানাঞ্চ বিপর্য্যয়ঃ) দেখা দিয়াছে। [সাহিত্য-দর্পণের সপ্তম পরিচ্ছেদে রসদোষ—বিচার দ্রষ্টব্য] ইহার ফলে—যাহাকে ট্র্যাজিক ইম্প্রেশন বলা হয়, তাহা ঠিক জমাট বাঁধিতে পারে নাই। বাস্তবিকই পুত্র বিচ্ছেদ বা পত্নী বিচ্ছেদ, নাদিরের মধ্যে তেমন কোনই মর্মস্পর্শী বেদনা-বিক্ষোভ সৃষ্টি করে নাই অথবা তাঁহার পতনকেও ত্বরান্বিত করিবার হেতু হইয়া উঠে নাই—আসল কথা পুত্র-বিচ্ছেদ বা পত্নী-বিচ্ছেদ নাদিরের সত্তাকে যে খুব মর্মান্তিক ভাবে স্পর্শ করিয়াছে তাহার প্রমাণ নাদিরের আচরণে স্পষ্টাকারে ব্যক্ত হয় নাই। নাদির পুত্র ও পত্নী হারাইয়াই যে বেশী অত্যাচারী ও নিষ্ঠুর হইয়াছেন—ভিতরের জ্বালা বাহিরের উত্তেজনা দ্বারা প্রশমিত করিতে চেষ্টিত হইয়াছেন, অভিজাতরাই পুত্র-বিচ্ছেদর জন্য দায়ী—এই মনোভাব লইয়া পুত্র-বিচ্ছেদের জ্বালা মিটাইবার জন্যই অত্যাচার করিতে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছেন—এই সব ভাব নাদির-চরিত্রে প্রত্যক্ষ ও পরিস্ফুট রূপ পায় নাই॥ বরং, যেখানে উল্লিখিত ভাব-সমূহ ব্যক্ত করাই উচিত কাজ ছিল সেখানে নাট্যকার পরিপন্থী ভাব উদ্দীপিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। নাদিরের নিষ্ঠুরতা—অমানুষিক অত্যাচার সেই পর্য্যন্তই ট্র্যাজেডি-সংবেদনা সৃষ্টির উপযোগী যে পর্য্যন্ত উহারা নাদিরের পতনের লক্ষণ হিসাবে, পুত্র-পত্নী বিচ্ছেদের প্রতিক্রিয়া হিসাবে প্রতিভাত হইবে। বাস্তবিক, নাদিরের উন্মত্ত নিষ্ঠুরতা যদি শোচনীয় পতনেরই লক্ষণ না হয়, তাহা হইলে নাদিরের ভিতরকার ট্র্যাজেডি কোথায়? কিন্তু নাট্যকার নিষ্ঠুরতা ও অত্যাচারের প্রধান কারণটি এমন একটি মহৎ প্রেরণার মধ্যে স্থাপনা করিয়াছেন যাহা পূর্ব্ববর্ত্তী পরিকল্পনার পরিপন্থী—এবং যাহা পূর্বোদিত ট্র্যাজেডি-সংবেদনাকে প্রায় নিঃশেষে ব্যাহত তথা প্রশমিত করিয়া ফেলে। যে অত্যাচার ও নিষ্ঠুরতাকে পাঠকরা নাদিরের বিকৃতি বলিয়া মনে করিতে প্রস্তুত হন—এবং নাদিরের জন্য শোচনা করিতে মনকে প্রস্তুত করেন,

সেই অত্যাচার এবং নিষ্ঠুরতা, হঠাৎ দেশপ্রীতির—জাতি-প্রীতির অর্থাৎ অতি-মানবীয় এইটি মহৎ প্রেরণার নিদর্শনরূপে দেখা দেয়॥ শাস্তিদানের তত্ত্বকথা শুনিবার পরে দর্শকের চোখে—অত্যাচারী ও নিষ্ঠুর নাদির অতিমানব-নাদিরের রহস্যালোকে উদ্ভাসিত তথা দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া উঠেন। ফলে—দর্শকের চিত্তের পূর্ব্বজাগ্রত ভাব-প্রবাহে সহসা ছেদ পড়িয়া যায়॥ রহমতের মতই দর্শকরা নাদিরের আচরণে সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পান না (রহমতের মুখে নাট্যকারের কথাই ব্যক্ত হইয়াছে—"সম্রাট, আপনার জীবন এমন বিচিত্র যে তার সামঞ্জস্যের সূত্র আমরা সন্ধান করতে পারিনি।)" দর্শকরা আর এ কথা মনে করিতে পারেন না যে নাদির, আত্মরক্ষার অন্ধ আবেগে—নিজের মৃত্যু এড়াইবার জন্যই, অত্যাচার ও নিষ্ঠুর আচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন ; অথবা অত্যাচারে-উন্মত্ত নাদির আসলে একজন বিকৃত-চিত্ত (nuerotic) ব্যক্তি, যিনি অবচেতন মনে পাপের প্রায়শ্চিত্ত কামনা তথা শাস্তি কামনা করেন এবং তাহা করেন বলিয়াই অত্যাচারের পর অত্যাচার করিয়া করিয়া নিজের মৃত্যু ঘনাইয়া আনিতে তথা আত্মহত্যা করিতে চাহেন—নাদিরের সমস্ত নিষ্ঠুর আচরণের মূলে আছে—'a secret impulse to seek punishment and so expiate the crime"—(Literature And psychology, Lucas—80 page.) এ কথা মিথ্যা নহে যে নাদির শত্রু অন্বেষণ করিয়াছেন, কিন্তু এ কথা সত্য নহে যে এই শত্রু অন্বেষণের মূল প্রেরণা আত্মহত্যার গোপন আবেগ অর্থাৎ আত্মিক দ্বন্দ্বের পরিণাম হইতে আসিয়াছে। নাট্যকার এই মনস্তত্ত্বসম্মত ব্যাখ্যার পথ নিজের হাতেই বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। 'শাস্তিদানের তত্ত্বকথা' জানাইয়া দিয়া, নাট্যকার নাদিরকে যে পরিমাণে দেশপ্রেমিক—জাতি-প্রেমিক করিতে সমর্থ হইয়াছেন সেই পরিমাণেই, নিষ্ঠুর-অত্যাচারের ট্র্যাজেডি-সম্ভাবনা হ্রাস করিয়া দিয়াছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে 'পুত্র-বিচ্ছেদ,' 'পত্নী-বিচ্ছেদ' প্রভৃতি ঘটনাগুলিকে প্রতিক্রিয়া-বিহীন করিয়া তুলিয়াছেন। বাস্তবিক, নিষ্ঠুর অত্যাচারের প্রধান কারণ যদি পুত্র-পত্নী বিচ্ছেদ-জনিত মর্মজ্বালার মধ্যেই নিহিত না হয়, তাহা হইলে পুত্র-বিচ্ছেদ,

পত্নী-বিচ্ছেদ প্রভৃতি ঘটনাকে এত ঘটা করিয়া দেখাইবার কোন প্রয়োজনই দেখা যায় না। পুত্র-বিচ্ছেদের, পত্নী-বিচ্ছেদের ক্ষোভ, নাদিরের মধ্যে একটা ক্ষণিকের উত্তেজনায় পর্য্যবসিত হইয়াছে—অন্তর্দাহের ফল্গুধারা হইয়া উঠিতে পারে নাই॥ শেষ পর্যন্ত, নাদির-চরিত্রে ইহাই ফুটিয়া উঠিয়াছে যে নাদির ঠিক কক্ষচ্যুত নহেন—তাঁহার "ভয়ালরূপ"-এর মূলে আছে জাতি-প্রীতির প্রেরণা; দেশবাসী এই গোপন বাসনাকে ভুল বুঝিয়াছে—নাদিরের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হইয়াছে এবং শেষ পর্য্যন্ত নাদিরকে হত্যা করিয়াছে। তবে নাদিরের এই গোপন বাসনার দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে দেখা যায়—হত্যা-ব্যাপারটি নাদিরের পক্ষে ট্র্যাজেডি নহে, কারণ হত্যা, এই হিসাবে বাসনা-পরিপূরণ ছাড়া আর কিছুই নহে॥ তাইতো দেখা যায়—হত্যাকামী সালেবেগ প্রবেশ করিতেই নাদির সোৎসাহে বলেন—"সিরাজী, সিরাজী—এসেছে এসেছে সত্যিকার খোরাসানী—সবাই একসঙ্গে এসেছে, এক সঙ্গে এসেছে—

কিন্তু যে প্রশ্নটি এখানে না উঠিয়া পারে না, তাহা এই যে এইরূপ বিপরীত উপায়ে—sadist-রীতিতে, দেশ-প্রীতি দেখাইবার এমন কোন্ অনিবার্য্য রাজনৈতিক পরিস্থিতি দেখা দিয়াছে? কোন বৈদেশিক আক্রমণের আশঙ্কার মুখে, দেশবাসী অসাড় ও নিষ্ক্রিয় জীবন যাপন করিলে এবং অন্যভাবে সেই অসাড়তা ও নিষ্ক্রিয়তা ভঙ্গ করিতে না পারিলে নাদির এইভাবে অদ্ভুত দেশপ্রীতি দেখাইতে পারিতেন আর কোনভাবে সেই চেষ্টা সমর্থন করিলেও করা যাইতে পারিত; কিন্তু কী অনাবশ্যক এবং অদ্ভুত এই জাতি-প্রীতি! অতিনাটকীয় আজগুবি ছাড়া ইহাকে আর-কিছু বলা চলে না॥ ইহা যদি অতিমানবীয় হয় তবে অবশ্য অতিনাটকীয় ও আকস্মিকও বটে! এই পরিকল্পনার ফলে নাদির-চরিত্রটি যে পরিমাণে কাল্পনিক হইয়াছে সেই পরিমাণে তাহার ঐতিহাসিক গুরুত্ব হারাইয়া বসিয়াছে—ঐতিহাসিক পরিবেশ হইতে বেশ-খানিকটা অসংলগ্ন হইয়া পড়িয়াছে তথা চরিত্রের বাস্তবতার মায়াঘোরটুকু এবং high seriousness অনেক পরিমাণে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। উচ্চাঙ্গের ট্র্যাজিডির পক্ষে এই ধরণের

লঘু কল্পনা বৰ্জ্জনীয়, কারণ ইহা গাম্ভীর্য্যের পরিপন্থী 'seriousness of purpose'-এর পরিপন্থী। এইসব কারণেই নাদিরের ব্যক্তিত্ব যে পরিমাণে 'dramatic' হইয়াছে, সেই পরিমাণে 'tragic' হইতে পারে নাই। নায়কের ব্যক্তিত্ব ও আচরণের বাস্তবিকতা তথা গুরুত্ব সম্বন্ধে যেখানে প্রশ্ন উঠে, সেখানে আর যাহাই হউক রসনিষ্পত্তি সম্পূর্ণ হইতে পারে না।

এইরূপ অবস্থায় নাদির ট্র্যাজিক চরিত্র কি না তথা দিগ্বিজয়ী ট্র্যাজিডি হইয়াছে কি না,— এ প্রশ্ন সোজাসুজি আমাদের সম্মুখে আসিয়া উত্তর দাবী করিবে। উত্তর কিন্তু সহজসাধ্য নহে। আমরা দেখিয়াছি---(ক) নাদির-চরিত্রে অতিমানবীয় আদর্শ নিষ্ঠার ঐকান্তিকতা ও সেই আদর্শে পৌছিতে না পারার জন্ম যে ট্র্যাজেডি—গভীর মর্মবেদনা, সেইরূপ কোন অতিমানবীয় ট্র্যাজেডির রস ফুটিয়া উঠে নাই (খ) দ্বিতীয়তঃ নাদির-চরিত্রে গভীর কোন আত্মিক বা নৈতিক দ্বন্দ্ব— অন্তরতম সত্তার (ego-ideal) মধ্যে পাপাচরণের জন্য কোন তীব্র বিক্ষোভ দেখা দেয় নাই, তৃতীয়তঃ—তাঁহার চরিত্রে **পিতার, প্রেমিকের** এবং **দেশ-প্রেমিকের** ট্র্যাজেডিও তেমন ঐকান্তিকভাবে ব্যক্ত হয় নাই॥ অতিমানব-নাদির পিতা-নাদির, প্রেমিক-নাদির, দেশপ্রেমিক-নাদির—কোন সত্তারই ট্র্যাজেডি যথেষ্টরূপে ব্যক্ত হয় নাই॥ **(যথেষ্টরূপে কথাটী মনে রাখা দরকার)** এই হিসাবে বলা যায়—**নাদির-চরিত্রে এইরূপ ট্র্যাজেডির পরিকল্পনা আছে কিন্তু সুষ্ঠু সম্পাদনা নাই॥**

কেহ হয়তঃ বলিতে পারেন—যে নাট্যকার এখানে এমন একজন ব্যক্তির ট্র্যাজেডি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যাঁহার জীবনের ট্র্যাজেডি বিশেষ কোন **একটি কারণে** মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে—একাধিক কারণের সংঘট্টে, নানা সত্তার বিপর্য্যয়ে, ব্যক্তির জীবনটিতে শোচনীয় পরিণতি দেখা দিয়াছে। নাদিরের জীবনে অতিমানবীয় শক্তি ও প্রতিভার সম্ভাবনা আছে—নাদির সেই দিক দিয়া অতিমানবীয় গুণের অধিকারী; কিন্তু নাদির তো শুধু অতিমানব নহেন—মানব ও বটে সেখানে তিনি পিতা প্রেমিক এবং দেশপ্রেমিক॥ এই সকল

সত্তার সংযোগেই নাদির-ব্যক্তিত্বের সমগ্রতা। **এই নাটকে সমগ্রভাবেই নাদির ব্যক্তিত্বের শোচনীয় পরিণাম দেখানো উদ্দেশ্য হইয়াছে—অতিমানব-ব্যক্তিত্ব সাধনার মাঝ পথেই ভ্রষ্ট বা আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে, পিতার স্নেহের অবলম্বন, প্রেমিকের প্রেমের অবলম্বন বিষাক্ত হইয়াছে এবং শেষ পর্য্যন্ত একদা দেশের মুক্তিদাতা দেশবাসীর ভক্তি-শ্রদ্ধা হারাইয়াছেন—আবাল্য বন্ধুর হাতে প্রাণ দিয়াছেন।**

নাদির একদিকে দিগ্বিজয়ীবেশে—যখন (দ্বিতীয় রিচার্ডের মত) "he is gone to save far off (তখন) whilst others come to make make him lose at home অন্যদিকে পুত্র, স্ত্রী, প্রজা সবকিছু বিষাক্ত হইয়া গিয়াছে॥

এতবড় একটি শক্তিমান ও প্রতিভাবান ব্যক্তি যেখানে ভিতরে বাহিরে এইভাবে আহত হইয়াছেন—অকালে, অপমৃত্যুর মুখে পড়িয়া জীবন শেষ করিয়াছেন, সেখানে নাটক অবশ্যই ট্র্যাজেডি এবং নায়ক অবশ্যই ট্র্যাজিক। নাট্যকারের উদ্দেশ্য—যে শক্তির প্রাচুর্য্য নাদিরকে বড় করিয়াছে, সেই শক্তিরই মাদকতায় নাদিরের জীবনে শোচনীয় পরিণতি ঘটিয়াছে ইহাই উপ-স্থাপনা করা। তিনি দেখাইতে চাহিয়াছেন—"There is always a weak side to the character of a great man, there is always something wrong, or criminal, in the actions of a great man. This weakness misdemeanour, crime causes his downfall. But they necessarly lie deeply embedded in his character, so that the great man perishes from the very thing that is the source of his greatness "—চরনিশেভস্কির—এস্থেটিক রিলেশন অফ্ আর্ট টু রিয়েলিটি"-প্রবন্ধে উদ্ধৃত—ভিস্‌শেরের উক্তি)॥ কিন্তু এই কথার উত্তরে বড় কথা এখানে এই যে এই সব তত্ত্ব নাটকে পরিস্ফুট আকারে রূপ পায় নাই—পরিকল্পনা, রূপ-রসে সার্থক সৃষ্টিতে পরিণত হয় নাই।—এই পর্য্যন্তই সত্য যে—নাটকে উক্ত ট্র্যাজেডির রূপ ও রসের পরিকল্পনা আছে; কিন্তু কল্পনা ও

আভাসই তো যথেষ্ট নহে। সার্থক সৃষ্টির জন্ম চাই—সুসমঞ্জস রূপ এবং সু-অভিব্যক্ত রস। এই রূপের সঙ্গতি ও রসের অভিব্যক্তির দিক দিয়া নাটকখানি নির্দোষ হইতে পারে নাই॥ এ কথা সত্য এবং স্বীকার্য্য যে নাদিরের অবস্থিতি, গতি এবং পরিণতির মধ্য দিয়া একটি বিরাট ব্যক্তির অভ্যুদয় ও পতনের রূপ আভাসিত হইয়াছে এবং এই রূপের মধ্যে ট্র্যাজেডির বহিরঙ্গলক্ষণও আভাসিত হইয়াছে। কিন্তু বহিরঙ্গলক্ষণই যথেষ্ট নহে। উচ্চাঙ্গের সৃষ্টির পক্ষে বহিরঙ্গলক্ষণ-সঙ্গতিই যথেষ্ট নহে—অত্যাবশ্যক অন্তরঙ্গলক্ষণ-সঙ্গতি॥ বিশেষতঃ সমগ্র ব্যক্তিত্বের ট্র্যাজেডি দেখাইতে হইলে, ব্যক্তি-সত্তাদের যে পরিমাণে লক্ষণীয় ও ঐকান্তিক করিয়া তোলা দরকার—তাহা এখানে করা হয় নাই। ব্যক্তির আচরণের মধ্য দিয়া জীবনের ঐকান্তিক বাস্তবতা তথা গুরুত্ব ও গভীরতা ব্যক্ত না হইলে, ব্যক্তি চরিত্র হিসাবে, অগভীর হইয়া পড়ে। এবং তাঁহার বেদনা বিক্ষোভের ও পরিণতির ট্র্যাজিকত্বও তেমন গভীর আন্দোলন সৃষ্টি করিতে পারে না॥ যে-সকল ব্যক্তিত্ব দিয়া নাদিরের ট্র্যাজেডি সৃষ্টি কারর চেষ্টা হইয়াছে তাহা পরিস্ফুট রূপ পায় নাই।

এই আলোচনার সূত্র ধরিয়াই কেহ আবার বলিতে পারেন "দিগ্বিজয়ী" নাটকে নাদিরশাহের "চরিত্র"—বিশেষতঃ চরিত্রে সামঞ্জস্যের অভাব, দেখানোই নাট্যকারের অন্যতম উদ্দেশ্য হইয়াছে। রহমতের মুখে নাট্যকারেরই যেন কণ্ঠ শোনা যায়—"সম্রাট, আপনার জীবন এমন বিচিত্র যে তার সামঞ্জস্যের সূত্র আমরা সন্ধান করতে পারিনি"। নাট্যকার নাদিরের এই বিচিত্র ও সামঞ্জস্য-সূত্রহীন জীবনের রূপটিই নাটকে বিশেষভাবে ফুটাইতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং তাহাতেই নাদির-চরিত্রে অতিনাটকীয় খেয়ালিপনা, প্রদর্শন প্রবণতা (exibitionism)—তথা অবাস্তবিকতা ফুটিয়া উঠিয়াছে॥ সামঞ্জস্যহীনতার জন্য নাদির চরিত্রের গুরুত্ব কমিয়া গিয়াছে—এ কথা বলা অযুক্তিযুক্ত হইবে না।

এই পূর্বপক্ষীয় বক্তব্য উপেক্ষনীয় নয় বটে কিন্তু এ ক্ষেত্রে গ্রহণীয়ও নয়। কারণ, অসামঞ্জস্যকে যদি উপস্থাপ্য বস্তু হিসাবে গণ্য করা হইয়া থাকে, তাহা

হইলে স্রষ্টার কাছে অবশ্যই আমরা দাবী করিব—রীতিমত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াই অসামঞ্জস্যকে ফুটাইয়া তুলিতে হইবে॥ অকারণে কোন কাজই হয় না। নাদির-চরিত্র দর্শের কাছে অসামঞ্জস্যপূর্ণ বলিয়া যদি মনে হয়, বুঝিতে হইবে নাদির-চরিত্রের অন্তরতম প্রদেশে ব্যক্তিত্বের যে নানামুখী আবেগ আছে, তাঁহার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার রূপটি দর্শের কাছে স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয় নাই। সেই অবস্থায় নাট্যকারের দায়িত্ব—নাদিরের ব্যক্তিত্বের গভীর সংজ্ঞান-আসংজ্ঞান-নিজ্ঞান আবেগ ও উহাদের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার রূপগুলি সুষ্ঠু নিয়মশৃঙ্খলার মধ্য দিয়া উপস্থাপিত করা॥ ভাবাবেগের আকস্মিক প্রশম বা উদয় এবং গতি পরিবর্তনের মূলে হয় যথেষ্ট কারণ সন্নিবেশ করিতে হইবে, না-হয় এমন কোন সার্থক ইঙ্গিত দিতে হইবে যাহাতে কারণটি সহজেই স্বীকৃত হয়॥ এই নাটকে ব্যক্তিত্বের গভীর ও ঐকান্তিক আবেগ যথেষ্টমাত্রায় ব্যক্ত হয় নাই বলিয়াই নাদির-চরিত্রের অসামঞ্জস্য অতিনাটকীয় আকস্মিকতায় বা কৃত্রিমতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে॥

সুতরাং সোজাসুজি প্রশ্ন—(ক) নাটকখানিকে কি ট্র্যাজেডি বলা যায়?

(খ) উচ্চাঙ্গের ট্র্যাজেডি না হইলেও ট্র্যাজেডির তালিকায় স্থান পাইবে কি?

(গ) ট্র্যাজেডি না বলিয়া মেলোড্রামা বলিতে হইবে কি?

এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে অন্য একটি পক্ষের বক্তব্য সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলিয়া লওয়া যাইতে পারে। এই অন্য পক্ষের বক্তব্য এইরূপ হইতে পারে—'দিগ্বিজয়ী-নাটকে ট্র্যাজেডি-রস খুঁজিতে যাওয়ার কোন দরকার নাই; কারণ, নাটকখানি আসলে—ইতিহাস-নাট্য (History-play) অর্থাৎ নাদিরশাহের জীবনের নাট্যরূপ এবং ট্র্যাজেডির বা কমেডির রস সৃষ্টি করা অপেক্ষা ইতিহাসকে নাট্যের আকারে রূপ দেওয়াই এই নাটকের উদ্দেশ্য। এখন, এই ধরণের নাটক রচিত হইতে পারে কি পারে না তাহা লইয়া তর্কের যথেষ্ট অবকাশ থাকিলেও এখানে সে অবকাশ নাই। তবে এখানে যে নাট্য-

কারের মুখ্য উদ্দেশ্য—নাদিরের জীবনের ট্র্যাজেডিকেই উপস্থাপিত করা, তাহার প্রমাণ নাটকের মধ্যে সুস্পষ্টরূপেই পাওয়া যায়। সুতরাং "দিগ্বিজয়ী"কে "ইতিহাস-নাট্য" হিসাবে না দেখিয়া, 'ঐতিহাসিক ট্র্যাজেডি' হিসাবেই বিচার করিতে হইবে। সুতরাং ঐ প্রশ্ন—দিগ্বিজয়ী ট্র্যাজেডি কিনা—উত্তর দাবী করিবেই। একথা আগেই বলা হইয়াছে যে 'দিগ্বিজয়ী' নাটক নাদিরের ট্র্যাজেডি দেখাইবার উদ্দেশ্যেই রচিত। তারপর নাদিরের জীবনে এবং নাটকেও ট্র্যাজেডির উপকরণ-আয়োজন কম নাই। কিন্তু নাটকের যিনি নায়ক, সেই নাদিরশাহের মতি-গতিতে ঐকান্তিকতা বাস্তবিকতা ও গভীরতা অপেক্ষা, অতিনাটকীয় অস্থিরতা, ভঙ্গী-সর্ব্বস্বতা এবং কৌতূহলজনক প্রদর্শন-প্রবণতা—এক কথায় কৃত্রিমতা ফুটিয়া উঠায়, ট্র্যাজিক-চরিত্র হিসাবে তাহার গাম্ভীর্য্য ব্যাহত হইয়া গিয়াছে; অধ্যাপক নিকলের ভাষায় বলা যাইতে পারে—নাটকের "grandeur of temper and aim" ব্যাহত হইয়া পড়িয়াছে! ফলে—দিগ্বিজয়ী নাটকখানিকে উচ্চাঙ্গের ট্র্যাজেডি বলা যাইতে পারে না। তবে, উচ্চাঙ্গের ট্র্যাজেডি না হইলেই যে নাটককে মেলোড্রামা বলিতে হইবে এমন কোন কথাও নাই। গঠনে সঙ্গতির পারিপাট্য এবং নায়কে অন্তর্দ্বন্দ্বের গভীরতা এবংতীব্রতা সব ক্ষেত্রেই অনবদ্য হইবে এমন আশা করা অন্যায়। সুতরাং যেখানে ট্র্যাজেডি-বোধের (tragic impression) উদ্বোধ ঘটে এবং সঙ্গে সঙ্গে, উদ্দেশ্যের ঐকান্তিকতা এবং চরিত্রের বাস্তবিকতা সম্বন্ধে তেমন কোন সন্দেহ না জাগে, সেখানে নাটককে ট্র্যাজেডি বলিয়াই স্বীকার করা উচিত। দিগ্বিজয়ীর ক্ষেত্রে, আপাতদৃষ্টিতে ট্র্যাজেডি-বোধের উন্মেষ না ঘটে এমন নয়। বিশেষতঃ নায়ক নাদিরশাহ একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি এবং এমন ঐতিহাসিক ব্যক্তি যাঁহার সম্বন্ধে ইতিহাসের মতই প্রামাণিক গ্রন্থে (এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা) লেখা আছে—He has been designated—Robber chief, but his antecedents, like those, of many others who have filled the position have redeeming points of melodramatic

interest." নাদিরের জীবনটাই একটু মেলোড্রামাটিক। ইতিহাসে নাদির অনেকটা অতিমানুষ বা অমানুষ রূপেই চিত্রিত। সুতরাং 'নাদিরশাহ' বলিতেই বিশেষ একটি স্মৃতি-চক্র বা ভাবানুষঙ্গ উপস্থিত হয়। **এই কারণেই নাদির চরিত্রে বাহ্য ঐতিহাসিকতার যে মাত্রা আছে তাহা একধারে নাদিরকে মেলোড্রামাটিক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়ার মস্ত বাধা অন্যধারে, নাদির-চরিত্রের অতিনাটকীয়—এলোমেলো আচরণের মাত্রা চরিত্রটিকে ট্র্যাজিক-নায়ক বলিবার পক্ষেও তেমনি বাধা।** তবে এ কথাও স্বীকার্য্য যে কোন কোন স্থলে চরিত্র-সৃষ্টিতে "a penetrating and illuminating power of characterization যে না আছে এমন নহে এবং নাটকের মধ্যে সব কিছুর মধ্য দিয়া—"an insistence upon something deeper and more profound than mere outward events"—ও লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু এ কথাও অনস্বীকার্য্য—ঐ সকল থাকা সত্ত্বেও নাদির চরিত্র শেষ দিকে এত মেলোড্রোমাধর্মী হইয়া পড়িয়াছে—যে নায়কের গুরুত্বের অভাবে নাটকখানি ট্র্যাজেডির কেন্দ্র হইতে বিচ্যুত হইয়া মেলোড্রামার সীমান্তের দিকে সরিয়া গিয়াছে। এক কথায় বলিতে হইলে বলা যায়—**দিগ্বিজয়ী ট্র্যাজেডি ও মেলোড্রামার সীমানার উপরে দাঁড়াইয়া আছে।** অবশ্য মেলোড্রামা অপেক্ষা ট্র্যাজেডির লক্ষণই যে নাটকে অধিক পাওয়া যায় সে বিষয়েও কোন সন্দেহ নাই।

সমালোচনা

(গঠন)

দিগ্বিজয়ী নাটকের গঠন সম্বন্ধে নাট্যকার "নিবেদন"—অংশে লিখিয়াছেন —"নাটক এবং উহার অভিনয় সম্পূর্ণরূপে নবযুগোপযোগী করিবার নিমিত্ত আমি আধুনিক নাট্য-রচনা রীতি (Ibsenian Technique) অবলম্বন

করিয়াছি, কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, তাহার বিচারের ভার—সহৃদয় পাঠক এবং দর্শকের উপর।" সুতরাং "Ibsenian Technique" বলিতে কি বুঝায় তাহাই আগে পরিষ্কার করিয়া লওয়া দরকার এবং তারপর দেখা দরকার—নাট্যকার কি পরিমাণে ইবসেনীয় রীতি অবলম্বন করিয়াছেন॥

ইবসেনীয়ান টেক্‌নিক্

'The Technical Novelty in Ibsen's plays'—এবং What is the new element in the Norwegian School নামক প্রবন্ধে নাট্যকার-সমালোক সুবিখ্যাত বার্ণাডশ মহাশয় "ইবসেনীয় রীতি" নির্দ্ধারণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন—ঐ দুইটি প্রবন্ধ হইতে আমরা সারাংশ সংগ্রহ করিয়া দিতেছি।—

(১)—"Discussion"—"আলোচনা"। [আগে ছিল—(ক) exposition (খ) situation (গ) uuravelling; এখন—(ক) exposition (খ) situation (গ) discussion.]—Now an interesting play can not in the nature of things mean anything but a play in which problems of conduct and character of personal importance to the audience are raised and suggestively discussed) —137. page—"Major Critical Essays.")

(২) প্রচলিত অর্থে—"There are no villains and no heroes"

(৩) "The more familiar the situation, the more interesting the play.

আমাদের নাট্যকার "ইবসেনীয় রীতি" বলিতে এখানে 'আলোচনা' প্রভৃতির কথা বলিতেছেন না, কারণ যোগেশচন্দ্রের নাটকের বড় বৈশিষ্টা—'আলোচনা' নয়—নাটকীয় কৌতুহল "a conflict of unsettled ideals" এর মধ্যে নিহিত নহে। "ইবসেনীয় রীতি বলিতে' নাট্যকার বোধ হয় এখানে দৃশ্য বৰ্জ্জিত "অঙ্ক" বিভাগ বুঝাইতে চাহিয়াছেন; 'স্থান-ঐক্যের' প্রতি, দৃশ্য-সংক্ষেপের

প্রতি অধিকতর লক্ষ্য রাখার রীতির কথা বলিতে চাহিয়াছেন॥ দিগ্বিজয়ী নাটকে মোট পাঁচটি অঙ্ক—প্রথম অঙ্কে, দ্বিতীয় অঙ্কে, তৃতীয় অঙ্কে ও চতুর্থ অঙ্কে দৃশ্যান্তর কল্পনা নাই; শুধু পঞ্চম অঙ্কে—একটি বাড়তি দৃশ্য আছে—দৃশ্য সংখ্যা মোট দুইটি। সুতরাং, স্থান-ঐক্যের দিকে নাট্যকার যে খুব সতর্ক দৃষ্টি দিয়াছেন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

দিগ্বিজয়ী-নাটকে সন্ধি ও অঙ্ক-বিভাগ

দিগ্বিজয়ী নাটকে—'কর্ণাল যুদ্ধের পরদিবস—রাত্রিকাল' হইতে নাদিরের অপঘাত-মৃত্যুর কাল পর্য্যন্ত (অর্থাৎ ১৭৩৯ হইতে ১৭৪৭ পর্য্যন্ত)—মোট আট বৎসরের ঘটনা উপস্থাপিত হইয়াছে। মেষপালকের পুত্র কিভাবে পারস্যের 'শাহ' হন এবং সিংহাসনে আরোহণ করেন—(১৭৩৬) তাহা নেপথ্য ঘটনা। নাটকের আরম্ভ—'কর্ণাল যুদ্ধের পরদিবস রাত্রিকালে'—কর্ণালযুদ্ধে জয়ী নাদিরের বন্দী নবাব সাদাৎ আলি খাঁ''র সহিত কথোপকথনে, নাটকের শেষ নাদিরের হত্যার পরে, সালেবেগের নাদির-প্রশস্তিতে॥

কর্ণাল বা ভারত বিজয়ের পরেই নাদিরশাহের জীবনের ট্রাজেডি আরম্ভ হয়—ইহা ঐতিহাসিক সত্য। দিল্লীর হত্যাকাণ্ড, অমানুষিক নিষ্ঠুরতার নিদর্শন হিসাবেই ইতিহাসে লিখিত আছে বটে কিন্তু এই হত্যাকাণ্ডের মধ্যে আর একটা সত্যও আছে এবং সেই সত্য এই যে, যে শক্তি নাদিরকে বড় করিয়াছে, দেশের মুক্তিদাতারূপে পরিণত করিয়াছে—দিগ্বিজয়ীর মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, সেই শক্তির মদই নাদিরের মধ্যে মত্ততা সৃষ্টি করিয়াছে॥ দিল্লীর হত্যাকাণ্ডই যে নাদিরের ট্র্যাজেডির মূল কারণ এ কথা অবশ্য বলা যায় না। ইহার পরে নাদিরের জীবনে যে সব শোচনীয় ঘটনা ঘটে তাহাদের মধ্যে, একটি—পুত্রের (রেজার) প্রতি অবিশ্বাস এবং সেই অবিশ্বাসের উত্তেজনায় পুত্রকে অন্ধ করিয়া দেওয়া, পরে মনস্তাপভোগ করা, অন্যটি—প্রজা পালনের দিকে দৃষ্টি না দিয়া দিগ্বিজয়ে মত্ত হইয়া উঠা—লেসজাই-অভিযানে, তুরস্ক-অভিযানে দেশের ধনবল

জনবলের নিরর্থক অপচয় করা—প্রজার নিকট হইতে করের উপর কর আদায় করিয়া যুদ্ধব্যয় নির্ব্বাহ করার চেষ্টা করা—নিষ্ঠুরতম দণ্ড দিয়া দিয়া প্রজাকে বশীভূত করার ব্যর্থ চেষ্টা করা এবং শেষ পর্য্যন্ত অত্যাচারের প্রতিক্রিয়ার ফলে একদা-বিশ্বস্ত অনুচরের হস্তেই প্রাণ দেওয়া॥ ইতিহাসেই নাদিরের এই ভিতরের এবং বাহিরের ট্র্যাজেডির কারণ উল্লিখিত আছে। পুত্রকে অন্ধ করিয়া নাদির যে মনস্তাপে দগ্ধ হইয়াছিলেন তাহাকে আমরা ভিতরকার ট্র্যাজেডি এবং প্রজা বিদ্রোহের ফলে বিশ্বস্ত অনুগামীদেরই হস্তে তাঁহার শোচনীয় পতন ঘটে—তাহাকে বাহিরের ট্র্যাজেটি বলিয়া মনে করিতে পারি॥

নাট্যকার—ভিতরের ট্র্যাজেডি-কল্পনায় আর একটি ধারা যোগ করিয়াছেন—ইহাকে আমরা বলিতে পারি 'প্রেমের ধারা'। "সিতারা"কে দিয়া, প্রেমের ট্র্যাজেডি দিয়া নাট্যকার নাদিরের হৃদয়ের ট্র্যাজেডিকে সম্পূর্ণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন॥ (সিতারা 'ভারতনারী'—'পথের সুন্দরী')

এই যোজনা অবশ্যই প্রশংসনীয়। যে ভাবে যোজনা করা হইয়াছে তাহার সম্বন্ধে হয়তঃ কথা থাকিতে পারে কিন্তু যে কারণে যোগ করা হইয়াছে তাহা খুবই উল্লেখযোগ্য॥ ব্যক্তি নানা বৃত্তির যোগে জগতের সহিত যুক্ত হইয়া আছে। ব্যক্তির অহং-সত্তায় আত্মরক্ষার ও আত্মপ্রতিষ্ঠার কামনা যেমন মৌলিক, তেমনি মৌলিক আত্মপ্রজননের বাসনা। এই বাসনা হইতেই ব্যক্তির প্রেম-বৃত্তির, স্নেহ-বৃত্তির জন্ম। আত্মরক্ষা ও আত্মপ্রতিষ্ঠা কামনায় ব্যক্তি সমাজের সহিত যুক্ত; আত্মপ্রজননের কামনায় ব্যাক্তি—প্রেমের জন্য, স্নেহের জন্য লালায়িত—প্রেমাস্পদের সহিত, স্নেহাস্পদের সহিত যুক্ত॥ এই সব যোগ হারাইলেই, ব্যক্তি অন্তরে নিঃস্ব হইয়া পড়ে, মর্ম্মপীড়া ভোগ করিতে বাধ্য হয়। ইতিহাসে নাদিরের বাহিরের যে ট্র্যাজেডি দেখান হইয়াছে তাহাতে পুত্র-যোগ এবং প্রজা-যোগ হারাইবার শোচনীয়তাই নির্দ্দেশিত হইয়াছে। কিন্তু অন্তরের ট্র্যাজেডির সম্পূর্ণতার জন্য আরো অনেক কিছু চাই। ব্যক্তির আধ্যাত্মিক বা নৈতিক চেতনা মারাত্মকভাবে সঙ্কুচিত হইলে তথা আহত হইলে ব্যক্তির মধ্যে, জৈবিক

অপেক্ষা গভীরতর কোন সত্তার—অর্থাৎ আত্মিক ট্র্যাজেডি ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে॥ নাট্যকার নাদিরের মধ্যে "আধ্যাত্মিক বা নৈতিক সত্তা" কল্পনা করেন নাই, "জৈবিক সত্তা"র মধ্যেই তাহাকে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন॥ তবে অবশ্য জৈবিক সত্তাটির সমগ্র প্রবণতা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন—নাদিরকে স্নেহের যোগ এবং প্রেমের যোগ হইতে বিযুক্ত করিয়াছেন। সিতারার যোজনা নাদিরের "প্রেমিক-সত্তার" ট্র্যাজেডি দেখাইবার জন্যই করা হইয়াছে। অবশ্য এক ঢিলে নাট্যকার অনেক পাখী মারিয়াছেন—"সিতারা" নাদিরের—(নাট্যকারেরও) "আভিজাত্য" বিরোধী প্রচারের এবং সাম্প্রদায়িকধর্ম-বিরোধী প্রচারের নিমিত্ত হইয়া উঠিয়াছে—অর্থাৎ সিতারা শুধু ট্র্যাজেডিতেই অংশ গ্রহণ করে নাই, নাটকের ভাব-বস্তুরও নিমিত্তকারণ হইয়াছে।

দিগ্বিজয়ী-নাটকের অঙ্ক-বিভাগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায়—নাট্যকার নাদির-কাহিনীকে নিম্নলিখিত সন্ধিতে ভাগ করিয়া লইয়াছেন :—প্রথম অঙ্কে "**মুখ সন্ধিতে** (exposition) কর্ণাল যুদ্ধজয়ের পটভূমিতে; দিগ্বিজয়ী নাদিরের অতীত শৌর্য্য-বীর্য্যের বিবরণ এবং নাদিরের অতিমানবীয় কামনা ও চরিত্রবৈশিষ্ট্য দিয়া, নাদির-ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠা প্রদর্শন করা হইয়াছে ; সঙ্গে সঙ্গে—হারেম-বিষাক্ত হওয়ার বীজ "সিতারা"কেও স্থাপনা করা হইয়াছে এবং নাদিরের বিরুদ্ধে সিরাজী-আলিআকবরের মধ্যে যে ষড়যন্ত্র হইয়াছে—যে ষড়যন্ত্রের ফলে দিল্লীতে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইয়াছে তথা নাদিরের 'কক্ষচ্যুতি' ঘটিয়াছে, এবং পারস্যে প্রজা বিদ্রোহ ঘটিয়াছে,—সেই ষড়যন্ত্রের উদ্দীপক কারণটিকেও দেখানো হইয়াছে—সিরাজীকে দিয়া সিতারাকে অভিবাদন করানো হইয়াছে॥ দ্বিতীয় অঙ্কে—**প্রতিমুখ সন্ধিতে** (rising action), প্রথমতঃ—নাদিরের 'হারেম' বিষাক্ত করিবার জন্য সিরাজী-আকবরের ষড়যন্ত্র (সিরাজীর চক্রান্তের লক্ষ্য—"সিতারা"কে নাদিরের চোখে বিষ করিয়া দেওয়া, আকবরের মাথায়—বড় বড় রাজনৈতিক চক্রান্ত—নাদিরের পতন ঘটাইবার চক্রান্ত), দ্বিতীয়তঃ—সিতারা ও

নাদিরের সম্পর্কটিও পরোক্ষভাবে দেখান হইয়াছে—বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছে—দেখানো হইয়াছে—সিতারার প্রেমের অমৃত স্পর্শে নাদির নূতন করিয়া যৌবন ফিরিয়া পাইয়াছেন—সিতারা নাদিরের অন্তর স্পর্শ করিয়াছে। তৃতীয়তঃ—আলি আকবরের ষড়যন্ত্র কার্য্যরূপ গ্রহণ করিয়াছে। (১) দিল্লীর হত্যাকাণ্ডের উদ্যোগ-পর্ব রচনা করা হইয়াছে—নাদিরের মৃত্যু সংবাদ রটনা করা হইয়াছে (২)—আহমদ আবদালির সঙ্গে রেজাকুলির গোপন ষড়যন্ত্রের নিদর্শন বলা যায় এমন একখানি পত্র আলিআকবর নাদিরের হাতে পৌছাইয়া দিয়াছে তথা রেজাকুলি ও আহম্মদ আবদালীর প্রতি অবিশ্বাসের বীজ বপন করা হইয়াছে। এবং চতুর্থতঃ—নাদিরের মধ্যে—যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা বা আবেগ জন্মিয়াছে।

তৃতীয় অঙ্কে—গর্ভসন্ধি (climax)। এই অঙ্কে নাট্যকার নাদিরের শক্তি-মদমত্ততার বিকার তথা কেন্দ্রচ্যুতি দেখাইয়াছেন। দিল্লীর নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড দ্বারা নাদির তাহার অতীত ও ভবিষ্যৎকে হত্যা করিয়াছেন—অতিমানব কর্মযোগী নাদির "দস্যু"-নাদিরে পরিণত হইয়াছেন—বিরাট প্রতিভা পথহারা হইয়া পড়িয়াছেন ; নাদিরের শক্তি মঙ্গল হইতে বিচ্যুত হইয়াছে তথা অশুভ উৎপাতে পরিণত হইয়াছে॥ নাদিরের উপর অভিশাপ বর্ষিত হইয়াছে "সিংহাসন বিষাক্ত হবে—প্রজা বিষাক্ত হবে—হারেম বিষাক্ত হবে—স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, পারিবারিক জীবন বিষাক্ত হবে।"

চতুর্থ অঙ্কে—**বিমর্ষ সন্ধি** (Falling Action)। নাদিরের ট্র্যাজেডি আরম্ভ হইয়াছে। পরোক্ষভাবে উপস্থাপিত হইয়াছে—মনোবেদনায় তিনি দিন কাটাইতেছেন ; 'তাঁহার আহার নাই, নিদ্রা নাই, চিত্তের শান্তি তিনি হারাইয়া ফেলিয়াছেন।' এই মনোবেদনার কারণ—রেজাকুলি খাঁর (নাদিরের প্রিয় পুত্রের) আচরণ—রেজাকুলি খাঁর বিচার। তারপর দেখান হইয়াছে—রেজার স্বীকৃতি আদায় করিবার জন্য নাদিরের চেষ্টা—অন্যদিকে চলে সিতারাকে ষড়যন্ত্রজালে আবদ্ধ করিবার জন্য সিরাজীর চেষ্টা—প্রথমবার আবদ্ধ করা সত্ত্বেও জাল ফাঁসিয়া যায়, নাদির সিতারার আচরণে উত্তেজিত হন বটে কিন্তু বিশ্বাস

হারান না। সিরাজী অবশ্য ক্ষান্ত হন না—রেজাকুলির-মা সুলতানা বেগমের সাহায্যে আর একবার জাল বিস্তার করেন—রেজাকুলির প্রাণরক্ষার জন্ম সিতারাকে দিয়া সম্রাটকে অনুরোধ করিতে বলেন। এদিকে রেজার বিচার সঙ্কটের দিকেই অগ্রসর হইতে থাকে—শুধু যে পিতা-পুত্রের মধ্যে নিদারুণ বিচ্ছেদ ঘনাইয়া আসে তাহা নহে, রেজার জীবনেরই আশঙ্কা দেখা দেয়। এই সময় সুলতানার অনুরোধে সিতারা রেজাকে রক্ষা করিবার জন্ম নাদিরকে অনুরোধ করে এবং পরিস্থিতিকে আরও খারাপ করিয়া ফেলে॥ নাদির সিতারার চরিত্রে সন্দিহান হইয়া উঠেন এবং ক্ষিপ্তের মত সঙ্গে সঙ্গে রেজাকুলি খাঁকে অন্ধ করিবার আদেশ দেন এবং সিতারাকেও বিতাড়িত করেন॥ এইভাবে—পুত্র ও হারেম দুই-ই বিষাক্ত হইয়া যায়। নাদিরের চোখে ঈশ্বর শুধু জগতের শাস্তিদাতা-রূপেই প্রতিভাত হন।

পঞ্চম অঙ্কে—**উপসংহৃতি** (Catastrophe)। নাদিরের 'নিষ্ঠুর—নিষ্ঠুর—নিষ্ঠুর...ভয়াল মূর্ত্তি'—সংহার মূর্ত্তি।' গ্রামে, জনপদে, নগরে, পথে, প্রান্তরে... সর্বত্র তাহার সংহার-লীলার নিদর্শন। একমাত্র শাস্তি মৃত্যু—অতিযন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু॥ সমস্ত প্রজা বিষাক্ত॥ নাদির অত্যাচারের পর অত্যাচারের মাত্রা বাড়াইয়া দেন—ইরাণের সজীব মূর্ত্তি দেখার বাসনা তাঁহার ঐকান্তিক॥ আদর্শ-বাদী অহিংস রহমৎ অকালে প্রাণ দেয় কিন্তু নাদিরের হিংসার গতিরোধ করিতে পারে না। সালে বেগের তরবারি অতর্কিত আক্রমণে "হিংসায়-উন্মত্ত" নাদিরের জীবনের—(নাটকেরও) উপসংহার ঘটায়॥

অঙ্ক-বিভাগের মধ্য দিয়া, যেমন কাহিনীর সন্ধি-বিভাগের তেমনি ট্র্যাজেডি-পরিকল্পনার রূপটিকেও পাওয়া যাইতেছে। দিল্লীর হত্যাকাণ্ডকে নাট্যকার ট্র্যাজিডির সূচনা, বলা চলে—ট্র্যাজেডির "মূল কারণ" হিসাবেই দেখাইতে চাহিয়াছেন। ভারত-নারীর অভিশাপ তাহারই সংকেত। কিন্তু যে কথাটি আগেই অন্যভাবে বলা হইয়াছে এবং এখানেও বলা দরকার তাহা এই যে নাট্যকার কাহিনী-গঠনে বিশেষতঃ সন্ধি-যোজনায়—ঘটনার ক্রমপরিণতির মধ্যে যাহাকে 'অনিবার্য্য

পরিণাম, বলে ঠিক তাহা সৃষ্টি করিতে পারেন নাই। দিল্লী হইতে পারস্যে প্রত্যাবর্ত্তন—নিতান্তই 'এপিসোডিক' হইয়া পড়িয়াছে। দিগ্বিজয়ে বহির্গত নাদির—অতিমানব নাদির কেন দিগ্বিজয়ের সংকল্প ত্যাগ করিয়া, অতিমানবীয় আদর্শ বিস্মৃত হইয়া পারস্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন তাহার কারণ স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হয় নাই, বরং সম্পূর্ণই অনুমানগম্য করিয়া রাখা হইয়াছে। রেজাকুলি খাঁর প্রতি অবিশ্বাস জন্মাইয়া, রেজাকুলি খাঁর বিচারের সহিত 'প্রত্যাবর্ত্তন' ঘটনাটিকে সংযুক্ত করিবার পথে কোন বাধাই নাই। রেজাকুলির বিচারের উদ্দেশ্যেই যে নাদির দিগ্বিজয় ও অতিমানবীয় আদর্শকে অসমাপ্ত রাখিয়া পারস্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন ইহা দেখাইতে পারিলে—'গর্ভ-সন্ধি'র সহিত 'বিমর্ষ সন্ধি'র গ্রন্থিতে ক্রমপরিণতির যোগ স্থাপিত হইত। দুই সন্ধির মধ্যে এইরূপ অসংলগ্নতাকে গঠন-গত ত্রুটি ছাড়া আর কিছুই বলা চলে না। তারপর—বিমর্ষ ও উপসংহৃতির মধ্যে সংযোগ রক্ষা করার যে চেষ্টা করা হইয়াছে, তাহাতেও ক্রমপরিণতির রূপ পরিস্ফুট হয় নাই॥ পুত্র এবং হারেম বিষাক্ত হওয়ার পরে নাদিরের যে বিকৃতি ও প্রতিক্রিয়া প্রত্যাশিত, তাহা প্রত্যক্ষভাবে না করিয়া পরোক্ষভাবে উপস্থাপিত করা হইয়াছে ; ফলে প্রজা বিষাক্ত হওয়ার রূপটিতেও যতখানি প্রত্যক্ষ উপস্থাপনা বাঞ্ছনীয় ততখানি প্রত্যক্ষতা পাওয়া যায় না। বিশেষতঃ—নাদিরের বিকৃতিকে নাট্যকার ট্র্যাজিডি-সংবিদের উদ্দীপক অনুভাব হিসাবে প্রয়োগ করিতে সমর্থ হন নাই॥ পরিপন্থী ভাবের সংযোজনায় ট্র্যাজিডির ধারা ব্যাহত হইয়া গিয়াছে। কাহিনীর বাঁধুনিতে এবং পরিস্থিতি-রচনায়, ঘটনার ও রসের ক্রমপরিণামের অনিবার্য্য গতি সৃষ্টি করিতে না পারায় নাটকখানির গঠন নির্দোষ হইতে পারে নাই॥

কাহিনী পরিকল্পনা ও চরিত্র-যোজনা

দিগ্বিজয়ী নাটকের মূল উপস্থাপ্য—দিগ্বিজয়ী নাদিরের, অতিমানবীয়-আদর্শে—উদ্বুদ্ধ নাদিরের শোচনীয় পরিণাম ও পতন। এই পরিণাম ও পতন দেখাইবার জন্য, বলা বাহুল্য, নাদিরের অন্তরে-বাহিরে শোচনীয় অবস্থা সৃষ্টি করা আবশ্যক। নাট্যকার অন্তরের ট্র্যাজেডি সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে স্নেহের ও প্রেমের বিচ্ছেদ এবং বাহিরের ট্র্যাজিডির উদ্দেশ্যে পরোক্ষতঃ প্রজা-বিক্ষোভ এবং প্রত্যক্ষতঃ অন্তরঙ্গ বন্ধুর (সালেবেগের) হস্তে মৃত্যু, কল্পনা করিয়াছেন। নাদিরের ট্র্যাজিডির পরিকল্পনা সংক্ষেপে, (ক) পুত্র-বিষাক্ত, (খ) হারেম বিষাক্ত (গ) প্রজা বিষাক্ত..... সিংহাসন বিষাক্ত করা। এই ট্র্যাজিডি দেখাইতে হইলে অবশ্যই নায়কের মধ্যে পুত্র-স্নেহ, হারেম-প্রেম এবং প্রজা-প্রীতি, দেশপ্রীতি দেখান আবশ্যক এবং সঙ্গে সঙ্গে দেখানো আবশ্যক নায়কের অতিমানব ব্যক্তিত্বটির বৈশিষ্ট্য॥ নাট্যকার নাদির-চরিত্রে ব্যক্তিত্ব কল্পনা করিয়াছেন এইরূপ :—(ক) নাদির একটি অতিমানবীয় প্রতিভা লইয়া আবির্ভূত ; এই অতিমানবীয় আদর্শের প্রেরণাবশেই নাদির পৃথিবী জয় করিতে চাহেন—সমগ্র পৃথিবীকে একটি 'মোসলেম' (পবিত্র) সাম্রাজ্যে পরিণত করিতে চাহেন—এক ধর্মরাজ্য-পাশে খণ্ডছিন্ন বিক্ষিপ্ত ধরাকে বাঁধিতে চাহেন ; মানুষের-গড়া সাম্প্রদায়িক ধর্মের গণ্ডী ভাঙ্গিয়া দিয়া, আভিজাত্যের বংশগত অহঙ্কার ভাঙ্গিয়া, পৌরুষের বা গুণের পরিচয়কেই ব্যক্তির একমাত্র পরিচয়ে পরিণত করিতে চাহেন॥ এই পরিকল্পনাকে কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে একদিকে চাই আভিজাত্য-বিদ্বেষ ও তদনুরূপ আচরণ, অন্যদিকে চাই সাম্প্রদায়িক ধর্মের প্রতি ঘৃণা বা উপেক্ষা এবং সমগ্র মানব-সমাজে এক ধর্মসূত্র প্রবর্তন করিবার আকাঙ্ক্ষা।

নাট্যকার নাদির-চরিত্রের এই দুইটি 'বৈশিষ্টকে প্রদর্শন করিবার জন্য—একদিকে রাখিয়াছেন সিরাজী ও আলি আকবরকে, অন্যদিকে আনিয়াছেন—

মির্জ্জা—মেহেদীকে॥ "সিতারা"-চরিত্র কল্পনার মধ্যেও নাট্যকার এই দুই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার অবকাশ সৃষ্টি করিয়াছেন॥ 'সিতারা' "পথের-সুন্দরী"; সুতরাং বংশগত আভিজাত্যের প্রশ্নই আসে না; অধিকন্তু কোন বিশেষ ধর্মের সংস্কারে তাহার চেতনা আচ্ছন্ন নয়॥ সিতারাকে মহিষী পদে স্থাপন করিয়া এবং সিরাজীকে সিতারার পদতলে বসাইয়া অভিবাদন করিতে বাধ্য করিয়া, নাদির শুধু আভিজাত্যকেই (ক্রীতদাসীর) পদানত করেন নাই—সাম্প্রদায়িক ধর্মের সংকীর্ণতাকেও পথের-সুন্দরীর পদতলে পদদলিত করিয়াছেন॥ বলা যাইতে পারে, 'সিতারা'-পরিকল্পনার মুখ্য উদ্দেশ্য—'হারেম-বিষাক্ত করা'। কিন্তু সিতারা শুধু এই উদ্দেশ্যই সিদ্ধ করে নাই, নাদির-চরিত্রের মূল বৈশিষ্ট্যকে যেমন প্রতিফলিত করিয়াছে, তেমনি পুত্রের-বিষাক্ত-হওয়া'রও অন্যতম নিমিত্ত কারণ হইয়াছে। অধিকন্তু নাদিরের বিরুদ্ধে অভিজাতদের—(সিরাজীর এবং আলিআকবরের) যে ষড়যন্ত্র—তাহারও অন্যতম, নিমিত্ত-কারণ হইয়াছে। মনে রাখা দরকার,—নাদিরের বিরুদ্ধে সিরাজী যে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছে তাহার মূল কারণ আভিজাত্য-গর্ব নহে সিতারার প্রতি ঈর্ষা; আভিজাত্যের অবমাননা অপেক্ষা নাদিরের উপেক্ষাই সিরাজীকে বেশী আঘাত দিয়াছে॥ তারপর আলি-আকবর সিরাজীর প্রেরণাতেই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছে যদিও তাহার ষড়যন্ত্রের প্রকৃতি—রাজনৈতিক। (অভিজাত—বিদ্বেষী নাদিরকে অপসারিত করার ষড়যন্ত্র!) তারপর এই আভিজাত্য-প্রতিকুলতাও শুধু চরিত্র-বৈশিষ্ট্য হিসাবেই বিচ্ছিন্নভাবে উপস্থাপিত হয় নাই; 'পুত্রের বিষাক্ত হওয়া' এবং 'প্রজার বিষাক্ত হওয়ার সহিত উহাকে কার্যকারণযোগে—যুক্ত করিয়া দেখাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। সুতরাং এ কথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে উপধারা সংযোজনায় নাট্যকার প্রশংসনীয় সংগঠন শক্তিরই পরিচয় দিয়াছেন—যদিও অতিমানব—সত্তা এবং দেশপ্রেমিক-সত্তার প্রযোজনা সুসঙ্গত রূপ পায় নাই॥

কাহিনীর মুখ-সন্ধিতে নাট্যকার দিগ্বিজয়ী নাদিরকে পারস্যের মুক্তিদাতা

এবং তাঁহার অতিমানব-প্রকৃতিকে দেখাইবার জন্য পরিকল্পনা করিয়াছেন্। এই পরিকল্পনাকে রূপ দেওয়ার জন্য—প্রথমতঃ আবশ্যক হইয়াছে—(ক) ভারত-সম্রাটের পক্ষ—(১) **সাদৎ খাঁ** (অযোধ্যার নবাব-উজীর) (২) **আসফজা** (ভারতেশ্বর উজীর) (৩) **মহম্মদশাহ** (ভারতের মোগল সম্রাট), (খ) দ্বিতীয়তঃ আবশ্যক হইয়াছে—**সালেবেগ** নাদিরের অতিমানব-প্রতিভার ভাষ্যকার—নাদিরের অতীত কীর্ত্তির এবং ভবিষ্যৎ সঙ্কল্পের বিবৃতিকার ; (গ) তৃতীয়তঃ নাদিরের উদ্দাম উচ্চাকাঙ্ক্ষা (vaulting ambition) দেখাইবার জন্য—জনৈক **হিন্দু জ্যোতিষী**'র (ঘ) চতুর্থতঃ সাম্প্রদায়িক ধর্মের প্রতি (শিয়া-সম্প্রদায়ের প্রতি) নাদিরের ঘৃণা দেখাইবার প্রয়োজনে—আবশ্যক হইয়াছে—**মির্জ্জা মেহেদী** (ঙ) পঞ্চমতঃ হারেম-বিষাক্ত করার আয়োজন হিসাবে আসিয়াছে—"**সিতারা**" এবং আসিয়া অন্যান্য প্রয়োজনও সাধন করিয়াছে—নাদিরের "আভিজাত্য-বিদ্বেষ', 'অতিমানবীয় খেয়ালিপনা,' 'সাম্প্রদায়িক-ধর্ম'-বিতৃষ্ণা—প্রকাশের নিমিত্তও হইয়াছে। তারপর আভিজাত্য-বিদ্বেষের লক্ষ্য হিসাবে—(হারেম বিষাক্ত করার ষড়যন্ত্রকারী হিসাবেও বটে)—আসিয়াছে—**সিরাজী**, আর তাহার ভ্রাতা **আলি আকবর**। [আলি আকবরের রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র, ট্র্যাজেডির পরিস্থিতি বা উদ্দীপনা-বিভাব সৃষ্টি করিয়াছে—(ক) মিথ্যা রটনা করিয়া গণ্ডগোল সৃষ্টি করিয়াছে তথা নাদিরকে উত্তেজিত করিয়া, নাদিরের পশু-সত্তাকে জাগ্রত করিয়াছে (খ) পুত্রের প্রতি অবিশ্বাস উৎপাদনের চেষ্টা করিয়াছে (গ) পারস্যে প্রজা-বিক্ষোভ ঘটাইয়াছে]

দ্বিতীয় অঙ্কে (প্রতিমুখ-সন্ধিতে)—(১) নাদিরের চোখে সিতারাকে বিষাক্ত করিবার জন্য সিরাজীর, এবং ভারতবাসীর চোখে নাদিরকে বিষাক্ত করিবার জন্য আলি-আকবরের—ষড়যন্ত্র দানা বাঁধিয়াছে। (২) সিতারার সহিত নাদিরের প্রেমের সম্পর্ক দেখান হইয়াছে (৩) রাজধানীর এক পত্রে (**জালপত্রে**) **রেজা কুলির** সহিত **আহম্মদ আবদালীর** গোপন ষড়যন্ত্র

নাদিরের গোচরীভূত করা হইয়াছে—তথা পুত্র রেজা কুলির প্রতি অবিশ্বাসের বীজ বপন করা হইয়াছে ॥ তৃতীয় অঙ্কে—(গর্ভ সন্ধিতে)—ষড়যন্ত্রের ফল ফলে—রাজধানীতে নাদিরের মৃত্যু-সংবাদ প্রচারিত হওয়ায় হাঙ্গামা বাধিয়া যায় ॥ উত্তেজনা সত্ত্বেও নাদির সংযম হারান না—আদেশ থাকে—"নিরীহ নগরবাসীদের গায়ে তোমরা হস্তক্ষেপ কর্ব্বে না" ॥ কিন্তু "সহসা একটি গুলি নাদিরের কানের পাশ দিয়া চলিয়া" যাইতেই নাদির ক্ষিপ্ত হইয়া উঠেন, সংযম হারাইয়া ফেলিয়া—নির্বিচার হত্যার আদেশ দেন ॥ এই আদেশের ফলে, একদা-কর্মযোগী নাদির সামান্য একজন দস্যুর পর্য্যায়ে নামিয়া আসেন ॥ সালেবেগ —নাদিরের আদর্শেরই যেন মানুষী মূর্ত্তি—নাদিরকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান ॥ 'সর্ব্বমানবতার অভিশাপময় বাণীমূর্ত্তি'—"**ভারতরমণী**"-বেশে প্রবেশ করে এবং নাদির-জীবনের ভাবী ট্র্যাজেডির প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে ॥

এই অঙ্কটিতে দুইটি ঔচিত্য বাধক (irrational) ঘটনা আছে ॥ একটিতে ঘটনার কাল-গত ঔচিত্য সম্বন্ধে প্রশ্ন, অন্যটিতে—চরিত্রের বাস্তবতার সম্বন্ধে প্রশ্ন। প্রথমটি এই—নাদির হত্যার আদেশ দিয়া 'প্রস্থান' করেন, মসজিদের সম্মুখে রাস্তায় উন্মত্ত সৈন্যদলের চীৎকার উঠে—এবং সকলে প্রস্থান করে॥ তারপর—"ক্রমে ক্রমে অন্ধকার হইয়া গেল এবং পরে পুনরায় ক্রমশঃ আলোকিত হইল"—নাদির প্রবেশ করেন এবং ৪১ পংক্তির একটি স্বগতোক্তি আবৃত্তি করেন'—আবৃত্তি-শেষে—ভারতসম্রাট মহম্মদশাহ প্রবেশ করিয়া—নিষ্ঠুর হত্যার বর্ণনা দেন। দেখা যাইতেছে—'আদেশ' ও কার্য্যের মধ্যে, বেশী হইলেও মাত্র ১০ মিনিটের ব্যবধান ॥ নাট্যকার সংকেত দ্বারা মঞ্চ অন্ধকার করিয়া দিয়া এবং ক্রমশঃ আলোকিত করিয়া কালের গতি দেখাইতে চেষ্টা না করিয়াছেন এমন নহে। কিন্তু হত্যাকাণ্ডের জন্য যে কালমাত্রা দরকার, তাহা সৃষ্টি করা সম্ভব হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না ॥ দ্বিতীয়টি—ভারতনারী। এই চরিত্রটি সম্পূর্ণ সাংকেতিক ও অবাস্তব হইয়া পড়িয়াছে। ঐতিহাসিক নাটকে এই ধরণের অবাস্তব চরিত্রের সংযোজনা, গঠন-পারিপাট্যের পরিপন্থী ॥

চতুর্থ অঙ্কে (১) নাদিরের ট্র্যাজেডি সংকেতিত হইয়াছে—"আহার নাই, নিদ্রা নাই, চিত্তের শান্তি তিনি একেবারে হারিয়ে ফেলেছেন।" (২) এই সুযোগে সিরাজী সিতারাকে ষড়যন্ত্রজালে জড়াইতে চেষ্টা করিয়াছে—নাদিরের অজ্ঞাতসারে সিতারাকে 'ক্রেস্তান সাধু'র কাছে পাঠাইয়া, নাদিরের কাছে বিশ্বাস-হন্ত্রী প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছে। (৩) রেজার স্বীকৃতি আদায়ের জন্য নাদির চেষ্টা করিয়াছেন (৪) সিতারার আচরণে নাদির উত্তেজিত হইয়াছেন, কিন্তু বিশ্বাস হারান নাই, ফলে সিরাজীর চক্রান্ত ব্যর্থ হইয়াছে (৫) রেজাকুলির মাতা **'সুলতানা'** বেগমের আবশ্যক হইয়াছে—হারেম বিষাক্ত করিবার আয়োজন-হিসাবেই। সিরাজীর প্রথম চক্রান্ত ব্যর্থ হইলেও সিরাজী সিতারাকে আবার জালে জড়াইবার উদ্দেশ্যে সুলতানা-বেগমের পক্ষ গ্রহণ করে—সুলতানা-বেগমকে, "সিতারা"কে দিয়া নাদিরকে অনুরোধ করিবার জন্য পরামর্শ দেয়॥ সুলতানার কাতর অনুরোধ রক্ষা করিতে গিয়াই 'সিতারা' শেষ পর্য্যন্ত বিতাড়িত হন॥ (৬) রেজাকুলির বিচারের প্রয়োজনে—**নেককদম** আবশ্যক হইয়াছে। (৭) নাদির পুত্রকে অন্ধ করেন—সিতারার চরিত্রে অন্যায় সন্দেহ করিয়া বিতাড়িত করেন। [পুত্র ও হারেম একসঙ্গে বিষাক্ত হয়]

[এই সমস্ত ঘটনার দৃশ্য—"হারেমের কক্ষ"। স্থান ঐক্য বজায় রাখিতে গিয়া—'হারেমের কক্ষ'টির আবরু রক্ষা পায় নাই। হারেমে রেজার প্রবেশ অশোভন ঘটনা না হইতে পারে, কিন্তু 'নেককদম' প্রভৃতির বিচারের জন্য "হারেমের কক্ষ" উপযুক্ত স্থান নহে। এইভাবে দ্বিতীয় অঙ্কের "বেগম মহলে" ও সকলের অবাধ গমনাগমন দেখা গিয়াছে। স্থান-ঐক্য রক্ষার বিনিময়ে ঔচিত্য-দোষ কিছু পরিমাণে স্বীকার করিয়া লইতে হইয়াছে]

পঞ্চম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে—(১) সিতারার আক্ষেপোক্তির মধ্যে নাদিরের বিকৃত রূপটি প্রতিফলিত করা হইয়াছে (২) সালেবেগ ও রহমতের কথোপকথনের সাহায্যে—ইরাণের ও নাদিরের অবস্থা উপস্থাপিত হইয়াছে—হিংসার—পশুশক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রয়োজনে 'সুফি কবির ভক্ত' অহিংসা-ধর্মাবলম্বী রহমৎ-চরিত্রটি

আবশ্যক হইয়াছে। (৩) সালেবেগের ও তাহার পিতার গ্রেপ্তারি পরোয়ানায় নাদিরের অত্যাচারী রূপটি—'আরো প্রকট করা হইয়াছে। (৪) রহমৎ অহিংস প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে নাদিরের মুখোমুখি দাঁড়াইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে (৫) সালেবেগ নাদিরের সঙ্গে শেষ বুঝাপড়া করিবার জন্য পিস্তল লইয়া রহমতের অনুসরণ করিয়াছে। দ্বিতীয় দৃশ্যে—(১) নাদির হত্যার ষড়যন্ত্র, আলি আকবরের চেষ্টায়—ফলপ্রসূ হইবার মুখে (আলির কথা—'আজ রাত্রিই সম্রাটের শেষ রাত্রি')। (২) সিরাজী নাদিরের প্রাণ বাঁচাইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে—স্বখাত সলিলেই সিরাজী ডুবিয়াছে। (৩) নাদির প্রবেশ করেন—ধীরে ধীরে (ক) সিতারার জন্য দীর্ঘশ্বাসের মত একটু সাক্ষেপ চিন্তা মনে আসে (খ) পৌত্র মির্জা রুখকে কাছে ডাকিয়া—দূরবর্তী নিজের পল্লীগ্রামটিকে দেখান এবং দেখাইতে দেখাইতে—গভীর চিন্তায় ডুবিয়া যান। খোরাসান প্রদেশ নিষ্প্রাণ দেখিয়া দেশপ্রীতি উদ্দীপিত হয়। আহ্‌মেদের—আপনি শত্রু অন্বেষণ করছেন সম্রাট? এই প্রশ্নের উত্তরে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন—"নিশ্চয়ই"। এবং সঙ্গে শাস্তিদানের তত্ত্বকথা বা কারণও জানাইয়া দেন—(যদি সেই শাস্তির ফলে সমস্ত ইরাণ জাতির সজীব মূর্তির একবার দেখা পাই!) (৪) সিরাজী নাদিরের কাছে সব দোষ স্বীকার এবং শাস্তি প্রার্থনা করে, কিন্তু নাদির সিরাজীকে উপেক্ষা ছাড়া আর কিছুই দেখান না। (৫) মৌলানা রহমৎখার নাদিরের সহিত সাক্ষাৎকার এবং শেষ পর্য্যন্ত—রহমতের—"অভিভূতের মত অগ্রসর হইয়া নাদিরের অস্ত্রের উপর গিয়া''—পতন। (৬) সালেবেগকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া নাদিরের উল্লাস, কিন্তু সালেবেগ—'মনুষ্যত্ব-আবরণকারী গর্বী পশুকে হত্যা' করিবার জন্য নাদিরকে অস্ত্রাঘাত করেন—নাদির বড় বড় কথা বলিতে বলিতে 'সিতারার কোলে ঢলিয়া' পড়েন॥

পঞ্চম অঙ্কের—ঘটনা-বিন্যাস সম্পর্কে—প্রথম বক্তব্য এই যে নিষ্ঠুর-নাদিরের রূপটি পরক্ষোভাবে উপস্থাপিত হইয়াছে। প্রজা বিষাক্ত হওয়ার রূপটি আরো প্রত্যক্ষ উপস্থাপনা দাবী করিতে পারে। দ্বিতীয় বক্তব্য এই—নাদিরের 'শত্রু

অন্বেষণের প্রবৃত্তি কোন গভীর নৈতিক দ্বন্দ্ব হইতে দেখা দেয় নাই এবং তাঁহার মধ্যে যে অবসাদ দেখানো হইয়াছে তাহাতে waste এর বাহ্য রূপটিই আছে—ট্র্যাজেডির আত্মিক ক্ষয় ফুটিয়া উঠে নাই। তৃতীয় বক্তব্য এই যে 'শান্তিদানের তত্ত্ব-কথা" ট্র্যাজেডি-সংবিদের সংস্কারকে ব্যাহত ও বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়াছে ; চতুর্থ বক্তব্য এই রহমৎ ভাবের বাহন হিসাবে যত মূল্যবানই হউক, বাস্তবিক চরিত্র হিসাবে খুবই হীন হইয়া পড়িয়াছে। রহমতের মৃত্যু নিছক অতিনাটকীয় ঘটনা যেমন অতিনাটকীয় হইয়াছে শাস্তি দিয়া দিয়া 'ইরাণের সজীব মূর্ত্তি দেখার বাসনা।' পঞ্চম অঙ্কে, ঘটনার ও চরিত্র পরিকল্পনার এই ত্রুটি অমার্জ্জনীয়, কারণ এই সকল ত্রুটির জন্যই নাটকখানি প্রশংসনীয় ও উল্লেখযোগ্য একখানি ট্র্যাজেডিতে পরিণত হইতে পারে নাই।

রস-বিচার

দিগ্বিজয়ী-নাটকখানি সূক্ষ্ম বিচারে সার্থক ট্র্যাজেডির মর্য্যাদা না পাইলেও, নাট্যকারের উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা যে ট্র্যাজেডি সৃষ্টি করা এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সুতরাং **প্রধান রসের প্রশ্ন—ট্র্যাজেডি-রসেরই প্রশ্ন।** এখন, 'ট্র্যাজেডি রস' বলিয়া কোন রস আছে—এ কথা স্বীকার করিলে, রস-তত্ত্বানুসারে, উহার 'স্থায়িভাব'ও নির্দ্দেশ করিতে হইবে। ট্র্যাজেডি-রসের 'স্থায়িভাব' সম্বন্ধে আলোচনা যথেষ্টই হইয়াছে বটে কিন্তু অবিসংবাদিত সিদ্ধান্তে পৌছান সম্ভব হয় নাই। এরিস্টটল হইতে আরম্ভ করিয়া অধ্যাপক এলারডাইস নিকল পর্য্যন্ত, অনেকেই অনেক কথা বলিয়াছেন এবং কেহই এক কথায় 'স্থায়িভাব'টি নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই। ট্র্যাজেডি "serious action" এর রূপায়ন এবং ট্র্যাজেডি-নায়ক—এমন একজন যিনি—who acts and suffers something terrible—এই ধরণের সাধারণ কথাগুলি আমরা অনেকেই জানি, কিন্তু কোন্ ধরণের ক্রিয়া-বিক্রিয়া ও ভাগ্য-বিপর্য্যয়কে আমরা

ঠিক 'ট্র্যাজিক' বলিব, সে সম্বন্ধে খুব স্পষ্ট চিন্তা অনেকেরই কম। আমরা জানি ট্র্যাজেডির প্রথম ধারণা গ্রীক নাট্যে ও নাট্য সমালোচনায় প্রকাশিত হইয়াছে। ট্র্যাজেডির মূল ধারণাটি, গ্রীক নাট্যকার **এইস্কিলাসের** 'দি পারসিয়ানস্' নাটকখানির মধ্যে এইভাবে ব্যক্ত হইয়াছে :—মানুষের মধ্যে যখন "hubris" অদম্য 'মদ-মত্ততা' ও দুর্ব্বার "দুরাশা" জন্মে, তখন দেবতার রোষ অভিশাপের মত নামিয়া আসে এবং মানুষের জীবনে শোচনীয় দুর্বিপাক ঘটায়।

"......when rashness drives
Impetuous on, the scourge of Heaven upraised
Lashes the Fury forward,........."

সফোক্লিসের নাটকেও প্রায় একই ধারণা, তবে অন্যরূপে পাওয়া যায়। মানুষ প্রবৃত্তির উদগ্রতায় মাত্রা ছাড়াইয়া যায়—সামাজিক বিধি-নিষেধের ও **দৈব-বিধানের** বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয় এবং নিজের কার্য্য দ্বারাই জীবনে শোচনীয় দুর্দ্দশা ও পরিণতি টানিয়া আনে। সমালোচক এরিস্টটল এইস্কিলাস-সফোক্লিস-ইউরিপিদিসের নাটক পর্য্যালোচনা করিয়া—ট্র্যাজেডির যে লক্ষণ নিরূপণ করিয়াছেন তাহাতে—ট্র্যাজেডিকে সাধারণভাবে—"incidents arousing pity and fear"-এর উপস্থাপনা বলা যায়। প্রশ্ন উঠিতে পারে—ট্র্যাজেডি একাধারেই ভয়ানক ও করুণ রসের নাটক অথবা ট্র্যাজেডি শুধু ভয়ানক অথবা শুধু করুণ রসের নাটক? "Pity and fear" এবং "Pity or fear"—এর মধ্যে কোনটি এরিস্টটলের অভিপ্রেত, গবেষণার বিষয় বটে কিন্তু গ্রীক ট্র্যাজেডিগুলি এবং "পোয়েটিক্‌স" মনোযোগ দিয়া পাঠ করিলে—দেখা যাইবে ট্র্যাজেডির পক্ষে "Pity"—অপরিহার্য্য। নায়কের সহিত সহানুভূতির যোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইলে—আর যে রসেরই নাটক হউক "ট্র্যাজেডি"-রসের নাটক হয় না। তবে এ কথা সত্য—ট্র্যাজেডিতে "Pity" অন্যান্য রসের সঙ্গে নানা মাত্রায় মিশিতে পারে। বীররস, ভয়ানক রস, রৌদ্ররস, অঙ্গ-রস

হিসাবে ট্র্যাজেডিতে কি মাত্রায় থাকিবে তাহা অবশ্য ঠিক করিয়া বাঁধিয়া দেওয়া সম্ভব নহে। সাধারণভাবে বলা যায়—ট্র্যাজেডির একদিকে আছে—"প্যাথেটিক ট্র্যাজেডি", যাহাতে প্রধানভাবে করুণ রস সৃষ্টি করাই উদ্দেশ্য, অন্যদিকে আছে—'Perfect Tragedy'—যাহাতে 'element of wonder' এর মাত্রা বেশী। একে 'pity'—"pathos" এ পরিণত হয়; অন্যে—"pity", fear বা 'wonder'-এর সংযোগের মাত্রা বেশী হওয়ায়, অপ্রধানভাবে বিরাজ করে। "World Drama" গ্রন্থে অধ্যাপক নিকল, নাট্যকার ইউরিপিডিস্ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে—তিনি লিখিয়াছেন—"pathos is one of Euripides' main devices; if he does not know how to express that hardness of temper so characteristic of Aeschylus, he is adept at causing tears to flow"—(72 page) মোটামুটি ট্র্যাজেডিকে আমরা দুইভাগে ভাগ করিয়া লইতে পারি—Tragedy of action—এবং Tragedy of suffering। রসের পরিভাষায় প্রয়োগ করিয়া বলা যায়—কোন ট্র্যাজেডি—বীর-করুণ, কোন ট্র্যাজেডি রৌদ্র-করুণ, কোন ট্র্যাজেডি ভয়ানক-করুণ, কোন ট্র্যাজেডি অদ্ভুত-করুণ, আবার কোন ট্র্যাজেডি বা শান্ত-করুণ, কোন ট্র্যাজেডি—শুধু করুণ। আমরা দেখিয়াছি—ট্র্যাজেডি-রসের স্থায়িভাব—এরিস্টলের মত অনুসারে—"ভয় এবং শোচনা"। ইহাই প্রচলিত মত। এই মতটি অধ্যাপক নিকল সর্ব্বাংশে গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার ধারণা—'Tragedy, after all, is not a thing of tears. Pathos stands upon a lower plane of dramatic art...pathos is closely connected with pity and neither is generally indulged in by the great dramatist as the main tragic motif' [ইউরিপিডিস্ নিশ্চই অন্যতম শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজেডি-লেখক; পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—Pathos is one of Euripides' main divces...] অধ্যাপক নিকলের সিদ্ধান্ত—Tragedy, then, we may say, has for its aim not the

arousing of pity but the conjuring up of a feeling of awe allied to lofty grandeur"—(The Theory of Drama)—ট্র্যাজেডির স্থায়িভাব—শোচনা (pity) নহে, স্থায়িভাব—**বিস্ময়, উদাত্ত** মহিমা। তবে ভয়ঙ্কর বা বিস্ময়কর ঘটনা মাত্রই যে ট্র্যাজেডি-পদবাচ্য নহে তাহা অবশ্য অধ্যাপক নিকল স্বীকার করিয়াছেন এবং এ কথাও স্বীকার না করিয়া পারেন নাই যে শেক্সপীয়রের ট্র্যাজেডিতে "pathos" আছে। সুতরাং যে "pathos" ইউরিপিডিসের নাটকের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য, শেক্সপীয়রের "কীং লিয়র" নাটকের মত ট্র্যাজেডিতেও যে "pathos" অপাংক্তেয় নহে, সেই "প্যাথোস"কে ট্র্যাজেডি-রসের পরিপন্থী মনে করিবার মত কোন যুক্তি নাই। এই কথাই সত্য—'pathos'—মাত্রই যেমন ট্র্যাজিক নহে, তেমনি ট্র্যাজিক ও প্যাথেটিক একে অন্যের বিপরীত নহে। আর একটি কথাও স্মরণীয়—ট্র্যাজেডিতে বিস্ময় ভয়, উৎসাহ, ক্রোধ যে ভাবই প্রাধান্য লাভ করুক্ ট্র্যাজেডির বিলক্ষণ ভাব—শোচনা (pity)—tragic feeling মানুষের নিদারুণ পরিণামের জন্য মানুষের সমবেদনা-বোধ। অমৃতের আস্বাদ লইবার জন্য জীবন মন্থন করিতে গিয়া মানুষ অমৃতের বদলে বাসনা-বাসুকীর বিষ পান করিয়া বিশেষ জ্বালায় ছটফট করিতে করিতে জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটায়—ট্র্যাজেডি এই বিষজর্জরিত মানুষের শোচনীয় পরিণতির জন্য মানুষের গভীর সমবেদনা। **যেখানে বেদনা-বোধ নাই সেখানে ট্র্যাজেডিও নাই।** এখানে "De profundis"—এ **ওসকার ওয়াইলড** মহাশয় যাহা বলিয়াছেন তাহা স্মরণ করা যাইতে পারে—I now see that sorrow, being the supreme emotion of which man is capable is at once the type and test of all great art ....

but sorrow is the ultimate type both in life and art. ট্র্যাজেডির জন্ম—ভগ্নমনোরথ, ভাগ্য-বিপর্য্যস্ত এবং নিরুপায় মর্ত্য মানুষের প্রতি সহজ সমবেদনা হইতে। 'awe', grandeur সব কিছুর মধ্য দিয়া pity জাগ্রত করাই ট্র্যাজেডির প্রধান উদ্দেশ্য।

দিগ্বিজয়ী নাটকেও এই উদ্দেশ্য ব্যক্ত হইয়াছে। স্বীকার করিতেই হইবে—দিগ্বিজয়ী-নাটকে নাদিরের প্রতি ট্র্যাজেডির বিলক্ষণ ভাব—"pity" জাগ্রত করার চেষ্টা কম হয় নাই ; তবে, এ কথা যেমন সত্য—নাদির-চরিত্রের আত্মিক গাম্ভীর্য্যের অভাবে এবং অন্তর্দ্বন্দ্বের উদ্দীপনা যথেষ্ট না থাকায় দর্শকের চিত্তে "pity" যথেষ্টমাত্রায় উদ্রিক্ত হইতে হইতে পারে না, তেমনি ইহাও সত্য নাদির-চরিত্রে 'প্যাথেটিক ট্র্যাজেডি' সৃষ্টির অবকাশ নাই। নাদির খল-বীর। বীরের মেরুমজ্জা শক্ত স্নায়ু দ্বারা গঠিত। বীরের অন্তর্দাহ করুণ বিলাপ হইয়া প্রকাশ পায় না। তাহার শোক—বীরের শোক—ভিতরের দাহে, বীরত্বের, ক্রোধের আকস্মিক উৎক্ষেপে—নিঃশব্দ নির্বেদে, দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ে, বিষণ্ণ জীবন-সমালোচনায় প্রকাশ পায়॥ নাদির চরিত্রে আমরা এই "বীর-করুণ-রসের আলম্বনই দেখিতে পাই। দিগ্বিজয়ী করুণ রসের (pathetic) ট্র্যাজেডি নহে। ইহাতে দীপ্ত—বিশুদ্ধ করুণ রস সৃষ্টির চেষ্টাই স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। তবে পূর্ব্বেই আলোচনা করা হইয়াছে—বিশেষ কারণে রস-নিষ্পত্তি সন্তোষজনক মাত্রায় পৌঁছিতে পারে নাই ; পারিলে দিগ্বিজয়ী উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক ট্র্যাজেডির তালিকায় অবশ্যই উচ্চ স্থান অধিকার করিতে পারিত॥

নাদির ছাড়া অন্য কয়েকটি চরিত্রকেও করুণ-রসের আলম্বন করা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে নাদিরের জ্যেষ্ঠ পুত্র "রেজাকুলি", সিতারা এবং সিরাজী উল্লেখ-যোগ্য। রেজাকুলির পরিণাম খুবই শোকাবহ। সিতারার পরিণামও কম শোচনীয় নহে। সিরাজী তো নাটকের দ্বিতীয় ট্র্যাজিক চরিত্র॥ সে স্বখাত সলিলে ডুবিয়া মরিয়াছে—স্বামীকে আপনার করিতে গিয়া, স্বামীর প্রাণনাশের কারণ হইয়া পড়িয়াছে। ....

এই নাটকে চিত্তের বিরামের জন্য (relief) 'হাস্য-রস-সৃষ্টির আয়োজনও মন্দ করা হয় নাই॥ প্রধানতঃ মির্জ্জা মেহেদী ও মোল্লাবাসী আলি আকবর এবং কোন কোন স্থলে সিরাজীও এই রসের আলম্বন হইয়াছে। মির্জ্জা মেহেদী ও

মোল্লাবাসীর ধর্মীয় আবেগের আতিশয্য—শিয়া সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিবার জন্য মির্জ্জা মেহেদীর বাহ্যজ্ঞানশূন্য ঐকান্তিকতা—তিন বছর ধরিয়া নানা দেশ ঘুরিয়া ঘুরিয়া—"পঁচিশজন ইয়াহুদী মোল্লা, পঁচিশজন আরবী মোল্লা পঁচিশজন তুর্কী মোল্লা আর পঁচিশজন পাদরী এই একশো জ্ঞানী লোক আর সঙ্গে এক গাড়ী আরবী কিতাব, এক গাড়ী তুর্কী কিতাব আর এক গাড়ী ইয়াহুদীদের পুরানো কিতাব, এই তিন গাড়ী কিতাব নিয়ে"—তিনি নাদিরশাহের সঙ্গে তর্ক করার জন্য উপস্থিত ॥ আকবর ঠিকই বলে "যদি তিন গাড়ী কিতাব আর একশো মোল্লা নিয়ে সম্রাটের সঙ্গে তর্ক করতে যান, তা হ'ল বোধ হয় আপনাকে আর সেখান থেকে ফিরে আসতে হবে না।" নিজের যথাসর্ব্বস্ব খরচ করিয়া কিতাব আর মোল্লা সংগ্রহ করার এবং সম্রাটকে আকাট্য যুক্তি শোনাইয়া শিয়া মতে আনার অধ্যবসায় অর্থাৎ উৎকট ব্যক্তিত্ব খুবই হাস্যোদ্দীপক। তারপর, আলি-আকবরকে এবং সিরাজীকে নাদির যে-সকল ব্যঙ্গোক্তির খোঁচা দিয়াছেন তাহাতে আকবর বা সিরাজী আহত হইলেও দর্শকরা আমোদই পান ॥ নাদির যখন সিরাজীকে রহস্য করিয়া বলেন—"প্রাণ কি সত্যই ভেঙে গেছে সিরাজী? কেমন করে ভাঙ্‌লো? অমন টেঁকসই পাথুরে প্রাণ কিসের আঘাতে ভাঙ্‌লো?"—তখন হাস্যরসেরই উদ্দীপনা ঘটে ॥ আলি আকবরকে যে ব্যাজস্তুতি-মূলক পরিহাসের খোঁচাটি দিয়াছেন তাহাও জোরালো—"আলি, তোমার এই গুণেই তোমাকে এত ভালবাসি, অমন তোষামদ জগতে আর কোন জাতি করতে পারবে না॥" দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম অংশে আলি আকবর নিজেই রসিকতা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সিরাজীর ঈর্ষা-উত্তেজনার পটভূমিকায় আলি আকবরের রসিকতা বেশ উপভোগ্য ও হাস্যোদ্দীপক হইয়াছে ॥ "মদ্য পান ক'রেই তোমার এ অধঃপতন হ'য়েছে—"সিরাজীর এই অভিযোগের উত্তরে আকবর যখন বলে—" 'যে মাটীতে পড়ে লোক ওঠে তাই ধরে' তুমি যা' বলছ, ধর, তাই যদি সত্য হয়, অর্থাৎ সত্যই যদি আমার অধঃপতন হ'য়ে থাকে— তা' হ'লে যা থেকে অধঃপতন হ'য়েছে সেই পদার্থকে ধরেই আমাকে আবার উঠতে হ'বে"—তখন

যথার্থই হাস্যরসের সমর্থ আলম্বন হইয়া উঠিয়াছেন। ভাব ও ভাষাকে বাঁকাইয়া রসিকতা করিবার শক্তিতে আলি বিশেষ দুর্ব্বল নন।

[পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে অঙ্গীরস অর্থাৎ—ট্র্যাজেডি-রস, সুষ্ঠুভাবে নিষ্পন্ন হয় নাই। নাদিরের মধ্যে অনুভাব-সঞ্চারিভাবের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া এমন যথেষ্ট বা সন্তোষজনক রূপ পায় নাই যাহাতে ট্র্যাজেডি—সংবিদ্‌টি বোধে ও রসে তীব্র হইয়া উঠিতে পারে। অঙ্গী-রসের এই দুর্ব্বলতা কিছুতেই উপেক্ষা করা চলে না।]

চরিত্র

দিগ্বিজয়ী নাটকে কেন্দ্রীয় এবং প্রধান চরিত্র—**নাদিরশাহ**। নাদির-চরিত্র ট্র্যাজিক তথা দিগ্বিজয়ী নাটক ট্র্যাজেডি হইয়াছে কি না,—এই সব প্রশ্নের আলোচনাকালে নাদির-চরিত্রটি তন্ন তন্ন করিয়া বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। অঙ্গী ব্যক্তি-সত্তাটিতে কোন্ কোন্ অঙ্গ-সত্তা কল্পনা করা হইয়াছে, অঙ্গ-সত্তাগুলি সুসমঞ্জস এবং সমুচিতভাবে ক্রমাভিব্যক্তির ও পরিণতির দিকে অগ্রসর হইয়াছে কি না, চরিত্রের, গতি-বিধি কোথায় অস্পষ্ট হইয়াছে, রস-ধারা কোথায় পরিপন্থী ভাবের উদয়ে ব্যাহত হইয়াছে তাহা সবিস্তারে আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং এখানে অতি সংক্ষেপে আমরা নাদির চরিত্র পর্য্যালোচনা করিতেছি।

নাদির "তৈমুরলঙ্গ কি চেঙ্গিসখাঁর মত শুধু বিজয়ী দস্যু" নহেন—তিনি "নরসিংহ",—অতিমানব। তাঁহার দিগ্বিজয়ের উদ্দেশ্য—'সমগ্র পৃথিবীতে একচ্ছত্র মহম্মদীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা ;—ভারতজয় ঐ বৃহত্তর উদ্দেশ্যেরই অন্তর্গত—ভারতবর্ষে তিনি "নূতন শাসনতন্ত্র, নূতন ধর্ম্ম-তন্ত্র প্রচার কর্ত্তে' চাহেন—ভারতবর্ষকে সহস্ররাজকতার হাত হইতে উদ্ধার করিতে তিনি প্রতিশ্রুত॥ তবে মাঝে মাঝে তিনি নাকি তাঁহার উদ্দেশ্য ভুলিয়া যান! সালেবেগের ভাষায় —'প্রতিভা ও উদারনীতি নিয়ে জনসমাজের হৃৎপদ্ম হ'তে এই মহাবীর উদ্ভূত

হয়েছেন......তিনি জগতে এক বিপুল মোসলেম সাম্রাজ্য স্থাপন করবেন।" ......তাহার রাষ্ট্রনীতির অর্থ অনেক বেশী। নাদিরের কাছে—"মুসলমান নামটি একটি বৃহৎ কল্পনা-- অনেক ক্ষুদ্র জাতি আর ধর্ম্মকে এক করে বাঁধবার জন্য ও নামের সৃষ্টি হয়েছে।"

নাদিরের শক্তি অপরিমিত—অনন্ত। 'নিজের বাহু আর মস্তিষ্কের শক্তির উপরই তাঁর একমাত্র বিশ্বাস'। তাই—'মাঝে মাঝে মনে হয় দাম্ভিক'। সাদাৎ ঠিকই ধরিয়াছেন—'মানুষটা একটু বেয়াড়া রকমের। পঞ্চাশ রকমের কাজ এক সঙ্গে করে—কোনটার উপর যে তাব আকর্ষণ সহজে ধরা যায় না।' তবে শক্তিধর নাদির জীবনের প্রভাতে শক্তিকে অকাজে লাগান নাই—পারস্যের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে তিনি যে স্বদেশপ্রীতি ও সামরিক প্রতিভা দেখাইয়াছেন, তাহা খুবই বিস্ময়কর; "ইনি পারস্যদেশকে তুর্কী, রুষ, আফগান, আরমানী, উজবেগী দস্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছেন"—শুধু তাহাই নহে। নাদির পারস্যের সীমা "কাস্পিয়ান সাগর-তীরবর্ত্তী ককেসাস পর্ব্বতমালার তলদেশ হ'তে ভারতের......সিন্ধুনদ-তীর পর্য্যন্ত" সম্প্রসারিত করিয়াছেন। তাই বলিয়া, নাদির **ক্ষমতালোভী নন**। তামাস্ তুর্কীদের সহিত জাতির অপমানকর সন্ধি না করিলে নাদির সিংহাসনেই বসিতেন না।—"তিরিশ দিন ধ'রে প্রত্যহ সমস্ত জাতি তাকে অনুরোধ করে সিংহাসন গ্রহণ" করাইতে পারে নাই॥ শুধু জাতির অনুরোধেই—জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করিতেই তিনি **শাহ-পদ** গ্রহণ করেন।

নাদির নিজে পুরুষকারের বিগ্রহ। সুতরাং পুরুষকারই তাঁহার কাছে বড় গুণ। তিনি বলেন—'বংশের নয়, নিজের পরিচয়ে মানুষ দাঁড়াবে"। এই কারণেই আভিজাত্য-অভিমানকে তিনি ঘৃণা করেন, ঘৃণা করেন আভি-জাত্যাভিমানী শিয়া-সম্প্রদায়কে, আর তেমনি ঘৃণা করেন—জন-সমাজকেও॥ নাদির নিজেই বলেন—"আভিজাত্যকে ঘৃণা করি—তার কৃতঘ্নতা বিলাসিতা আর ভীরুতার জন্য, আর জনসমাজকে ঘৃণা করি তার ফেরুপালের মত আচরণের জন্য, গড্ডালিকা-প্রবাহের মত তার বুদ্ধিহীনতার জন্য"। তাহার ধারণা—শিয়া-

সুন্নি বিরোধ অভিজাতদেরেই কারসাজি এবং ধর্ম লইয়া এই অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে জাতি দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। নাদির কোন সাম্প্রদায়িক ধর্ম লইয়া মাতামাতি করিতে অনিচ্ছুক। আলিআকবর মিথ্যা বলে না—"শিয়াই বলুন আর সুন্নিই বলুন, কোনো সম্প্রদায়ের মতামতের উপরই সম্রাটের বিশেষ কোন শ্রদ্ধা নেই। লোকটা এক-রকম নাস্তিক ব'ল্লেই হয়" তাই দেখা যায়—সিতারার মত "পথের সুন্দরী'কে মহিষী করিতে তাঁহার বাধে না।

তবে, নাদির হৃদয়হীন ন'ন॥ পুত্র রেজাকুলির প্রতি তাহার স্নেহ—অদম্য। সালেবেগের কথা বিশ্বাস না করিয়া উপায় নাই—"উদ্দাম পিতৃস্নেহ... কি ভালই সে বাস্‌তো ঐ রেজাকে!

সুলতানা বা সিরাজী নাদিরের অন্তর স্পর্শ করিতে তথা প্রেমতৃষ্ণা মিটাইতে পারে নাই বটে; কিন্তু 'পথের সুন্দরী' ভারতনারী সিতারা নাদিরের অন্তর স্পর্শ করিয়াছিল। সিরাজী যেখানে দিয়াছে মত্ততা, সেখানে সিতারা দিয়াছে—অমৃত॥

কিন্তু নাদিরের মত যাঁহারা অতিমানবীয় পৌরুষ-প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করেন তাঁহাদের কাছে আত্ম-পৌরুষ ছাড়া আর কিছুই তত আপনার নয়। তাঁহারা অন্তরে অন্তরে—একা। আসলে তাঁহাদের কোন সঙ্গী নাই—আত্মীয় নাই॥ প্রয়োজন হইলে ছিন্নমস্তার মত, তাহারা নিজের হাতেই নিজের মস্তক ছেদন করিয়া নিজের রক্ত নিজে পান করিতে পারেন—স্নেহ প্রেম · ধর্ম···নীতি সব কিছু উপড়াইয়া ফেলিয়া বিরাট হাহাকার জীবন শেষ করিতে পারেন।

যত উচ্চ শিখর তত গভীর ভয়ঙ্কর পতনের সম্ভাবনা। যত প্রচণ্ড শক্তি, তত বিকট বিকৃতির সম্ভাবনা। নাদির অনন্ত শক্তির অধিকারী বটে, কিন্তু যে শক্তি একদিন তাঁহার অভ্যুদয়ের প্রধান কারণ ছিল, সেই শক্তিরই বিকৃতি তাঁহার পতনের কারণ হইয়াছে। শক্তির মদ, নাদিরকে মত্ত ও অন্ধ করিয়াছে, আদর্শবাদী নাদিরকে উচ্ছৃঙ্খল ও নিষ্ঠুর দস্যু-নাদিরে পরিণত করিয়াছে—সব মহৎ আদর্শ ভুলাইয়া নাদিরকে শুধু শক্তির লীলা' দেখাইবার জন্য প্ররোচনা যোগাইয়াছে—তাহাকে সর্ব্বনাশের আবর্ত্তে ঠেলিয়া দিয়াছে। মদান্ধ নাদিরের

পুত্র বিষাক্ত হইয়াছে, হারেম বিষাক্ত হইয়াছে, প্রজা বিষাক্ত হইয়াছে এবং শেষপর্য্যন্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু সালেবেগেরই হাতে অপঘাত মৃত্যু ঘটিয়াছে। একদিন পারস্তবাসীরা যাঁহাকে পূজা করিতে পারিলে ধন্য মনে করিয়াছে, আর একদিন তাঁহাকেই হত্যা করিতে পারিয়া কৃতকৃতার্থ মনে করিয়াছে। ট্র্যাজেডিই বটে।

*[সৃষ্ট চরিত্র হিসাবে নাদিরের দোষ-গুণ আগেই আলোচিত হইয়াছে। দিগ্বিজয়ী ট্র্যাজেডি কি না—এই প্রশ্নের আলোচনা দ্রষ্টব্য।]

(২) **সালেবেগ**। সালেবেগ নাদিরের 'যুদ্ধসচিব'—'খোরাসানী পল্লীবাসী, নাদিরের বাল্য-বন্ধু—আদর্শবাদী। সালেবেগ নিজের মুখেই নিজের সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন—"তার চোখে ছিল স্বপ্নের ঘোর, কল্পনায় ছিল বিরাট মোস্‌লেম সাম্রাজ্য"। সালেবেগ যেন নাদিরেরই আদর্শবাদী সত্তা। "মানবের মুক্তি"র স্বপ্ন তাহার চোখে। সেই স্বপ্নের কথা তিনি নিজ মুখেই ব্যক্ত করিয়াছেন —"আমি চাই মানব-জাতির মুক্তি।"

তাই, যে নাদির প্রভুত্ব চাহিয়াছেন, পূজা চাহিয়াছেন, মানবের রক্তে স্নান করিতে চাহিয়াছেন তাঁহার এবং সালেবেগের পথ এক হইতে পারে না। সালেবেগ —সঙ্গে সঙ্গে নাদিরের আদর্শবাদী সত্তাও, বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। নাদিরের মুখের উপর স্পষ্ট কথা বলিবার সৎসাহস, এক সালেবেগের মত আদর্শপরায়ণদের বক্ষেই সম্ভব।

এই আদর্শের সৎসাহসেই সালেবেগ,—'জন্মভূমির কাছে শেষ হিসাব নিকাশ করিবার জন্য যে নাদির ভয়াল মূর্ত্তিতে উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইতে এবং তাঁহার গায়ে তরবারির আঘাত করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। পশুবলই যে জগতে একমাত্র বল নয় এবং মানুষের সমাজে পশুর পূজাও অবাধগতি চলিতে পারে না, সালেবেগ গর্ব্বী পশু-নাদিরকে হত্যা করিয়া তাহা প্রমাণ করিয়াছেন। সালেবেগের কাছে বন্ধুত্ব বড় বটে কিন্তু দেশের মুক্তির, মানব-জাতির মুক্তির আদর্শ আরো বড়। নাদিরের হত্যার মধ্যে মুক্তির আদর্শ—মানবতার আদর্শই জয়ী হইয়াছে। আদর্শ-বীর চরিত্র হিসাবে, বন্ধুত্বের উপর

আদর্শকে স্থান দেওয়ার দিক দিয়া, সালেবেগের সহিত ব্রুটাসের (জুলিয়াস সীজর-নাটকের) বেশ ঐক্য আছে।

(৩) **রেজাকুলি খাঁ।** নাদিরের জ্যেষ্ঠ পুত্র—(সুলতানা বেগমের গর্ভে রেজার জন্ম) নাদিরেরই 'প্রতিকৃতি'—"সুন্দর, যুবক, মহান উদার, বীর!" পিতাকে সে যেমন ভক্তি করে তেমনি ভয়ও করে, কিন্তু সত্যের খাতিরে, ন্যায়ের খাতিরে পিতার মুখের উপরেই যে সে স্পষ্ট কথা বলিতে পারে বিচার-দৃশ্যে তাহার প্রমাণ আছে। রেজা পিতৃভক্ত সন্তান—পিতার তুষ্টির জন্য সে বিনাবাক্যব্যয়ে তাহার দেহ দিতে পারে। কিন্তু তাহার জীবনের বড় ট্র্যাজিডি এই যে সে সেই পিতারই সন্দেহভাজন। রেজার স্বীকারোক্তি সত্য বলিয়াই আমরা গ্রহণ করিতে পারি—আপনি আমার পিতা আমার প্রভু, আমি হজরৎ আলির মত আপনাকে শ্রদ্ধা করি, ভক্তি করি। সেই শ্রদ্ধার আসন যখন টলেছে, আমার ইহজীবনের সর্ব্বস্ব আজ যথন আমার প্রতি ঘৃণিত সন্দেহ পোষণ করেন, তখন এ জীবনে আমার কোন প্রয়োজন নেই"। রেজার অপরাধ? পিতার বিরুদ্ধে সচেতন কোন অনিষ্টচিন্তা বা ষড়যন্ত্র সে করে নাই ; রেজার অপরাধ মনের গহনে—অবচেতন বাসনার মধ্যে, যে কামনার উপর মানুষের কোন হাত নাই সেই কামনার মধ্যে। নাদির রেজার মন সমীক্ষণ করিয়া বলিয়াছেন—"তুমি শক্তির শোণিত-স্বাদ পেয়েছ—তামাসকে হত্যা করে শক্তির মাদকতা অনুভব ক'রেছ। আশ্চর্য্য নয়, পরিপূর্ণ শক্তিলাভের জন্য তোমার অন্তর অধীর আগ্রহে উন্মত্ত হ'য়ে উঠবে" রেজাও অস্বীকার করিতে পারে নাই—"রেজাকুলি উত্তর দিতে না পারিয়া নীরব রহিল। অন্তর মহাসাগরের তরঙ্গের নীচে কি কামনা লুকাইয়াছিল তাহা দেখিয়া সে সভয়ে শিহরিয়া উঠিল"। এই অবচেতন মনের কামনার অপরাধে রেজার নয়ন হইতে চিরদিনের জন্য আলোক মুছিয়া দেওয়া হইল। অপরাধের কোন কার্য্য না করিয়াও রেজা অপরাধীর মত বিচারের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছে এবং নিরুপায়-ভাবে অথচ বীরের দৃঢ়তা লইয়া দণ্ডাদেশ মাথা পাতিয়া নিয়াছে। রেজার পরিণাম ট্র্যাজেডির মহিমায়-মণ্ডিত।

(৪) **রহমৎ খাঁ।** রহমৎ খোরাসানের পল্লীযুবক—আদর্শবাদী সালেবেগের ছাত্র—এবং অতিযোগ্য ছাত্র। আলি আকবরের মুখে জানা যায়, মৌলানা রহমৎ—"একনিষ্ঠ, ধর্ম্মপরায়ণ, স্বদেশসেবক"। শুধু এইটুকু বলাই যথেষ্ট নয়। রহমৎ মানবতার পূজারী। তাঁহার ঘোষণা—"মানুষ পশু হ'য়ে গেছে এ কথায় বিশ্বাস করার চেয়ে বোধ হয় মরাও ভাল"। এত ঐকান্তিক তাঁহার মানবতা-পূজার নিষ্ঠা—এত জাগ্রত তাঁহার অন্তরাত্মা! রহমৎ নিজেই বলিয়াছেন—"মানুষকে অবিশ্বাস করতে আমার ধর্ম্ম আমায় নিষেধ করে"......"কোন সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম আমার নেই—আমি সুফি কবির-ভক্ত। এই ধর্ম রহমৎকে অভয়মন্ত্রে দীক্ষা দিয়াছে। তাই নাদিরকে তিনি ভয় করেন না—অমানুষ ভাবিতে পারেন না—নাদিরের জন্য তাঁহার দুঃখ হয়! কারণ—তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস—"এ কখনো হতে পারে না!" তাঁহার ক্ষোভ—"এত বড় প্রাণ কোন মরুভূমিতে এসে তার ধারা হারিয়ে ফেলেছে॥ সালেবেগের কথার উত্তরে তিনি তাই বলিতে পারেন—"আমি তাঁকে সিংহ মনে করি না—ঠিক আমার মত অতিক্ষুদ্র মানুষ বলেই মনে করি! সম্ভবতঃ আমার চেয়েও দুঃখী, আমার চেয়েও দুর্ভাগ্য॥" নাদিরের 'প্রকৃত অন্তরতম মানুষটি'কে উদ্ধার করিতে গিয়া রহমৎ—অহিংসের স্বাভাবিক পরিণামই লাভ করেন। রহমতের কথাই ঠিক—"মৃত্যুর রহস্য যে জানতে চায় তাকে মৃত্যুর সামনে উপস্থিত হতে হয়"।

রহমতের মত মানবতা-প্রেমিক ও অহিংসাব্রতী এইভাবেই প্রাণ দেয় এবং প্রাণকে মৃত্যুহীন করিয়া তুলে! প্রাণহীনের মধ্যে প্রাণ জাগাইতে গিয়া ইঁহারা অপঘাতের মুখেই প্রাণ দেয় বটে কিন্তু রহমতের মৃত্যুর মত অতিনাটকীয় মৃত্যু খুব কমই ঘটে। আদর্শবাদিতা মিথ্যা কোন ব্যাপার নয়—জীবনে আদর্শবাদিতা কম-বেশী আছে, সুতরাং সাহিত্যেও আদর্শবাদিতার স্থান আছে—তবে সেই আদর্শবাদিতাকে বাস্তবিক অর্থাৎ বিশ্বাস্য করিয়া তুলিতে পারাই বড় কথা।

(৫) **আলি আকবর।** যাঁহাদের কাছে প্রাণের মর্য্যাদা অপেক্ষা 'প্রাণের মায়া'টুকুই বড় আলি আকবর তাঁহাদেরই একজন। ইরাণের অভিজাত বংশে

তাঁহার জন্ম—তিনি সম্পর্কে নাদিরের শ্যালক (সিরাজীর ভ্রাতা), পদগৌরবে 'রাজস্ব-সচিব'। অভিজাতদের যে সকল বৈশিষ্ট্য—মসীচর্চ্চা, বিলাস-ব্যসন প্রভৃতি তাহা তাঁহার আছে এবং তিনি যে অসিজীবী নন 'মসীজীবী আর বুদ্ধিজীবী' এজন্য তিনি গর্ব্বিত। থাকার মধ্যে আছে মরা বংশমর্য্যাদাটুকু এবং বাঁচা শিক্ষাভিমান। রাজস্বের আয়-ব্যয়ের হিসাব রক্ষায় তাঁহার প্রয়োজন অপরিহার্য্য এবং সেখানেই নাদিরের উপর তাঁহার আধিপত্য—এই ধরণের অভিমানও একটু আছে। আলি, এককথায় অধঃপতিত। কায়স্থ অর্থাৎ কেরাণীর জীবন-দর্শনেই তাঁহার বিশ্বাস—"মান-অপমানের খুব বেশী তোয়াক্কা আমি রাখিনে, আমি চাই কাজ। দুটো মিষ্টি কথা বললে যদি কাজ পাওয়া যায় তাতে ক্ষতি কি?" সিরাজীর কথায় তাহার বর্ত্তমান অবস্থাটি সুন্দর ব্যক্ত হইয়াছে "তোষামোদ করে আর অপমান স'য়ে তোমার গায়ের চামড়া এত পুরু হ'য়ে গেছে যে কোনো অপমানই চামড়া ভেদ করে অন্তরে গিয়ে পৌঁছয় না।" নাদির একদিকে বংশ-আভিজাত্য লইয়া উপহাস-পরিহাস ও অপমান করিয়া চলিয়াছেন, আলি আকবর আর-একদিকে "সমস্ত রাত্রি মদ্যপান করে নিজের আনন্দে বিভোর"........ । কোন অপমানই তাহার গায়ে লাগে না।

কিন্তু তাই বলিয়া, আলি একেবারে অন্ধ ন'ন। নাদিরকে প্রীতির চোখে তো দেখেনই না অধিকন্তু তাঁহাকে তিনি ঘৃণা করেন। আর তাহাতেই শেষ নয়। সিরাজীর একদিনের উত্তেজনায় আলি আকবরের নিশ্চিন্ত অসারতা কাটিয়া যায়। তিনি নাদিরের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন এবং 'কোন কাজ অর্দ্ধেক পর্য্যন্ত ক'রে ছেড়ে দেওয়া স্বভাব নয়' বলিয়া, শেষ পর্য্যন্ত না দেখিয়া ক্ষান্ত হন না। তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন "তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ সিরাজী। তুমি যদি উত্তেজিত না করতে তা' হ'লে এই রকম লাথি জুতো আর কানমলা খেয়ে আমি বোধ হয় বরাবরই বেঁচে থাকতাম।"

আলি মর্য্যাদার জন্য, বুদ্ধিতে যাহা কুলায় তাহার সবই করিতে প্রস্তুত—অবশ্য প্রাণ বাঁচাইয়া। সম্মুখ সংগ্রাম করিতে পারে দুঃসাহসী অসিজীবীরা আর পারে

রহমতের মত নির্ভীক আদর্শবাদীরা। আলি চালনা করিতে পারেন মসী, বুদ্ধি ও জিহ্বা। তাঁহার না আছে অসি-চালনার শক্তি, না আছে প্রাণের মায়া তুচ্ছ করিবার শক্তি। অগত্যা, আলি বিদায় গ্রহণ করেন এবং করিবার সময় তাহার স্বভাবের স্বরূপ ব্যক্ত করিয়া যান "প্রাণের মায়া আমায় কখনো ছাড়েনি। আজও সেই প্রাণের মায়া নিয়েই চল্লাম।"

(৬) **সিরাজী**। স্বখাত সলিলে যাঁহারা ডুবিয়া মরেন তাঁহাদের মৃত্যুর জন্য স্বাভাবিকভাবেই একটু শোচনা জাগে। সিরাজী একেবারে না মরিলেও স্বখাত সলিলে যে ডুবিয়াছেন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

সিরাজী অভিজাত বংশের কন্যা, তবে ভাগ্যগুণে বা দোষে আভিজাত্যহীন নাদিরের পত্নী। নাদির তাঁহাকে ভালবাসিয়া বিবাহ করেন নাই, বিবাহ করিয়াছিলেন রূপ-যৌবনের মোহে। রূপযৌবনের জোঁয়ার যতদিন ছিল ততদিন নাদিরকে তিনি আকর্ষণ করিয়াছেন, নাদিরের প্রাণে মত্ততা সৃষ্টি করিয়াছেন কিন্তু নাদিরের অন্তর স্পর্শ করিতে পারেন নাই। তাই রূপ-যৌবনে ভাঁটা পড়িতেই নাদিরের মোহ কাটিয়া গিয়াছে। নাদির তাঁহার মনোভাব ব্যক্তও করিয়াছেন—'ভেবেছিলাম তোমাকে বেগমের দল থেকে বরখাস্ত ক'রে বাঁদীর দলের সর্দ্দারণী ক'রে দেব।' (বড়র পীরিতিই বটে!)

এই সময়েই, ভারতবর্ষে আসিয়া নাদির 'সিতারা'র প্রতি আসক্ত হন এবং সিতারা নাকি তাঁহার অন্তর স্পশ করিতে তথা অমৃত দান করিতে সক্ষম হন— এই ব্যাপারে সিরাজী নারীসুলভ ঈর্ষায় ক্ষুব্ধ হইয়া উঠেন। বিশেষতঃ "পথের সুন্দরী" সিতারাকে মহিষী করায় এবং তাহারই পদতলে বসিয়া, কুর্ণিশ করিতে বাধ্য হওয়ায়, সিরাজীর অপমানের একশেষ হয়! সিরাজী আলি আকবরকে উত্তেজিত করিয়া অপমানের প্রতিশোধ লইতে চাহেন— অবশ্য তাহার প্রতিশোধ লওয়ার অর্থ—"দেখতে চাই—হিন্দুস্থানের হারামজাদীকে কাল সকালে কুত্তা দিয়ে খাওয়ানো হচ্ছে।" আলি উত্তেজিত হয় বটে কিন্তু তাহার উত্তেজনা রাজনৈতিক চক্রান্তের রূপ গ্রহণ করে অর্থাৎ সিরাজীর আসল স্বার্থের প্রতিকূ

হইয়া দাঁড়ায়। সিরাজীর আসল স্বার্থ—নাদিরকে সিতারার গ্রাস হইতে উদ্ধার করা এবং বিনা প্রতিযোগিতায় নাদিরের হারেমে মহিষী হইয়া থাকা। নাদির সিরাজীকে যত উপেক্ষা, যত অপমান দিয়াই আঘাত করুন না কেন সিরাজী কিন্তু নাদিরকে একটু আধটু নয় দস্তুর মত ভালবাসিয়াছে। আলি আকবরের কথা ফেলা যায় না—"মাঝে মাঝে তোমায় মনে হ'তো বুঝিবা তুমি কুলিখাঁকে একটু ভালবাস। এখন দেখছি দস্তুর মত ভালবাস—চাই কি তোমায় পতিব্রতা বলা চলে।" তবে অপমানের ও ঈর্ষার জ্বালায় পতিব্রতা এমন করিয়া আলি আকবরের প্রতিহিংসাকে জাগাইয়া তুলিয়াছে যে, আলি আকবরের ষড়যন্ত্রের ফলে পতিকেই হারাইয়াছে। সিরাজী নিজেই নিজের ট্র্যাজেডি ব্যক্ত করিয়াছে—"আমিই আমার স্বার্থ সিদ্ধির জন্য আলিকে প্রশ্রয় দিচ্ছি। তার অন্তর খুঁড়ে তার সুপ্ত প্রতিহিংসার সরীসৃপকে জাগিয়ে দিচ্ছি। এখন সে আমার বশের অতীত।" সিরাজী মনে করিয়াছিলেন যে, যে নাগিনী (সিতারা) নাদিরকে বেষ্টন করিয়া আছে, আলিকে দিয়া শুধু তাহাকেই তিনি মারিবেন এবং নাদিরকে মুক্ত করিয়া ভোগ করিবেন। কিন্তু আলি যে নাদিরকেই মারিবার আয়োজন করিবে তাহা তিনি মনেও করিতে পারেন নাই। যত বড ভুল, তত বড় প্রায়শ্চিত্তই কি তিনি করেন নাই? ঈর্ষান্ধের ট্র্যাজেডিই সিরাজীর ট্র্যাজেডি।

(৭) **সিতারা।** সিতারার সংক্ষিপ্ত পরিচয় সে নিজেই দিয়াছে—"আমি হিন্দু—রাজপুত নারী"..... "আমার পিতা ও স্বজাতির কাছ থেকে মোগলরা আমায় অপহরণ করে। তারপর, একজন কাপুরুষ মোগলবংশীয় লম্পটের সঙ্গে এক মোল্লা এসে আমায় বিবাহ দেয়।"......"বিবাহের রাত্রে লম্পট আমার অঙ্গ স্পর্শ ক'রতে আসে। আমি তাকে বধ করি"......'আমি নিশীথ অন্ধকারে পুরী ত্যাগ করি।"......দেশে ফিরে গিয়ে শুনলাম, বাপ-মা গেছেন। দেশে কেউ আমায় স্থান দিলে না......শেষে.. ..."কণ্ঠকে......পাথেয় ক'রেই পথে বেরিয়ে পড়লাম" ......

সিতারা জাতিতে হিন্দু, রাজপুত এবং রাজপুত-নারীর মতই সে বীর-

পূজারী—বীরাঙ্গনা। কিন্তু দুর্ভাগ্য তাঁহার, মোগল-দুর্বৃত্তের পাপ আচরণে—সমাজের বা ঘরের আচ্ছাদন হইতে সে বঞ্চিত; সমাজের সংকীর্ণতায় নিষ্পাপ হওয়া সত্ত্বেও "পথের সুন্দরী"-তে পরিণত। পথে পথেই সে এতকাল বেড়াইয়াছে। সেদিন—"উজীর সাহেবের অনুচর জাঁহাপনাকে উপহার দেবার জন্য ক্রীতদাসী খুঁজতে বেরিয়েছিল"......'তাহাকে...মোগল সম্রাটের শিবিরে নিয়ে এল'...তারপর ভাল পোষাক পরাইয়া নাদিরের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছে। যে বীরাঙ্গনা সিতারা লম্পট মোগল স্বামীর বুকে ছুরিকা বসাইয়াছে, সে কি ভাবিয়া অনুচরদের কথামত মোগল সম্রাটের শিবিরে আসিয়াছে এবং শেষ পর্য্যন্ত নাদির শাহের সম্মুখে আসিয়াছে তাহা অবশ্য বুঝা যায় না। যাহা হউক সিতারা আসে এবং আসিয়াই নাদিরের মন জয় করে। * নাদিরের মনের মানুষের আদর্শের সহিত সিতারার অধিক সাদৃশ্য—নাদির আভিজাত্য-বিদ্বেষী, সিতারা অনভিজাত—পথের সুন্দরী; নাদির পৌরুষ-প্রিয়, সিতারা তেজস্বিনী বীরাঙ্গনা; নাদির ধর্মের কোন সাম্প্রদায়িক গণ্ডীতে আবদ্ধ নন, সিতারাও কোন বিশেষত ধর্মের গণ্ডীতে আবদ্ধ নয়। নাদির সিতারার বীরত্ব, রূপ-যৌবন এবং বুদ্ধি দেখিয়া মুগ্ধ হন এবং তাহাকে প্রধানা মহিষীর পদ দান করেন। সিতারা গররাজি হয় না; কারণ "একভাবে তো কাটাতে হবে"। শুধু যে রাজিই হয় তাহা নয়, পৌরুষের-অবতার নাদিরকে ভালও বাসে। নাদিরেরও সিতারার প্রেমে অমৃতের তৃষ্ণা মেটে। তিনি নবযৌবন লাভ করেন।

যেখানে অনুরাগ প্রেমে পরিণত, সেখানেই প্রেমাস্পদের জন্য আত্মত্যাগের প্রবণতা সহজ হইয়া উঠে। সিতারার মুখেই শোনা যায়—সে নাদিরকে অভিশাপমুক্ত করিবার জন্য মৃত্যু পর্য্যন্ত বরণ করিতে প্রস্তুত। সিরাজী চক্রান্তের

---

* [সিতারার-চরিত্র অসাধারণ কিন্তু মধুর। এই চরিত্রের বাস্তবতা অসাধারণের বাস্তবিকতা। এই বাস্তবিকতার মায়া-আবরণ কোন কোন ক্ষেত্রে শিথিল হইয়া পড়িয়াছে]

ফাঁদ পাতিবার জন্ম প্রথম সিতারার এই আত্মত্যাগেরও উদারতার সুযোগ গ্রহণ করে। কিন্তু সিতারার প্রতি অবিশ্বাস জন্মাইবার চেষ্টা সফল হয় না—ফাঁদ ফাঁসিয়া যায়। শেষ পর্য্যন্ত সিরাজীরই চক্রান্তে, সুলতানার অনুরোধে, রেজা-কুলির প্রাণ বাঁচাইতে গিয়া নাদিরের কুৎসিত সন্দেহের আঘাতে মর্ম্মাহত এবং নাদিরেরই আদেশে বিতাড়িত হয়। 'পথের সুন্দরী' আবার পথে গিয়া দাঁড়ায়; কিন্তু নাদিরের স্মৃতি এবং চরিত্রের বিকৃতি তাহাকে পীড়া দিতে থাকে। গানে গানে সে হৃদয়ের গোপন ব্যথা জানায়—'স্মৃতির বাঁধন, স্মৃতির কাঁদন' ভুলিতে চায়। কিন্তু ভুলিতে পারা কি সহজ, না সম্ভব? ঘুরিতে ঘুরিতে সে খোরাসানে এবং কথোপকথনরত সালেবেগ-রহমতের দৃষ্টি-পরিধির মধ্যেও আসে। কিন্তু সালেবেগের দৃষ্টি এড়াইবার জন্ম সে কেন যেন পলায়ন করে আবার সেই-খানেই আসিয়া রহমতের সঙ্গে আলাপ করে—সম্রাটের শিবির কোথায় তাহা জানিয়া লয়। শেষ পর্য্যন্ত, সম্রাট-শিবিরে সম্রাটের আলিঙ্গনে আবদ্ধ থাকিয়া একই সঙ্গে নিহত হয়। সীতারা জীবনের যাত্রাপথে দেশ জাতি ধর্ম্ম সব হারাইয়াছে—পাওয়ার মধ্যে পাইয়াছে, নাদিরের ভালবাসা নাদিরকে ভালবাসার আনন্দ আবার প্রেমাস্পদেরই দেওয়া চরম আঘাত। তবু প্রেম পরাভব মানে নাই। প্রেমাস্পদকে বাঁচাইবার জন্য তাঁহার বুকেই ফিরিয়া আসিয়াছে।

ভাব মূল্য

সাহিত্য-শিল্পের মূল্যকে মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে—এক **আনন্দ-মূল্য** (Pleasure value); দুই—**প্রভাব-মূল্য** (Influence value)। অবশ্য একথাও মনে রাখা দরকার যে—শিল্পে তত্ত্ব বা প্রচারকে রসের উপাদান হিসাবে স্থান গ্রহণ করিতে হইবে। রস-সাহিত্যের বিশেষ লক্ষ্য—রস এবং সেখানেই শাস্ত্রসাহিত্যের সঙ্গে উহার পার্থক্য। তবে এ

কথাও সত্য—"though there can be art without purpose, there cannot be art without result. Everything that moves men, moves them in some direction, up or down, for better or worse." আনন্দমূল্য সাহিত্যের বড় মূল্য বটে, কিন্তু উহাদের বিচারেই মূল্য—বিচার শেষ হয় না—ফলশ্রুতি বা 'প্রভাব-মূল্য'-বিচারও চাই।

'প্রভাব-মূল্য প্রকাশ পায় মোটামুটি দুইভাবে এক, "ভাব-বস্তু"—প্রচারে ; দুই চরিত্রের পরিণতি অঙ্কনে। দিগ্বিজয়ী নাটকে নাট্যকার নিম্নলিখিত "ভাব" প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন :—(সংক্ষিপ্ত তালিকাকারে)

(ক) নাটকের মূল ভাব—(নাদিরের ট্র্যাজেডি আলোচনায় আলোচিত)

(খ) 'বংশের নয়, নিজের পরিচয়ে মানুষ দাঁড়াবে।'—"আভিজাত্যের চেয়ে মানুষ শ্রেষ্ঠ, কেননা আভিজাত্য মানুষ সৃষ্টি করে না, মানুষই আভিজাত্যের স্রষ্টা।"

(গ) সাম্প্রদায়িক ধর্মই সংকীর্ণ গণ্ডী রচনা করিয়া রাখিয়াছে—মানুষে মানুষে ঘৃণা-বিদ্বেষ জীয়াইয়া রাখিয়াছে। যিনি এই গণ্ডী অতিক্রম করিতে পারেন, তিনিই সিতারার মত বলিতে পারেন—"আমি সব ধর্ম্মকেই সত্য বলে জানি, সেই জন্য কোন বিশেষ ধর্ম্মের গণ্ডীর জন্য ব্যস্ত হ'ইনি।" রহমতের মতই তিনি বলিতে পারেন—"কোনো সাম্প্রদায়িক ধর্ম আমার নেই" (পরমত-সহিষ্ণুতা, পরধমসহিষ্ণুতা—প্রচার)

(ঘ) **মানবতার মহিমা**ঃ—রহমতের হস্তে মানবতার মহিমা-কেতন উড্ডীন রহিয়াছে। কণ্ঠে তাহার উদাত্ত বিশ্বাস-বাণী—"মানুষ পশু হ'য়ে গেছে, এ কথায় বিশ্বাস করার চেয়ে বোধ হয় মরাও ভাল।"

. ঙ) **আত্মিক শক্তির মৃত্যুঞ্জয় প্রতিষ্ঠা**ঃ—পশুবল সাময়িক ভাবে মানব-মহিমার আলোক আচ্ছাদিত করিতে পারে, সত্য, কিন্তু পশু-বলের পরাজয় অনিবার্য্য। রহমতের মত অহিংসা-নীতিবাদীরা' আদর্শবাদীরা প্রাণ দিয়া এবং স্যালেবেগের মত আদর্শবাদীরা নিষ্ঠা দিয়া পশুর পতন ঘটাইবেই।

(চ) **অহিংসা ও প্রেমেই মানব জীবনের মহত্তম বিকাশ।** "ধর্ম্মের চেয়েও পৃথিবীতে ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ দান প্রেম। সে প্রেম যার জীবনে অসম্মানিত হয় তার চেয়ে দুর্ভাগ্য পৃথিবীতে আর নাই"। প্রেমই বিধাতার শুভঙ্করী ইচ্ছার রূপ—প্রেমই জগতের মিলনী শক্তি। (সিতারার মৃত্যু—অশিব শক্তিকে প্রকৃতিস্থ করিবার জন্য প্রেম বা শিব-শক্তির আত্মদানের সংকেত)

(ছ) **জীবন দর্শন :**—মানবতার মহিমা, আত্মিক শক্তির মহিমা, অহিংসা ও প্রেমের মহিমা—অসাম্প্রদায়িক ধর্মের মহিমা উদ্ঘোষিত হইলেও এই নাটকে নাদিরের মুখে মানুষের স্বরূপ সম্বন্ধে যে দর্শন ব্যক্ত হইয়াছে তাহা ভারতীয় সংস্কারের বিরোধী। "পাপই মানুষের প্রকৃতি, পাপেই তার আনন্দ, সে পাপাত্মা পাপ-সম্ভব। কোন ধর্ম্মের কোনো ঈশ্বর তাকে এ পাপ থেকে মুক্তি দিতে পারেনি —পারবে না।"—লোকত্তর পুরুষ নাদিরের এই উক্তি "অমৃতের সন্তান" মানুষকে ছোটই করিয়াছে।—"মানবের মুক্তি—'জগতে সাম্য-বিধান'"—প্রভৃতি বিষয়ে নাদিরের যে অনাস্থা প্রকাশ পাইয়াছে, বিকৃত প্রতিভার উক্তি হইলেও, উহার প্রভাব অনস্বীকার্য্য। কারণ, সালেবেগের মত ভাষ্যকারের কল্পনা যাহার নাগাল পায়না, যাঁহার কাছে রহমৎ ও সালেবেগ নিজেদের খুবই ছোট মনে করিয়াছেন, তাঁহার সিদ্ধান্তের প্রতি সাধারণ লোকের আস্থা হইবে—ইহা খুবই স্বাভাবিক।

সমাপ্ত

নরনারায়ণ

ক্ষীরোদপ্রসাদ (১৮৬৩-১৯২৭)

(ক)	জন্ম ...	...	১২ই এপ্রিল, ১৮৬৩
(খ)	পিতা	...	গুরুচরণ ভট্টাচার্য্য শিরোমণি [খড়দহের গুরুবংশ উপাধি বন্দ্যোপাধ্যায়]
(গ)	এণ্ট্রান্স পরীক্ষা	...	১৮৮১, বারাকপুর গভর্ণমেণ্ট স্কুল (২য় বিভাগ)
(ঘ)	এফ্. এ.	...	১৮৮৩ জেনারেল এসেম্ব্লীজ ইন্‌ষ্টিটিউশন (২য় বিভাগ)
(ঙ)	বি-এ	...	১৮৮৮, মেট্রোপলিটান কলেজ, (২য় শ্রেণী— পদার্থ ও রসায়ন বিদ্যা)
(চ)	এম্. এ.	...	১৮৮৯ প্রেসিডেন্সী কলেজ (২য় শ্রেণী— রসায়ণ শাস্ত্র)

(ছ) রসায়ণ শাস্ত্রের অধ্যাপক, জেনারেল এসেম্ব্লীজ ইন্‌ষ্টিটিউশন—(১৮৯২— ১৯০৩=১১ বৎসর)

(জ)	নাট্যকার	...	(১৮৯৪—১৯২৬)
(ঝ)	মৃত্যু ...	...	৪ঠা জুলাই ১৯২৭, রাত্রি ১॥ টায় ৬৬ বৎসর বয়সে বাঁকুড়া সহরের সন্নিকটে 'বিকনা' গ্রামে, পল্লীকুটীরে।

ক্ষীরোদ প্রসাদের রচনা-তালিকা

	নাটক	গল্প-উপন্যাস	কবিতা	প্রবন্ধ
১৮৮৫	×	রাজনৈতিক সন্ন্যাসী ২ খণ্ড (গল্প)	×	×
১৮৯৩	×	×	×	ইংলণ্ডে রাষ্ট্রবিপ্লব
১৮৯৪	ফুলশয্যা (দৃশ্য কাব্য)	×	মিনতি জন্মভূমি	×
১৮৯৫	×	×	×	*নাটক
১৮৯৬	প্রেমাঞ্জলি (পৌরাণিক নাটক)	কবি-কাননিকা (রঙ্গন্যাস)	×	×
১৮৯৭	আলিবাবা (রঙ্গ-নাট্য)	×	×	×
১৮৯৮	প্রমোদরঞ্জন (রঙ্গনাট্য)	×	×	×
১৮৯৯	কুমারী (নাট্য কাব্য)	×	×	×
১৯০০	জুলিয়া (গীতি নাট্য) বভ্রুবাহন (নাট্য কাব্য)	×	×	শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা
১৯০২	সাবিত্রী (পৌরাণিক) সপ্তম প্রতিমা (নাটক)	×	×	×
১৯০৩	বেদৌরা (গীতি নাট্য) বঙ্গের প্রতাপ-আদিত্য (ঐতিহাসিক) রঘুবীর (নাটক)	×	×	×

	নাটক	গল্প-উপন্যাস	কবিতা	প্রবন্ধ
১৯০৪	বৃন্দাবন বিলাস (গীতি) রঙ্গাবতী (ঐতি-কল্প)	নারায়নী (উপন্যাস)	দধীচির অস্থিদান	×
১৯০৫	×	নির্ব্বাসিত (গল্প)	×	×
১৯০৬	উলূপী (পৌরাণিক নাটক) শিরী-ফরাদ (নাটিকা) পদ্মিনী (ঐতি…)	×	×	×
১৯০৭	পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত (ঐ) রক্ষঃ ও রমণী (নাটক) চাঁদবিবি (ঐতি…)	উৎকলের গল্প (ছাত্র সখা)	×	×
১৯০৮	নন্দকুমার (ঐতিহাসিক) দাদা ও দিদি (রঙ্গ) অশোক (ঐতি…) বাসন্তী (গীতি) বরুণা (গীতি) ভূতের বেগার (রঙ্গ)	×	মিলন ('জাহ্নবী')	× ×
১৯০৯	দৌলতে দুনিয়া	বিরাম কুঞ্জ (গল্প লহরী) দুর্গা (পৌরাণিক আখ্যান)		×
১৯১০	বাঙ্গালার মসনদ (ঐতি)	×	×	রঙ্গালয়ের উন্নতি ও অবনতি
১৯১১	পলিন (গীতি নাট্য)	×	সম্মিলন	
১৯১২	মিডিয়া (কল্পনামূলক) শাজাহান (ঐতিহাসিক)	পুনরাগমন সামাজিক (উপন্যাস)	×	×

	নাটক	গল্প-উপন্যাস	কবিতা	প্রবন্ধ
১৯১৩	ভীষ্ম (পৌরাণিক) রূপের ডালি (রঙ্গ-নাট্য	×	আমি ও তুমি	×
১৯১৪	নিয়তি	×	×	×
১৯১৫	আহেরিয়া (ঐতিহাসিক) বাদশাজাদী (কল্পনামূলক)	×	×	×
১৯১৬	রামানুজ (ধর্ম্মমূলক)	×	×	×
১৯১৭	বঙ্গে রাঠোর (ঐতি ?)	×	×	×
১৯১৮	কিন্নরী (গীতি-নাট্য)	×	×	×
১৯১৯	×	নিবেদিতা (উপন্যাস)	×	×
১৯২০	×	গুহামুখে (উপন্যাস)	×	×
১৯২১	*আলমগীর (৯ই ডিসেম্বর)	×	×	×
১৯২২	রত্নেশ্বরের মন্দিরে (নাটক)	×	×	×
১৯২৩	বিদূরথ (ঐতিহাসিক)	গুহামধ্যে (উপন্যাস)	×	নিশীথের কথা- শ্যামাপাখী (স্বপ্ন)
১৯২৪	×	পতিতার সিদ্ধি (উপ) চাঁদের আলো (উপ ?)	রূপ ও রঙ্গ	×
১৯২৫	গোলকুণ্ডা (ঐতিহাসিক)		শক্তিপূজা	×
১৯২৬	জয়শ্রী (নাটক) রাধাকৃষ্ণ (গীতি)	একরাত্রি (উপন্যাস) (বসুমতী)	×	×
১৯২৭	*নর-নারায়ণ	ফুলো (গল্প)	×	অভিরামের গীতি

মোট—৪৬

উপন্যাস = ৮
গল্প — "৩" (বই)
+
'আরো'

} কবিতা — ৯ প্রবন্ধ — ৮

নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ

কোন শিল্পী সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছিবার পূর্ব্বে, শিল্পীর সমগ্র রচনার 'শৈল্পিক মূল্য' বিশেষভাবে নির্দ্ধারণ করিয়া লওয়া আবশ্যক। তাহা না করিলে, বলা বাহুল্য, সিদ্ধান্ত একদেশদর্শী এবং অসম্পূর্ণ, এক কথায় ভ্রান্ত হইতে বাধ্য। কিন্তু "শৈল্পিক মূল্য" কথাটি শুনিতে বা বলিতে যত সহজ, নির্দ্ধারণ ব্যাপারটি তত সহজ তো নয়ই, বরং সর্ব্বাপেক্ষা দুঃসাধ্য। সমালোচক মাত্রই সিদ্ধান্তে পৌঁছিবার জন্য লালায়িত, কিন্তু সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে যে পরিশ্রম প্রয়োজন তাহা অনেক সমালোচনার মধ্যেই পাওয়া যায় না। লেখকের প্রত্যেকটি রচনার ভাববস্তু (content) ও রূপ (form) বিচার করিয়া, রচনাটিকে পূর্ব্ববর্ত্তী শিল্পীদের অনুরূপ রচনার সহিত তুলনা করিয়া ভাবের ও রূপের মৌলিকতার মাত্রা নিরূপণ করিয়া, কাহিনী-ভাব-চরিত্র-ভাষা-কল্পনা প্রভৃতির বৈশিষ্ট্য হিসাব-নিকাশ করিয়া জীবন-সমালোচনার ব্যাপকতা ও গভীরতা নির্দ্ধারণ করিয়া সমালোচনা করা খুবই দুর্লভ শক্তির কাজ। বাস্তবিক, এই জাতীয় সমালোচনা—একাধারে ঐতিহাসিক-সমালোচনা, তুলনামূলক-সমালোচনা, রস-সমালোচনা, আলঙ্কারিক-সমালোচনা সমালোচনা-সাহিত্যে দুর্লভ বস্তু। ইহার জন্য চাই যেমন ব্যাপক অধ্যয়ন ও শাস্ত্রানুশীলন, তেমনি বৈজ্ঞানিক পর্য্যবেক্ষণ-শক্তি ও বিশ্লেষণ-শক্তি।

বলা দরকার, এইরূপ আদর্শ-সমালোচনা, এই সংকীর্ণ অবসরে সম্ভব নয়। এখানে সংক্ষিপ্ত, ও সাধারণ পরিচয় দেওয়া ছাড়া অন্যরূপ কিছু করার অবকাশ নাই এবং নাই বলিয়াই, আমি প্রথমে ক্ষীরোদপ্রসাদের নাট্য-রচনার অতি-সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করিতেছি। এবং সেই চেষ্টার মধ্য দিয়াই সাধারণভাবে ক্ষীরোদপ্রসাদের নাট্যের বিষয়বস্তু রস, শৈল্পিক সার্থকতার মাত্রা প্রভৃতি পাঠকবর্গের সম্মুখে তুলিয়া ধরিতেছি। সাধারণ সমালোচনার ত্রুটি হইতে আমার এই সমালোচনা যে মুক্ত নয়—সে কথা গোড়াতেই বলিয়া রাখিতেছি।

নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ যখন নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হন তখন বাংলা-নাট্য সাহিত্যের বয়ঃক্রম [(*১৮৫২—১৮৯৪)—৪২] একচল্লিশ বৎসর। অখ্যাত বিখ্যাত বহু নাট্যকারের সাধনার ফলে বাংলা নাট্যসাহিত্য তখন উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠা বা ব্যক্তিত্ব অর্জ্জন করিয়াছে। মোটকথা, গণনায় এবং গুণে বাংলা নাটকের মর্য্যাদা তখন একেবারে নগণ্য বলা চলে না।

(১) তারাচরণ শিকদার, (২) যোগেন্দ্র চন্দ্র গুপ্ত (৩) রামনারায়ণ (৪) হরচন্দ্র ঘোষ * (৫) কালীপ্রসন্ন সিংহ (৬) নন্দকুমার রায় (৭) উমেশচন্দ্র মিত্র (৮) উমাচরণ চট্টোপাধ্যায়, (৯) রাধামাধব মিত্র (১০) যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় (১১) নারায়ণ চট্টরাজ (১২) শ্রীশিমুএল পীর বক্স (১৩) হরিশ্চন্দ্র মিত্র (১৪) যদুনাথ চট্টোপাধ্যায় (১৫) মণিমোহন সরকার (১৬) শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর (১৭) * **মধুসূদন দত্ত** (১৮) হরিশ্চন্দ্র মিত্র (১৯) সত্যেন্দ্র নাথ ঠাকুর (২০) * **দীনবন্ধু মিত্র** প্রভৃতি বিদায় লইয়াছেন। **জ্যোতিরিন্দ্র নাথ**—কিঞ্চিৎ জলযোগ (১৮৭২), পুরুবিক্রম নাটক (১৮৭৪), সরোজিনী (১৮৭৫), এমন কর্ম আর করবনা (১৮৭৭), অশ্রুমতী (১৮৭৯), মানময়ী (১৮৮০), স্বপ্নময়ী নাটক (১৮৮২) হঠাৎ নবাব (১৮৮৪) পর্য্যন্ত মোট ৮খানি লিখিয়াছেন... (আরো ২৫ খানি লেখা বাকী); **অমৃতলাল বসু**—হীরকচূর্ণ নাটক (১৮৭৫), চোরের উপরে বাটপাড়ি (১৮৭৬), তিলতর্পণ নাটক (১৮৮১), ব্রজলীলা (১৮৮২), ডিসমিস (১৮৮৩), চটুজ্যে ও বাঁড়ুয্যে (১৮৮৪), বিবাহ বিভ্রাট (১৮৮৪) তরুবালা (১৮৯১), রাজা বাহাদুর (১৮৯১), কালাপাণি (১৯৯২) বিমাতা (১৮৯৩), বাবু (১৮৯৪)—মোট ১২ খানি লিখিয়াছেন—(আরো ৩৮।৩৯ খানি বাকী); (খ) **রাজকৃষ্ণ রায়**—অনলে বিজলী (১৮৭৮), দ্বাদশ গোপাল (১৮৭৮), লৌহ কারাগার (১৮৮০), তারক সংহার (১৮৮০), হরধনু ভঙ্গ (১৮৮১) রামের বনবাস (১৮৮২) যদুবংশ ধ্বংস (১৮৮৪) তরণীসেন বধ (৫৮৮৪), রাজা বিক্রমাদিত্য (১৮৮৪), প্রহ্লাদ চরিত্র (১৮৮৪) চন্দ্রহাস (১৮৮৮), হরিদাস ঠাকুর (১৮৮৮) কলির প্রহ্লাদ (১৮৮৮৮) মীরাবাঈ—(১৯৮৯), চমৎকার (১৮৮৯ ?) খোকাবাবু (১৮৯০)

বেলুনে বাঙালী বিবি (১৮৯০) ডাক্তারবাবু (১৮৯০) সত্যমঙ্গল (১৮০০) চতুরালী (১৮৯০), চন্দ্রাবলী (১৮৯০) টোট্‌কা-টাটকা (১৮৯০(১৮৯০) জগা পাগলা বা জ্যান্ত মরা (১৮৯০) লোভেন্দ্র গবেন্দ্র (১৮৯০) জুজু (১৮৯০) রাজা বংশধ্বজ (১৮৯১) লক্ষহীরা (১৮৯১) প্রহ্লাদ মহিমা (১৮৯১) লয়লা মজনু (১৮৯১) বনবীর (১৮৯২) ঋষ্যশৃঙ্গ (১৮৯২) বেনজীর বদরে মুনীর (১৮৯১)…মোট ৩৩ খানি ছোট বড় নাটক-নাটিকা রচনা শেষ করিয়া ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে পরলোক গমন করিয়াছেন। (গ) **মনোমোহন বসু**—রামাভিষেক নাটক (১৮৬৭), প্রণয় পরীক্ষা নাটক (১৮৬৯), সতী নাটক (১৮৬৯) নাগাশ্রমের অভিনয় (১৮৭৫), হরিশ্চন্দ্র নাটক (১৮৭৫) পার্থ পরাজয় নাটক (১৮৮১), রাসলীলা নাটক (১৮৮৯), আনন্দময় (১৮৯০) ৮ খানি নাটক লিখিয়াছেন (ঙ) **বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়**—মেঘনাদ ব্যঙ্গকাব্য (১৮৭৮), আচভুয়ার বোম্বাচাক (১৮৮০) অহল্যাহরণ (১৮৮১), রাবণ বধ (১৮৮২), দ্রৌপদীর সয়ম্বর (১৮৮৪), রাজসূয় যজ্ঞ (১৮৮৫) প্রভাস-মিলন (১৮৮৭), সীতা স্বয়ম্বর (১৮৮৮), নন্দবিদায় (১৮৮৮) জন্মাষ্টমী (১৮৮৯), পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ (১৮৮৯) মোহশেল (১৮৯২) খণ্ডপ্রলয় (১৮৯৩)—১৩ খানি লঘু-গুরু নাটক-নাটিকা রচনা করিয়াছেন—(আরো ৮ খানি তখনও বাকী)।(চ) * * **নাট্যকার গিরিশচন্দ্র** ১৮৭৭ খ্রীঃ আরম্ভ করিয়া ৪৫।৪৬ খানি নাটক-নাটিকা লিখিয়া ফেলিয়াছেন (ছ) **রবীন্দ্রনাথ**—বাল্মীকি প্রতিভা, রুদ্রচণ্ড (১৮৮১) কালমৃগয়া (১৮৮২) প্রকৃতির প্রতিশোধ (১৮৮৪), নলিনী (১৮৮৪) মায়ার খেলা (১৮৮৮) * রাজা ও রাণী (১০৮৯), *বিসর্জন (১৮৯০), গোড়ায় গলদ (১৮৯২) রচনা শেষ করিয়াছেন।

ক্ষীরোদ প্রসাদের নাট্য-রচনার সংক্ষিপ্তপরিচয়।

(১) ক্ষীরোদপ্রসাদের প্রথম নাটক—**ফুলশয্যা** (১৮৯৪) পঞ্চাঙ্ক—(দৃশ্য সংখ্যা ৪+৪+৫+৫+৬=২৪) রাজপুত-কাহিনী অবলম্বনে—"বিয়োগান্ত দৃশ্য কাব্য"। নির্ব্বাসিত ভূদাপতি শূরতান সিংহের কন্যাদ্বয় তারা ও বীণার… বিশেষতঃ তারার পিতৃরাজ্য উদ্ধারের ঐকান্তিক সঙ্কল্প—(ভূদারাজ্যোদ্ধার

মোর জীবনের ব্রত) সেই সঙ্কল্পের বা দেশব্রতের সঙ্গে প্রেমের ঐকান্তিক দ্বন্দ্ব এই নাটকের মুখ্য উপস্থাপ্য বিষয়। একদিকে অটল সঙ্কল্প, অন্যদিকে চিতোরের জ্যেষ্ঠ রাজকুমার পৃথ্বীরাজের প্রতি তারার প্রেম—এই দুই ভাববন্ধের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়, তাহার সমাধান ঘটে দেশপ্রেমের অগ্নি-শিখায় রচিত প্রিয়তমের চিতা শয্যায় তারার ফুলশয্যা রচনায়। * দেশোদ্ধার-ব্রতকে সমস্ত শ্রেয়-প্রেয়ের উর্দ্ধে স্থান দেওয়ার আদর্শ প্রতিষ্ঠা করা এখানে মুখ্য উদ্দেশ্য এবং গৌণ উদ্দেশ্য নারীর বীরাঙ্গনা সত্তাকে উদ্বোধিত করা—দেশোদ্ধারের জন্য নারী-শক্তিকে দেহে-মনে প্রস্তুত করার ইঙ্গিত দেওয়া। নাটকখানির পরিণামে বিয়োগান্ত এবং রসের দিক দিয়া ট্র্যাজেডি-রসাত্মক বটে কিন্তু ঘটনা-বিন্যাসে অবাস্তবতার স্পর্শ বেশী মাত্রায় থাকায় রসের গুরুত্ব অনেক পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে। এই বাস্তবতার আবহাওয়া লঘু হইয়া যাওয়ায় নাটকখান রোমান্স জাতীয় রচনায় পর্য্যবসিত হইয়া গিয়াছে।

(২) দ্বিতীয় নাট্যরচনা—**প্রেমাঞ্জলি** (১৮৯৬)—চতুরঙ্ক পৌরাণিক প্রহসন। নাটকের বিষয়বস্তু—নাট্যকারের নিজের ভাষায়—"শান্তিপর্ব্বের এক স্থানে নারদের দুর্দ্দশার কথা লেখা আছে। সেই মূলসূত্র ধরিয়া মনের সাধে যথেচ্ছ লিখিয়া নারদকে বানর নাচাইয়াছি।" মামা নারদ এবং ভাগ্নে পর্ব্বতের স্থূল রসিকতার সহিত শেষ দিকে যথাসম্ভব প্রেমতত্ত্ব-প্রকৃতিতত্ত্বের সামান্য মাত্রা মিশাইয়া হাল্‌কা ধরণের হাস্যরস পরিবেষণ করা হইয়াছে।

(৩) তৃতীয়—**আলিবাবা** (১৮৯৭) তিনাঙ্ক রঙ্গনাট্য। আলিবাবা ও দস্যুদল—কাহিনী অবলম্বনে রচিত নাচ-গান ও রসিকতা এবং গল্প-রসের মধ্যে এই রঙ্গনাট্যের প্রাণশক্তি নিহিত। নাটকখানি বহু অভিনীত এবং রঙ্গনাট্য হিসাবে উল্লেখযোগ্য।

(৪) **প্রমোদরঞ্জন**—(১৮৯৮) তিনাঙ্ক রঙ্গনাট্য। কাল্পনিক পাত্র-পাত্রীর সাহায্যে, "মানুষের ওপর রাগ করা আর ভগবানের ওপর রাগ করা একই কথ." এই তত্ত্বটিকে ব্যক্ত করা নাটকের উদ্দেশ্য।

এই নাটকের আসল উদ্দেশ্য—"জয়ন্তী" বুড়ীর—"দে রামা মানুষ দে" ধুয়োটির মধ্যেই আছে—মানুষের মত মানুষ চাই—যে প্রত্যুপকারের কামনা না রেখেই মানুষের উপকার করবে—মানুষকে ভালবাসবে। দ্বিতীয়তঃ সন্ন্যাসে মুক্তি নেই, সন্ন্যাসে 'শান্তি' নেই—বিশ্ব প্রেমেই শান্তি, তাহাতেই মুক্তি। তবে এতবড় তত্ত্বকে এত হালকা পাত্রে পরিবেষণ করায় তত্ত্বের গুরুত্ব, একেবারে নষ্ট হইয়া না গেলেও, খুবই কমিয়া গিয়াছে।

(৫) **কুমারী** (১৮৯৯) তিনাঙ্ক—কাল্পনিক নাটক (গ্রন্থাবলীতে "নাট্য-কাব্য"—বলিয়া চিহ্নিত) 'কুমারী' পূজার প্রথা বা ব্রত কথা অবলম্বনে লিখিত-আনন্দ-পরিণাম নাটক। শাস্ত্রবিহিত ধর্ম্মের উপর মর্ম্মবিহিত ধর্মের স্থান এবং ধর্ম্ম সাধনায় ব্রাহ্মণ চণ্ডাল সকল জীবেরই সমান অধিকার—এই ভাবটিই নাটকের আত্মা।

(৬) **জুলিয়া** (১৯০০) তিনাঙ্ক—আনন্দ-পরিণাম নাটক। বোগদাদের কালিফ হারুণ-অল-রসিদের আত্মত্যাগ-মহত্ত্বের একটি কাহিনী অবলম্বনে রচিত। জুলিয়া ও গানেমের ঐকান্তিক প্রেমের পরিচয় পাইয়া, জুলিয়ার রূপে মুগ্ধ হওয়া সত্ত্বেও, কালিফ গানেমের হস্তে জুলিয়াকে অর্পণ করেন; তিনি প্রেমের মর্ম্ম অনুভব করেন—বুঝেন—"প্রেমের তুলনায় রাজ্য ঐশ্বর্য্য মহাশক্তি পরমাণু থ'তেও তুচ্ছ···যেখানে প্রেম সেখানে মহাদান আত্মত্যাগ···" নাটকখানির অন্য ফলশ্রুতি—'ঈশ্বর যা করেন মঙ্গলের জন্যই করেন।'

(৭) **বভ্রুবাহন** (১৯০০) পৌরাণিক নাটক। চিত্রাঙ্গদা-পুত্র বভ্রুবাহনের কাহিনী অবলম্বনে রচিত। গাণ্ডীবী অর্জ্জুনের ঔরসে চিত্রাঙ্গদার গর্ভে বভ্রুবাহনের জন্ম। নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাস—ক্ষত্রিয় অভিমানের ধর্ম্মক্ষেত্রে পিতার সহিত পুত্রের দ্বন্দ্ব অনিবার্য হইয়া উঠে। এই দ্বন্দ্বেরই রূপ ও পরিণতি এই নাটকে প্রকাশিত।

(৮) **সাবিত্রী**—(১৯০২) চতুরঙ্ক **পৌরাণিক** নাটক—পাতিব্রত্যের তথা প্রেমের মৃত্যুঞ্জয়ী শক্তির মহিমা প্রদর্শন—এই নাটকের উদ্দেশ্য। কাহিনীর

স্বকীয় রসমূল্য চিরন্তন। নাট্যকার রসের অভিব্যঞ্জনায় উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই।

(৯) **সপ্তম প্রতিমা** (১৯০২)

(১০) **বেদৌরা** (১৯৩৩)—পঞ্চাঙ্ক **গীতি-নাট্য**—উপকথাশ্রয়ী 'প্রেম'-রসাত্মক নাটক। চীন রাজকন্যা বেদৌরা ও খালেদানের রাজকুমার কমরল-জমানের 'স্বপ্নময় প্রেমের কাহিনী অবলম্বনে রচিত'। জুলিয়া নাটকের মধ্যেই এই নাটকের জন্ম-বীজ পাওয়া যায়—"এই রকম রাত্রিকালেই চীনরাজকুমারী বেদৌরা বাগানের মর্ম্মর বেদীর উপর বসে সখীদের সঙ্গে গল্প করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েছিল, আর ঘুমচোখে নিজের পাশে ঘুমন্ত রাজকুমার কমরলজমানকে দেখতে পেয়েছিল।" শিল্পকর্ম হিসাবে নাটকখানির মূল্য খুব সামান্যই।

(১১) **বঙ্গের প্রতাপ-আদিত্য**—(১৯৩৩) পঞ্চাঙ্ক **ঐতিহাসিক** নাটক বঙ্গের শেষ বীর প্রতাপাদিত্যের জীবনকে ট্র্যাজিডি-রস-পরিণতি দান করা নাট্যকারের উদ্দেশ্য বটে, কিন্তু ঘটনা-বিন্যাসে কাল্পনিকতা এত প্রশ্রয় পাইয়াছে, চরিত্র সৃষ্টিতে চমৎকার অপেক্ষা চমক সৃষ্টির প্রবণতা এত প্রকাশ পাইয়াছে যে নাটকখানি মেলোড্রামার স্তর অতিক্রম করিতে পারে নাই। নাটকখানি বহু অভিনীত এবং হিন্দু-মুসলমানের সমবায়ে ভারতে নব জাতীয়তার উদ্বোধনের জন্য নাটকখানির প্রচার উল্লেখযোগ্য। (নাট্য সাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার ২য় খণ্ড দ্রষ্টব্য)

(১২) রঘুবীর (১৯৮৩) পঞ্চাঙ্ক বিয়োগান্ত কল্প-ঐতিহাসিক নাটক—একটা ঐতিহাসিক পরিস্থিতির আবরণ দিয়া অনৈতিহাসিক বিষয়কে নাটকে রূপদান করা হইয়াছে—এবং রূপও অতিনাটকীয় ঘটনা বিন্যাসে ও চরিত্র-আচরণে গভীর ও গম্ভীর জীবন-সমালোচনা হইতে পারে নাই।

রঘুবীর ভীলের কুমার—অনন্তরাও তাহাকে সন্তানস্নেহে ঋষিতুল্য করিয়া গড়িয়াছেন—'পুণ্যময় জ্যোতির্ম্ময় ব্রাহ্মণ জীবন' দান করিয়াছেন—'নিষ্কাম কামনা' শিখাইয়াছেন। ফলে ভীলের ভিত্তির উপর ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রাসাদ

গড়িয়া উঠিয়াছে রঘুবীর দ্বিজত্বে দ্বিজকেও হার মানাইয়া দিয়াছে। অনন্ত-রাওয়ের এবং জন্মভূমির দারুণ দুর্য্যোগও সে শাস্ত ও অহিংস থাকিতে সঙ্কল্পিত—অদৃষ্টের উপর অস্বাভাবিক অটুট আস্থা রাখিয়াছে। রঘুবীরের জীবনে দ্বন্দ্ব—

সদা ভয়—কখন কি করি। দস্যুগৃহে
জন্ম মোর—কঠোরতা—জীবনের বীজ
উপাদান। সদা ভয়—আপন হারায়ে
কবে কার সর্ব্বনাশ করি। জন্ম সঙ্গে
জন্মেছে যে নীচ নিষ্ঠুরতা—জন্ম সঙ্গে
পেয়েছি যে শোণিতের তৃষা—দ্বিজদত্ত
জ্ঞান-আচরণে অনাদরে এতকাল
অর্দ্ধমৃত পড়েছিল হৃদয়ের মাঝে।
কিন্তু হায়! মরণ তো হোলনা তাহার।

* * * *

হৃদয়ের নিভৃত গুহায়—নিদ্রালসা প্রতিহিংসা
প্রবৃত্তি আমার সেই মত্ত ভুলে বুঝি
বিষম ঝঙ্কার।

শেষ পর্য্যন্ত রক্তের উত্তাল তরঙ্গের আঘাতে নবজাত সংস্কার ভাসিয়া গিয়াছে—'রঘুবীর' 'রঘুয়া'য় পরিণত হইয়াছে।

নাটকখানি বহু অভিনীত। নাট্যাচার্য্য শিশির কুমার ভাদুড়ী মহাশয়ের অভিনয় প্রতিভার স্পর্শে 'রঘুবীর' দীর্ঘায়ুলাভ করিয়াছে।

(১৩) **বৃন্দাবন-বিলাস** (১৯০৭) গীতিনাট্য। প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণ জগতে প্রেমরাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য, ভাগ্যবান মানবের ঘরে ঘরে প্রেমভাব প্রকাশের জন্য……বালক মূর্তিতে গোকুলে যে লীলা করিয়াছিলেন সেই লীলা এইখানে উপস্থাপিত।

(১৪) **রত্নাবতী** (১৯০৪) ঐতিহাসিক-কল্প। ধর্মমাহাত্ম্য-মূলক

কাহিনী অবলম্বনে রচিত। অতিপ্রাকৃত-ঘটনার সংযোগে ধর্মের মাহাত্ম্য যতই বৃদ্ধি পা'ক, নাটকের প্রাণশক্তি কমিয়া গিয়াছে। উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত চরিত্র আছে যেমন একাধিক, তেমনি তাহাতে অবাস্তবতার দৈন্য ও আছে যথেষ্ট। নাটকখানি উচ্চাঙ্গের শিল্পকর্মের মর্যাদায় উন্নীত হইতে পারে নাই।

(১৫) উলূপী (১৯০৬) পঞ্চাঙ্ক পৌরাণিক নাটক। এই নাটকে "ত্রিলোক বিশ্রুতা ধর্মজ্ঞা।"—প্রধানা পতিব্রতা-"উলূপীর পতিভক্তিকে পুত্র-বাৎসল্যের প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে দাঁড় করাইয়া শেষ পর্যন্ত জয়ী করা হইয়াছে। উলূপী অর্জ্জুন-পত্নী—নাগরাজনন্দিনী—ইলাবন্তের জননী। স্বামীর কার্য্যহানি হওয়ার ভয়ে সে ভগবানের কাছে নিত্য প্রার্থনা করে স্বামী যাহাতে তাকে ভুলে যান। কিন্তু নারদ হাত দেখিয়া বলিয়াছেন—তার ভাগ্যে 'পুত্রশোক' আছে, আরো বলেন—'নাগনন্দিনি, তুমিই হবে স্বামীর মৃত্যুর কারণ।" নারদের-দেওয়া 'সঞ্জীবন-মণি' পিতার কাছে রাখিয়া উলূপী অদৃষ্টের গতিরোধ করিতে ছুটিয়া যায় এবং পুত্রকে বলিয়া যায়—'তোর পিতার চরণে আশ্রয় নে। যদি তোর পিতার কখনও জীবন যায়, সেই মণি দিয়ে প্রাণরক্ষা করিস। আমা হতেও যদি তোর পিতার মৃত্যুভয় অনুমান করিস, আমাকেও হত্যা করতে কুণ্ঠিত হ'স নি।' আত্মহত্যা মহাপাপ অথচ স্বামিঘাতিনী হওয়ার পরিণাম এড়ানোর উপায়ই বা কি? এই সময় গঙ্গা ভীষ্মকে বধ করিবার জন্য অর্জ্জুনকে অভিশাপ দেন—"সেই পাপে রৌরব নরকে হ'ক স্থান।" উলূপীর ঐকান্তিক পতিপরায়ণতায় মুগ্ধ হইয়া গঙ্গা অর্জ্জুনকে শাপমুক্ত করিবার উপায় জানাইয়া দেন—"পুত্রহস্তে যদি কখনও অর্জ্জুনের বিনাশ হয়, তবেই তার মুক্তি—মুক্তির অন্য উপায় নেই'—উলূপী স্বামিভক্তির প্রেরণাতেই স্বামি-বিনাশের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগেন—পুত্র বভ্রুবাহনের হস্তে অর্জ্জুনের বিনাশ ঘটাইবার জন্য······সব শক্তি নিয়োজিত করেন। এমন কি ইলাবন্তের মৃত্যু ঘটাইতেও ইতস্ততঃ করেন না। শেষ পর্যন্ত···সঞ্জীবন-মণি স্পর্শ করাইয়া

অর্জ্জুনের প্রাণ রক্ষা করেন—স্বামিভক্তির পরাকাষ্ঠা আদর্শ স্থাপন করেন। ইলাবন্তের মত দেশের জন্য ধর্মের জন্য আত্মবলি দেওয়ার উদার আহ্বানে নাটক শেষ হইয়াছে। নাটকখানির পরিণাম বিয়োগান্ত বা শুধু মিলনান্ত বলিলে যথেষ্ট বলা হয় না।

(১৬) শিরী-ফরিদ (১৯০৬) (নাটিকা)।

(১৭) পদ্মিনী (১৯০৬) পঞ্চাঙ্ক ঐতিহাসিক নাটক। চিতোরের রাণা লক্ষ্মণসিংহের খুল্লতাত ভীমসিংহের পত্নী—বীরাঙ্গনা পদ্মিনী সতীত্ব-রক্ষার জন্য ধর্মানলে আত্মাহুতি দিয়া ভারতের ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া আছেন; সেই ইতিহাস-বিখ্যাত বীরাঙ্গনার কাহিনী অবলম্বনে এই নাটক রচিত। দিল্লীর বাদশাহের বেগম নসীবনের উপকথা বুনিয়া নাট্যকার যে কাহিনী পরিকল্পনা করিয়াছেন, তাহাতে রোমান্সের কল্পনা-বিলাস এবং জটিল কাহিনী রচনার শক্তি যতই প্রকটিত হউক, উৎকটভাবে ইতিহাসের ভাবগাম্ভীর্য্যের হানি ঘটিয়াছে। তবু নাটকখানির ভাবগৌরব উল্লেখযোগ্য—হিন্দুভারতের দুর্ব্বলতার কারণ সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে—অনৈক্যই যে পরাধীনতার মূল কারণ 'সবারই কর্ত্তৃত্বাভিমান' যে একতা-সম্পাদনের পরিপন্থী, তাহা উচ্চ কণ্ঠেই ঘোষণা করা হইয়াছে—"এ পোড়া ভারতের ভাগ্যে এত যোল আনার বুদ্ধি একত্র হ'য়েছে যে সমধর্মী তড়িতের পরস্পর-বিরোধী শক্তির ন্যায় এরা কেউ কারো কাছে অবস্থিতি করতে পারে না।" গোরার মুখে ইঙ্গিতও দেওয়া হইয়াছে—আমরা হ'লে মাতৃদায়গ্রস্ত ভাগ্যহীনের মত তাদের দ্বারে দ্বারে গিয়ে গলায় বস্ত্র দিয়ে প্রীতি ভিক্ষা করতুম, আর সকলে মিলে এক জনকে কর্ত্তা করে' তার আদেশে অস্ত্র ধরে—পৃথ্বীরাজের হত্যার, সোমনাথ-বিগ্রহ নাশের, নগরকোট ধ্বংসের প্রতিশোধ নিতুম। বিধর্মীরা মিলতে চাইলে তাদের ভাইয়ের মত স্থান দিয়ে আপনার করে নিতুম।" রাজনীতিতে নীতির স্থান সম্পর্কেও আলোচনা করা হইয়াছে। যেখানে লক্ষ্মণসিংহের কাছে—'মাতৃভূমি রক্ষাই প্রত্যেক সন্তানের

একমাত্র উদ্দেশ্য, আর সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হ'লে যখন শাস্ত্রবিহিত অক্ষয় স্বর্গ পুরস্কার, তখন এরূপ মহৎকার্য্যের জন্য কূট-নীতি অবলম্বনে দোষ কি? পুরোহিত এবং ভীমসিংহ—নীতি-ধর্মকেই বড স্থান দিয়াছেন; নীতি-পথ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারা স্বর্গ-সুখ ও পাইতে চাহেন না। ভীমসিংহের দৃঢ় অভিমত—"ভারত-সন্তান নীতিবর্জ্জিত হ'লে স্থির জানবে, আর কখনও মাথা তুলতে পারবে না"। (মহাত্মা গান্ধী ভীমসিংহেরই অহিংস সংস্করণ) ধর্মগৌরবকেই ভারতবাসী বড গৌরব বলিয়া মনে করে। (আলাউদ্দিন চরিত্রটিকে দিগ্বিজয়ী নাটকের নাদিরশাহের পূর্ব্ব সংস্করণ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

(১৮) **পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত** (১৯০৭) ঐতিহাসিক নাটক

(১৯) **রক্ষঃ ও রমণী** (১৯০৭) তিনটি অঙ্কে এবং একটি ক্রোড় অঙ্কে নাটকখানি সমাপ্ত। কাল্পনিক প্রেমমূলক নাটক—রাক্ষস শৈলেশ্বরের প্রতি মানবী সর্ব্বানীর ভালবাসা—করুণার সেতুবন্ধে দুইটি হৃদয়ের মিলন—এই নাটকের উপস্থাপ্য। বিশেষ প্রচার্য্য—"করুণায় সংসারের শোভা—শান্তির অস্তিত্ব; জীব করুণা কর—করুণা কর"। নাটক হিসাবে উল্লেখযোগ্য কিছু নয়।

(২০) **চাঁদবিবি** (১৯০৭) পঞ্চাঙ্ক ঐতিহাসিক নাটক। বীরাঙ্গনা—চাঁদবিবির শৌর্য্যবীর্য্যময় জীবনের কাহিনী অবলম্বনে—রচিত বিষাদ-পরিণাম, রোমাণ্টিক-রীতিক নাটক। ঐতিহাসিক নাটকের উপযুক্ত বাস্তবিকতার আবহাওয়া কাহিনী-পরিকল্পনার দোষে অনেকটা লঘু হইয়া গিয়াছে, নিঃসন্দেহ; তবে এ নাটকেও ক্ষীরোদপ্রসাদ—"মাতৃমন্দিরে আত্মবলি'র প্রেরণা সঞ্চার করিতে চেষ্টা করিয়াছেন…'যে মরতে জানে তাকে মারে কে?"—এই উক্তির উত্তরে মল্লজীর উত্তর—যে মাতৃমন্দিরে আত্মবলি দিতে এসেছে সে নিজে না সরে গেলে তাকে দুনিয়া থেকে সরাবে কে? যে সয়তান সরাতে চাইবে সে মায়ের চারিধারে হাজার প্রাণের বেড়া সৃষ্টি করবে—দেশের জন্য প্রাণোৎসর্গ

করার উদাত্ত আহ্বান। চাঁদবিবির আহ্বান—(পঞ্চম অঙ্কের ৬ষ্ঠ দৃশ্যে) "কে কে আছ তরুতলবাসী চ'লে এস। জীবন তুচ্ছ ক'রে সম্ভোগ-সম্পদ তুচ্ছ করে—মান, যশ, নাম, গৌরব, জন্মভূমির পবিত্র ধূলিরাশির মধ্যে চিরদিবসের জন্ম আচ্ছাদিত করতে কে কোথায় আছ চলে আস"—পরাধীন ভারতবাসীকে উদ্বোধিত করারই আহ্বান।

(২১) **নন্দকুমার** (১৯০৮) মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসির ব্যাপার লইয়া রচিত ঐতিহাসিক নাটক। ইংরেজশাসনের সমালোচনা করা তথা দেশাত্মবোধ সঞ্চার করা নাটকখানির উদ্দেশ্য।

(২২) **দাদা ও দিদি** (১৯০৮) রঙ্গনাট্য।

(২৩) **অশোক** (১৯০৮) ঐতিহাসিক ব্যক্তি—ভারতের শ্রেষ্ঠ সম্রাট অশোকের জীবন-কাহিনী কেন্দ্র করিয়া এই নাটক রচিত। ইতিহাস কিংবদন্তী এবং অতিপ্রাকৃত ঘটনার সংযোগে নাটকখানি গঠিত। কেবল গল্পরসের দিকেই অধিক জোর দেওয়া হইয়াছে বলিয়া নাটকখানি চরিত্র-সৃষ্টির এবং ভাবের দিক দিয়া তেমন গভীর হইয়া উঠে নাই।

(২৪) **বাসন্তী** (১৯০৮) প্রাস্তবনা-সহ একটিমাত্র অঙ্কে (৮ম দৃশ্য-যুক্ত) কাল্পনিক গীতিনাট্যখানি সমাপ্ত। "নিদাঘ-নিশীথের স্বপ্ন"-রাজ্য (মিড্ সামার নাইটস্ ড্রিম')—একদিকে কৃপণবৃদ্ধের বিবাহবাতিক—অন্যপক্ষে যুবক-যুবতীর হৃদয় ও কর্ত্তব্যবোধের দ্বন্দ্ব—সমাবেশে প্রহসনাত্মক গীতিনাট্য॥

(২৫) **বরুণা** (১৯০৮) তিনাঙ্ক গীতিনাট্য—রোমান্স-সুলভ কল্পলোকের জীবন—কিরাতপালিতা রাজনন্দিনী বরুণার সহিত কঙ্কণরাজপুত্র পুণ্ডরীকের প্রেম ও বিবাহ রূপায়িত।

(২৬) **ভূতের বেগার** (১৯০৮) দুই-অঙ্কের রঙ্গনাট্য। চাকরীমোহ ও সহুরেপণা লইয়া রঙ্গ-ব্যঙ্গ। আসল বক্তব্য :—ভাই সব, যাদের দেশ আছে, যাদের চাকরী থাকা না থাকা উভয়ই তুল্য, তারা দেশে যাও। মান অভিমান বিসর্জ্জন দিয়ে তগদেহে নগ্নপদে মা বসুমতীর সেবা কর—মা ভারে ভারে

ধনধান্যের ডালা নিয়ে তোমাদের তৃপ্তিসাধন করবেন।

(২৭) **দৌলতে দুনিয়া** (১৯০৯) চতুরঙ্ক নাটক। (সপ্তমপ্রতিমারই সংস্করণ-বিশেষ) উপকথা-মূলক কাল্পনিক রোমান্টিক কমেডি।

(২৮) **বাঙ্গালার মসনদ** (১৯১০) পঞ্চাঙ্ক ঐতিহাসিক নাটক—বিশ্বাস-ঘাতকতা করিয়া, সরফরাজকে হত্যা করিয়া আলিবর্দ্দী বাংলার মসনদ অধিকার করেন—এই ঐতিহাসিক ঘটনাই রোমান্টিক রীতিতে উপস্থাপিত হইয়াছে। নাটকখানি বিষাদান্ত বটে কিন্তু ট্র্যাজেডীর মর্য্যাদায় উন্নীত হয় নাই।

(২৯) **পলিন** (২ মার্চ্চ, ১৯১১)—তুরস্কের সুলতান 'আলমামুনে'র কাহিনী অবলম্বনে—রচিত তিনাঙ্ক কমেডি। উৎকল্পনার আতিশয্যে কাহিনীটি রূপকথায় পরিণত হইয়াছে। গর্ভাবস্থায়-পরিত্যক্তা আলমামুনের প্রথমা পত্নীর গর্ভে পলিনের জন্ম—সিস্তানের রাণী আইরিন-কর্ত্তৃক পলিন পুরুষবেশে পালিত—নিরুদ্দেশ পত্নীর জন্য সম্রাট আলমামুনের ব্যাকুল অনুসন্ধান—শেষ পর্য্যন্ত আলমামুনের কন্যা রেবেকা পুরুষবেশী পলিনের রূপে পাগলিনী—আলমামুনের মহাসমস্যা (৩০) উপসংহারে আলমামুনের সমস্ত সমস্যার সমাধান।

মিডিয়া (১৪ই জুলাই, ১৯১২) কল্পনামূলক তিনাঙ্ক কমেডি। ইজিয়াসের কন্যা মিডিয়া। আলমনসুর ইজিয়াসের রাজ্য অধিকার করিলে ইজিয়াস বনে বাস করেন এবং মরণের সময় কন্যাকে বলিয়া যান—'আমার গুরু ছাড়া আর কারো আশ্রয় গ্রহণ ক'রো না।" গুরু জিবার—জ্ঞানীর শিরোমণি—মিডিয়ার কাছে উপস্থিত হন—পরিচয়ও দেন এবং ইজিয়াসের মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণের সঙ্কল্প করেন তথা বিজ্ঞানবল ও পাশব বলের প্রভেদ দেখাইবার সঙ্কল্প করেন। প্রকৃতির পরিহাসে—মিডিয়া অজ্ঞাতসারে সেই আলমনসুরকেই প্রাণ দিয়া বসেন যাহার প্রাণ লইবার জন্য তাহার ঐকান্তিক সঙ্কল্প ছিল। শেষ পর্য্যন্ত প্রেম জয়ী হয়। জিবারও জড়প্রকৃতির প্রতি পরমাণুর অন্তরালে চৈতন্যময়ীর লীলা দেখেন। প্রেমের কাছে শক্তির পরাজয় ঘটে। জিবারের শেষ প্রার্থনা—জাগো মা চৈতন্যরূপিণী—জড়বিজ্ঞানের সিংহাসনে

অধিষ্ঠিত হয়ে সমস্ত সংসারে প্রাণময়ী শক্তির প্রতিষ্ঠা করে।

(—বিজ্ঞান ও ধর্ম্মের দ্বন্দ্বে নাট্যকারের নিজেরই সিদ্ধান্ত।)

(৩১) **খাঁজাহান** (২৫শে জুলাই, ১৯১২) ঐতিহাসিক নাটক—দিল্লীর সম্রাট সাজাহান এবং মালবের সুবেদার খাঁজাহানলোদীর বিবাদ—খাঁজাহানের পরাজয় ও শোচনীয় পরিণতি নাটকের মুখ্য উপস্থাপ্য; গৌণ উপস্থাপ্য—মহাবৎ-কন্যা 'সোফিয়া' ও নারায়ণ রাও-এর প্রণয় কাহিনী; অর্থাৎ ইতিহাস ও রোমান্স (প্রহেলিকাময়) সংযোগে রোমান্টিক নাটকখানি পরিকল্পিত। সোফিয়া ও নারায়ণরাও-এর চিতাশয্যায় ফুলশয্যা-শয়নে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে মিলন-কামনা ব্যক্ত হইয়াছে।

(৩২) **ভীষ্ম** (১৯১৩) পঞ্চাঙ্ক—(প্রস্তাবনা ১+৩+৭+৫+৫+৭ পট-পরিবর্ত্তন মোট ৩০ দৃশ্য) পৌরাণিক নাটক। জন্মের পূর্ব্ব হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত—ভীষ্মের বিরাট জীবনের নাট্যরূপ। নারী-চরিত্রের মধ্যে 'অম্বা'র এবং পুরুষ চরিত্রের মধ্যে ভীষ্মের চরিত্রের দ্বন্দ্ব চিত্তাকর্ষক। ভীষ্মের মত বীরের পতনে শোচনীয় পতনের তথা ট্র্যাজেডির লক্ষণ প্রকাশ পাইলেও, কৃষ্ণভক্তি-রসে সমস্ত বিষাদ-বেদনা নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছে।

(৩৩) **রূপের ডালি** (১৯১৩) ২৩শে অক্টোবর) তিনাঙ্ক রঙ্গনাট্য—বোখারার নবাব প্রভৃতি পাত্র-পাত্রীর পরিকল্পনায়—"আগাগোড়া···ফাঁকির গান"—রোমান্সময় রঙ্গনাট্য।

(৩৪) **নিয়তি** (১৯১৪, ৯ এপ্রিল) তিনাঙ্ক উপকথা-মূলক বা কল্প ঐতিহাসিক নাটিকা। কৌশাম্বীরাজ উদয়নকে কেন্দ্রে স্থাপন করিয়া কয়েকটি কল্পিত পরিস্থিতির সাহায্যে **জীবনে নিয়তির প্রভাব** প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। ভাড়ুদত্ত লোভবশে নিজের জীবনে শোচনীয় পরিণতি ঘটাইয়াছে—ভাড়ুদত্তের পত্নী মাগন্ধী লেডী ম্যাকবেথের মতই কার্য্য করিয়াছে···লেডী ম্যাকবেথের মতই হাতের রক্তের দাগ তুলিতে না পারিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। পালিত-পুত্র ঘোষককে মারিতে গিয়া ভাড়ুদত্ত—উদয়নের কথায় বলা যাউক—"পুত্রকে

মেরেছ, তার জন্য স্ত্রীকে মেরেছ, ভাগিনেয়কে, ভাগনীকে···নিজের কুল নির্মূল করেছ।” নাটকখানি অবশ্য ট্র্যাজেডি পরিণাম হয় নাই; ঘোষক ও শ্যামাবতীর মিলনে ও উৎসবে নাটিকা শেষ হইয়াছে। * ঘটনা-বিন্যাসের তথা পরিস্থিতি-কল্পনার দুর্ব্বলতায় বা অনৌচিত্যের জন্য ক্ষীরোদপ্রসাদের গুরুত্বপূর্ণ সৃষ্টি ও লঘু হইয়া পড়ে।

(৩৫) **আহেরিয়া** (২০শে জানুয়ারী, ১৯১৫) ‘ঐতিহাসিক নাটক না বলিয়া ঐতিহাসিক-কল্প বা ইতিহাস-বলয়িত রোমাণ্টিক নাটক (পঞ্চাঙ্ক)। আহেরিয়া-উৎসব-উপলক্ষে পরস্পর-বিরোধী দুই পক্ষের—(বারাহা-লাঙ্গাই এবং ভট্টি বংশের) তীব্র দ্বন্দ্বের মধ্যে—বারাহাপতি মুলরাজের-অধীশ্বর মুলরাজের কন্যা কেতু ভট্টিবংশ জাত তনোটেশ্বর তন্তুবায়-পুত্র দেবরায়ের বীরত্বে মুগ্ধ হয় এবং তাহাকে হৃদয়-মন সমর্পণ করিয়া বসে। উভয়ের মিলনের পথে অন্তরায় দাঁড়ায়—দেবরায়ের মাতার প্রতিশোধ-কামনা—কেতুর প্রতি নির্দ্দেশ—“তোমার শ্বশুরহন্তার মুণ্ড আমাকে উপহার প্রদান কর।” কেতু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়—ক্ষত্রিয়নন্দিনীত্ব প্রতিষ্ঠিত করে—মুলরাজের মুণ্ড লইয়া কমলার কাছে উপস্থিত হয়। নাটকখানির প্রাণশক্তি উল্লেখযোগ্য।

(৩৬) **বাদশা জাদী** (৩১শে ডিসেম্বর, ১৯১৫) কল্পনামূলক নাটক।

*(৩৭) **রামানুজ** (৩০শে জুলাই, ১৯১৬) পঞ্চাঙ্ক (দৃশ্য সংখ্যা—প্রস্তাবনা +৩+৭+৬+৮+১০=৩৫)—ধর্ম্মমূলক চরিত নাটক—(নামে চরিত নাটক স্বরূপতঃ অতিপৌরাণিক অর্থাৎ অতিপ্রাকৃত ঘটনাপূর্ণ নাটক। কোন চরিত্রই ঔচিত্যের গণ্ডীর মধ্যে নাই। না জীবনের রূপ ও দ্বন্দ্ব, না তত্ত্বালোচনা—কোনটিই উল্লেখযোগ্য হয় নাই।

(৩৮) **বঙ্গে রাঠোর** (৮ সেপ্টেম্বর, ১৯১৭) পঞ্চাঙ্ক, “ঐতিহাসিক নাটক” নামে পরিচিত ইতিহাস-পটভূমিক কাল্পনিক, রোমাণ্টিক এবং বিবাদান্ত নাটক। হিন্দু বীর “রঞ্জলালে”র প্রতি পাঠান উজীর সুলেমানের কন্যা কলিবেগমের

অনুরাগ এবং উভয়ের প্রাণ দেওয়া-নেওয়ার কাহিনী রূপায়িত। নাট্যে রোমান্স বলিলেই এই জাতীয় নাটকের স্বরূপ ভাল ব্যাখ্যা করা হয়।

(৩৯) **কিন্নরী** (১৭ই আগষ্ট, ১৯১৮) তিনাঙ্ক গীতি-নাট্য। কিন্নর রাজকন্যা ভদ্রা (কিন্নরী), বিন্ধ্যরাজপুত্র সুধন (মানুষ)—এই উভয়ের প্রণয়-কথা লইয়া এই নাটকের কাহিনী কল্পিত। সুধন অদ্ভুত করুণাময়—করুণাবতার শাক্যসিংহের পূর্ব রূপ, আর কিন্নরী—শাক্যসিংহের প্রিয়তমা মহিষী গোপা। প্রেমের কাহিনীর মাধ্যমে করুণা-তত্ত্ব প্রচার এই নাটকখানির অন্যতম উদ্দেশ্য।

(৪০) **মন্দাকিনী** (১৪ই এপ্রিল, ১৯২১) তিনাঙ্ক পৌরাণিক নাটক—গঙ্গা-শান্তনুর পরিণয় কাহিনী অবলম্বনে রচিত। (অভিশপ্ত অষ্টবসুকে গর্ভে ধারণ করিয়া মুক্তি দেওয়ার জন্য গঙ্গা শান্তনুর পত্নীত্ব স্বীকার করেন…ভীষ্ম অষ্টম বসুর মর্ত্ত্য দেহ)

*(৪১) **আলমগীর** (৯ ডিসেম্বর, ১৯২২) পঞ্চাঙ্ক ঐতিহাসিক নাটক নাটকখানিতে ঔরংজীবের, ১৬৭৮ খ্রীঃ হইতে ১৬৮০ খ্রীঃ পর্য্যন্ত—এই দুই বৎসরের রাজনৈতিক জীবনকে ভিত্তিরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। ইহার উপর রূপকুমারী কাহিনী, ভীমসিংহ জয়সিংহ-কাহিনী এবং উদিপুরী কাহিনী মিশাইয়া নাট্যকাহিনীর কাঠামো গঠন করা হইয়াছে। কেন্দ্রীয় চরিত্র আলমগীর এখানে নিম্নলিখিত দ্বন্দ্বের সম্মুখীন :—

(১) পারিবারিক দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে প্রতিযোগী—তাঁহারাই মোহিনী প্রেয়সী উদিপুরী (২) রাজনৈতিকক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী—রাজপুত-গৌরব মহারাণা রাজসিংহ (৩) অন্তরের ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নিযুক্ত আলমগীর সত্তা এবং ভিতরকার মানব-সত্তা (দেবদূত)। সমস্ত ক্ষেত্রেই আলমগীর পর্য্যুদস্ত হওয়া সত্ত্বেও নাট্যকার আলমগীরকে "অপরাজেয়" রূপে দাঁড় করাইতে চাহিয়াছেন। এই দিক দিয়া নাটকখানি ট্র্যাজি-কমেডির পরিণতি লাভ করিয়াছে। কল্পনাতিরেক এবং গঠনগত দোষ ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও নাটকখানির মঞ্চ সাফল্য উল্লেখযোগ্য।

বিশেষতঃ নাট্যাচার্য্য শ্রীশিশিকুমার ভাদুড়ী মহাশয়ের অভিনয় নাটকখানির খ্যাতি সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়াছে।

(৪২) রত্নেশ্বরের মন্দিরে (২৮ ডিসেম্বর, ১৯২২) তিনাঙ্ক সামাজিক-কল্প নাটক। শিবরাত্রির পটভূমিতে বীর নগরের জমিদার পুত্র বীর "রত্নেশ্বর" এবং রায় নগরের ভূম্যধিকারী রাজা কৃত্তিবাসের ভগিনীপতি মথুর মোহনের কন্যা —"সুরমা"র রোমাণ্টিক প্রেম কাহিনী ও মিলন—তৎসহ—(১) ইংরেজী শিক্ষিত মেয়েলি স্বভাব পুরুষ 'রমণীচরণ ধলে'র—এবং 'কাপুড়ে সভ্যতা'র সমালোচনা। (২) মন্দির প্রবেশে জাতি ভেদ কুসংস্কারের নিন্দা—"যদি জাত হিসাব করে মন্দিরে ঢুকতে হয়, তা হ'লে বুঝবো, হয় সে জড়ের জড় পাথর, নয় সে ধনীর খোসামদ করা দেবতা।"

(৪৩) বিদূরথ (১০ মার্চ্চ, ১৯২৩) পঞ্চাঙ্ক বৌদ্ধমাহাত্ম্য-মূলক নাটক—যদিও নাট্যকার লিখিয়াছেন—"বুদ্ধের উপাখ্যানে নাগপতি কন্যা চিত্রা ও বিদূরথের কাহিনী পালি গ্রন্থে পাওয়া যায়। সেই উপাখ্যানের ঐতিহাসিক অংশের উপর ভিত্তি করিয়া এই নাটক রচিত হইল"—তবু ইহাকে প্রকৃতপক্ষে ঐতিহাসিক নাটক বলা চলে না, বরং এই কথাই বলা চলে যে সমগ্র নাটকের মধ্যে একটা পৌরাণিকনাটক-সুলভ অতিপ্রাকৃত আবহাওয়া বর্ত্তমান।

(৪৪) গোলকুণ্ডা (২০ সেপ্টেম্বর, ১৯২৫) ইতিহাসের মলাটের মধ্যে প্রেমের উপাখ্যান—ঔরংজীবের গোলকুণ্ডা জয়ের—ঐতিহাসিক ঘটনার ভিত্তির উপর, ঔরংজীব পুত্র মহম্মদের সহিত গোলকুণ্ডার সুলতান কুতবসা'র জ্যেষ্ঠা কন্যা মণিজার বিবাহের কাহিনী—শেষদিকে, অস্ত্রবল এবং অহিংসা ও সত্যবলের দ্বন্দ্বে সত্যের জয় ঘোষণা করা হইয়াছে—ঔরংজীব স্বীকার করিয়াছেন—"ছলনায় নির্মিত অস্ত্র দিয়ে সত্যকে ধ্বংস করা যায় না।"

(৪৫) জয়শ্রী (২০ ডিসেম্বর, ১৯২৬) তিনাঙ্ক উপকথা-মূলক (উদয়ন-কথা বিষয়ক) নাটক। অবন্তীর-রাজা চণ্ডদেবের কন্যা "জয়শ্রী" এবং কৌশাম্বী-রাজা উদয়নের প্রেম কাহিনী নাটকে উপস্থাপিত—তৎসহ স্থাপিত এই তত্ত্বটুকু—

"মানুষী শক্তি দৈবশক্তি অপেক্ষা হীন নয়; বরং অনেক সময়ে শ্রেষ্ঠ। সেই শ্রেষ্ঠ শক্তির নাম সত্য"; সত্যের চেয়ে বড় অস্ত্র আর কিছুই নাই॥

(৪৬) **রাধা-কৃষ্ণ** (১৯২৬) পঞ্চাঙ্ক পৌরাণিক গীতি-নাট্য। রাধাকৃষ্ণের লীলা (আদ্য হইতে অন্ত্য পর্য্যন্ত) রূপকায়িত।

*(৪৭) **নর-নারায়ণ** (অগ্রহায়ণ ১৩৩৩, ইং ১৯২৬) পৌরাণিক নাটক। (অভিনীত—১লা ডিসেম্বর ১৯২৬) নিয়তি-বিড়ম্বিত পুরুষকার অবতার কর্ণের জীবনের নাট্য রূপ—কর্ণের জীবনের মাধ্যমে **শ্রীকৃষ্ণের নারায়ণত্ব প্রতিষ্ঠা** এই নাটকের অন্যতম উদ্দেশ্য।

নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ রচিত উল্লিখিত নাটক-নাটিকাসমূহ (৪৭ খানি সম্মুখে রাখিয়া, এ কথা অবশ্যই বলা যায় যে—নাট্যকারের দানের পরিমাণ যথেষ্ট প্রচুর। তবে দানের **গুণগত মহিমার** হিসাব করিতে গিয়া, প্রথমেই যাহা মনে আসে তাহা এই যে সাতচল্লিশখানি নাটক-নাটিকার মধ্যে, চিত্তাকর্ষক বা উল্লেখযোগ্য সৃষ্টির সংখ্যা খুবই কম—আলিবাবা (রঙ্গনাট্য) বঙ্গের প্রতাপ আদিত্য (ঐতিহাসিক), রঘুবীর (কল্প-ঐতিহাসিক) ভীষ্ম (পৌরাণিক) আলমগীর (ঐতিহাসিক) এবং নরনারায়ণ (পৌরাণিক)—এই কয়েকখানি ছাড়া অন্যগুলির জীবনীশক্তি এত ক্ষীণ যে ইতিমধ্যেই বিস্মৃত হইতে চলিয়াছে। ইহাদের মধ্যেও, বহু অভিনীত প্রতাপআদিত্য আলমগীর এবং রঘুবীর। (নাট্যাচার্য্য শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী মহাশয়ের অমর অভিনয় প্রতিভার স্পর্শে আলমগীর ও রঘুবীর সঞ্জীবিত)

এইরূপ হইবার প্রধান কারণ এই যে নাট্যকারে রোমান্স-রহস্য সৃষ্টির প্রবণতা খুব বেশী। এই কারণে কাহিনী-কল্পনা ও চরিত্র সৃষ্টিতে, বাস্তবতার পরিবর্ত্তে, অতিকল্পনা ও উৎকল্পনার মাত্রা এত বেশি পরিমাণে মিশিয়া গিয়াছে, যে সৃষ্টিগুলি মহৎ বা বৃহৎ শিল্পের পর্য্যায়ে পৌঁছিতে পারে নাই। উপকথাশ্রয়ী-কাহিনীর কথা ছাড়িয়াই দেওয়া যাউক। 'ঐতিহাসিক' নাটক নামে চিহ্নিত নাটকগুলিও রোমান্স-সুলভ চমকপ্রদ ঘটনা ও চরিত্র-কল্পনা হইতে মুক্ত হইতে

পারে নাই। ফলে, ঐতিহাসিক নাটকের পক্ষে যে বাস্তবতার গুরুত্ব ও গাম্ভীর্য্য অপরিহার্য্য, তাহার অভাবে নাটকগুলি রোমান্স-জাতীয় রচনায় পরিণত হইয়া গিয়াছে। নাট্যকার জীবনের যে মাধ্যমে 'জীবন-সমালোচনা' করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা জীবনের ঐতিহাসিক, পৌরাণিক এবং কাল্পনিক রূপ। (সামাজিক নাটক তিনি লেখেন নাই) কাল্পনিক-কল্প কাহিনীর সাহায্যে এবং অবাস্তবকল্প চরিত্রের মাধ্যমে যে-সকল গুরুভাব তিনি পরিবেষণ করিতে চাহিয়াছেন, বাহনের লঘুত্বে সেইসব ভাব-সঞ্চারের গুরুত্ব অনেক কমিয়া গিয়াছে।

ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটকে জীবনের রূপ আছে, জীবন-সমালোচনা আছে, এবং ইতস্ততঃ বড় বড় তত্ত্বের প্রচারও আছে কিন্তু নাই ঘটনা চরিত্র ভাব ভাবনা প্রভৃতি উপাদানের মাত্রাসমতা-জনিত সেই সর্ব্বাবয়বব্যাপী মহাসঙ্গতি বাস্তবিকতার মায়াঘোর—যে মায়াঘোর সৃষ্টির গুরত্ব ও গাম্ভীর্য্যের জন্য একান্ত-ভাবেই অপেক্ষিত। এমন কি ক্ষীরোদপ্রসাদের সর্বপ্রশংসিত 'আলমগীর'—নাটকেও, উল্লিখিত সঙ্গতি বহুস্থলে ব্যাহত হইয়াছে। এই জাতীয় ব্যাঘাতের ফলে সাধারনীকৃতির মাত্রা তথা রসনিষ্পত্তির মাত্রাও কমিয়া যাইতে বাধ্য। 'কাহিনী-রস' অর্থাৎ ঘটনা-কৌতূহলের প্রতি অধিক মাত্রায় ঝোক থাকায়, ক্ষীরোদপ্রসাদের কাহিনী-কল্পনা রোমাঞ্চ-সুলভ হইয়াছে।

তারপর চরিত্র সৃষ্টির কথা। ৪৭ খানি নাটকে বহুরসের বহু পাত্র-পাত্রী আছে বটে, 'চরিত্র সৃষ্টি' বলিতে বিশেষভাবে যে বাস্তবকল্প রূপাদর্শ-রচনা বুঝায়—কায়মনোবাক্যের আচরণের মধ্য দিয়া জীবনের যে রূপ অভিব্যক্ত হয় সেই রূপটিকে যথাযথভাবে ব্যক্তি-দর্পনে প্রতিফলিত করা বুঝায়, সেইরূপ 'চরিত্র-সৃষ্টি' ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটকে খুব বেশী নাই। বাহ্য-আবেষ্টনীর সহিত দ্বন্দ্ব—ইংরাজীতে যাহাকে 'physical Conflict' বলা হয়, তাহা আছে,—কারণ তাহা না থাকিলেই নয়, কিন্তু গভীর ও তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্ব—খুব কম চরিত্রেই আছে। ভীষ্মে 'ভীষ্ম' নরনারায়ণে 'কর্ণ', রঘুবীরে 'রঘুবীর', আলমগীরে 'আলমগীর' এইরূপ কয়েকটি চরিত্র ছাড়া অন্তর্দ্বন্দ্ব-গভীর চরিত্র

নাই বলিলেও চলে; আর যদিও বা দু'একটি চরিত্রে, যেমন আহেরিয়ার 'কেতু'তে, মিডিয়ার 'মিডিয়া' তে,—দ্বন্দ্বের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায় সেখানে কাল্পনিকতার সংস্পর্শে দ্বন্দ্বের তীব্রতা শিথিল হইয়া গিয়াছে; দ্বন্দ্ব চিত্তকে আকর্ষণ করিতে পারে না। রঘুবীর চরিত্রে রক্তের সংস্কারের সঙ্গে শিক্ষাদীক্ষার সংস্কারের দ্বন্দ্ব পরিকল্পিত, আলমগীর চরিত্রে অবচেতন ও চেতন মনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় জটিল ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্ব উপস্থাপিত হইয়াছে; ভীষ্মের চরিত্রেও প্রাক্তন বা নির্জ্ঞানের সহিত সংজ্ঞান মনের দ্বন্দ্বের রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে; কর্ণের চরিত্রে ধর্মবোধ ও হৃদয়ধর্মের দ্বন্দ্বের রূপ অভিব্যক্ত করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে। উল্লিখিত চরিত্রগুলি চরিত্র সৃষ্টি নৈপুণ্যের বিচারে প্রতিনিধিস্থানীয় এবং বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ক্ষীরোদ প্রসাদের বাকশক্তির দৈন্য তেমন নাই। সঙ্গে আছে কবিত্বমোহ সুতরাং কবিত্ব প্রকাশের সুযোগ তিনি একটাও হারান নাই। বরং অনেক-স্থলে কবিত্বের আতিশয্য মাত্রাবোধের দৈন্যই সূচিত করিয়াছে। রচনা-শক্তির দৃষ্টান্ত তুলিয়া দেওয়ার অবকাশ এখানে নাই। (নাটক-সমূহ দ্রষ্টব্য)

এইসব দোষ সত্ত্বেও, ক্ষীরোদ প্রসাদের নাটক—মূল্যবান ভাবসম্পদ দেশ-বাসীর মনের ঘরে পৌছাইয়া দিয়াছে। দেশপ্রেম জাগ্রত করিয়া, দেশোদ্ধার করিবার প্রেরণা যোগাইয়া, সত্য-প্রেম—করুণা ধর্মকে পশুবলের উপরে স্থান করিয়া দিয়া এবং মনুষ্যত্বের মহিমাকে সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণ গণ্ডীর উর্দ্ধে তুলিয়া ধরিয়া নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটকরাজি, জাতীয় জীবনের অগ্রগতিকে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছে। রূপের ও রসের গৌরব কম থাকিলেও, ক্ষীরোদপ্রসাদের রচনায় ভাব-গৌরব প্রশংসনীয়।

কর্ণের কাহিনী

ব্যাসকৃত মহাভারতে কর্ণ

আদিপর্ব্বে:—১১১ অধ্যায় (কুন্তীচরিত, কৌমার্য্যাবস্থায় কর্ণোৎপত্তি)
১৩২ „ (দ্রোণসমীপে পাণ্ডব ও ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগের অস্ত্রশিক্ষা)
১৩৬ „ (রঙ্গভূমিতে কর্ণের প্রবেশ)
১৩৭ „ (অঙ্গরাজ্যে অভিষেক)
১৮৭ „ (দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর)
১৯০ „ (অর্জ্জুনের সহিত কর্ণের যুদ্ধ)

সভাপর্ব্বে:— ৩৩ অধ্যায় (রাজসূয়যজ্ঞে কর্ণের নিমন্ত্রণ)
৬৩ „ (দ্যূতক্রীড়া)
৬৬ „ (বিকর্ণের প্রতিবাদে কর্ণের প্রতিক্রিয়া)
৬৯ „ (দ্রৌপদীর প্রতি শ্লেষোক্তি)
৭০ „ (পাণ্ডবগণের প্রতি শ্লেষোক্তি)

বনপর্ব্বে:— ১৪৬ „ (ঘোষযাত্রা পর্ব্বাধ্যায়ে)
১৪৮ „ („)
১৪৯ „ („)
২৫২ „ (কর্ণের দিগ্বিজয়)
*২৯৯ „ (কুণ্ডলাহরণ পর্ব্বাধ্যায়)

বিরাটপর্ব্বে:— ২৬ অধ্যায় (কর্ণের মন্ত্রণা)
৩০ „ („)
৩৯ „ (গোহরণ পর্ব্বাধ্যায়)
৪৮ „ (কর্ণের আত্মশ্লাঘা)
৫৪ „ (অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধে কর্ণের পলায়ন)
৫৯ „ (পুনর্ব্বার যুদ্ধ)
৬০ „ (কর্ণের পলায়ন)

উদ্যোগপর্বেঃ—৬১ অধ্যায় (যানসন্ধি পর্ব্বাধ্যায়)

* [ভগবদ্‌যান পর্ব্বাধ্যায়—৭২—১৪৯]

১৪০ অধ্যায়—ভগবদ্‌যান পর্ব্বাধ্যায়

(কর্ণ-কৃষ্ণ)

১৪৩ অধ্যায়
১৪৪ „ } (কর্ণ-কুন্তী)

ভীষ্মপর্বেঃ— ১২৪ অধ্যায়— (ভীষ্ম-কর্ণ সাক্ষাৎকার)

দ্রোণপর্বেঃ— ২য় অধ্যায় (কর্ণ-নির্যান)

৪০ „
৫১ „ } (অভিমন্যুর সহিত যুদ্ধ)

৪৭ „
৪৮ „ } (অভিমন্যু-বধ)

১৩২
১৩৩
১৩৫
১৩৯ } (ভীম-কর্ণ)

১৪৫ অধ্যায় (জয়দ্রথবধের আগে দুর্য্যোধন-কর্ণ)

১৫২ „ („)

১৫৮ „ (ঘটোৎকচ-বধ)

১৫৯ „ (কর্ণ-কৃপ-অশ্বত্থামা)

কর্ণপর্বেঃ— ২২ অধ্যায়

৩২ „ (শল্যের সারথ্য)

৩৭ „ (কর্ণ-শল্য)

৪০-৪৭ ,,
৮১ ,,
৯১ ,,
৯২—(কর্ণবধ)
৯৭—

স্ত্রীপর্ব্বে—২৭ অধ্যায়—কুন্তীকর্ত্তৃক কর্ণের জন্মবৃত্তান্ত কথন)

শান্তিপর্ব্বে:—(১-৭) অধ্যায়
- নারদের নিকট যুধিষ্ঠিরের কর্ণের জন্মবৃত্তান্ত শ্রবণ
- কর্ণের জীবনে অভিশাপ
- কর্ণের অস্ত্র প্রাপ্তি
- কর্ণের পরাক্রম প্রকাশ

সংক্ষিপ্ত পরিচয়

কর্ণের জন্ম
আদি বনপর্ব্ব—১১১
উদ্যোগ—১৪০
স্ত্রীপর্ব্বে—১৪৩
শান্তি—১০

যদুবংশাবতংস শূরের কন্যা পৃথা। পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা অনুসারে শূর নিঃসন্তান পিতৃষ্বসৃপুত্র কুন্তিভোজকে প্রথম সন্তান পৃথাকে দান করেন। কুন্তিভোজপালিতা পৃথার নাম হয়—'কুন্তী'। মহর্ষি দুর্ব্বাসা একদিন কুন্তিভোজের গৃহে আতিথ্য স্বীকার করেন, কুন্তী পরিচর্য্যা দ্বারা দুর্ব্বাসাকে তুষ্ট করেন এবং তুষ্ট হইয়া দুর্ব্বাসা কুন্তীকে একটি মহামন্ত্র দেন—'এই মন্ত্র পাঠ করিয়া যে যে দেবতাকে আহ্বান করিবে, তাঁহাদের প্রভাববলে তোমার গর্ভে এক পুত্র হইবে'। বালিকা কুন্তী কৌতূহল বশে সূর্য্যকে আহ্বান করেন। "সূর্য্যদেবের সহযোগে কুন্তী গর্ভবতী হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা কবচ কুণ্ডলধারী……এক পুত্র সন্তান প্রসব করিলেন,…ভগবান সূর্য্যদেব তুষ্ট হইয়া পুনর্ব্বার কুন্তীকে কন্যাত্ব প্রদান করিয়া অম্বরতলে আরোহণ করিলেন।' কুন্তী কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া, লজ্জাভয়ে সদ্যোজাত শিশুকে জলে নিক্ষেপ

করেন। রাধাভর্ত্তা অধিরথ ভাসমান শিশুকে তুলিয়া লইয়া গৃহে আনয়ন করেন এবং নামকরণ করেন—"বসুষেণ।" [বনপর্ব্বের বিবরণ:—

কুন্তী ধাত্রীর সহিত মন্ত্রনা করিয়া মধুচ্ছিষ্টবিলিপ্ত অতি বিস্তীর্ণ ও আচ্ছাদনসম্পন্ন এক মঞ্জুষামধ্যে সেই পুত্রকে স্থাপন পূর্ব্বক রোদন করিতে করিতে 'অশ্বনদীতে নিক্ষেপ করিলেন এবং কন্যাকালে গর্ভধারণ অতিগর্হিত কর্ম্ম জানিয়াও পুত্রস্নেহে নিতান্ত কাতর.........এদিকে মঞ্জুষা অশ্ব নদী.... হইতে স্বর্ম্মন্বতী স্রোতস্বতীতে উপস্থিত হইল; পরে যমুনা ও যমুনা হইতে ভাগিরথীতে গমন করিল...]

অস্ত্রশিক্ষা "কর্ণ বাল্যকালে সূতপুত্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া মহাত্মা দ্রোণের নিকট ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করেন।" "ঐ মহাবীর, ভীমসেন ও অর্জ্জুনের পরাক্রম (তোমার) বুদ্ধি, নকুল ও সহদেবের বিনয়, বাসুদেবের সহিত ধনঞ্জয়ের সখ্যভাব এবং তোমাদিগের প্রতি প্রজাগণের অনুরাগ চিন্তা করিয়া নিরন্তর মনে মনে দগ্ধ হইতেন এবং সেই নিমিত্তই বাল্যকালে রাজা দুর্য্যোধনের সহিত সৌহার্দ্দ সংস্থাপন করিয়াছিলেন" (ভীষ্মের উক্তি)। মহাবীর ধনঞ্জয়কে ধনুর্ব্বেদে অপেক্ষাকৃত নিপুণ নিরীক্ষণ করিয়া একদা নির্জ্জনে দ্রোণাচার্য্যের নিকট গমনপূর্ব্বক কহিলেন, গুরো! আপনি আমারে মন্ত্রসমবেত ব্রহ্মাস্ত্র প্রদান করুন। অর্জ্জুনের তুল্য যোদ্ধা হইতে আমার বড়ই অভিলাষ হইয়াছে।......দ্রোণাচার্য্য ....কহিলেন—কর্ণ। নিত্য ব্রতধারী ব্রাহ্মণ বা তপস্বী ক্ষত্রিয় ইহারাই ব্রহ্মাস্ত্র জ্ঞাত হইতে পারে, অন্য কাহারও ইহাতে অধিকার নাই"

(শান্তিপর্ব্ব)

প্রত্যাখ্যাত হইয়া কর্ণ মহেন্দ্র পর্ব্বতে পরশুরামের নিকট গমন করেন এবং প্রণাম করিয়া, নিজের পরিচয় গোপন করিয়া, নিজেকে ভৃগুকুলোদ্ভব ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দেন। পরশুরাম কর্ণকে ব্রাহ্মণ বলিয়া শিষ্যত্বে গ্রহণ করেন এবং শিক্ষা-দান করেন।

প্রথম অভিশাপ ব্রাহ্মণের গোবধ-জনিত

কর্ণ "আশ্রমের অতি দূরবর্তী সমুদ্রতীরে যদৃচ্ছাক্রমে শর-নিক্ষেপ করত একাকী পরিভ্রমণ করিতেছিলেন, দৈবাৎ তাহার শরাঘাতে এক ব্রহ্মবাদী অগ্নিহোত্ররক্ষক ব্রাহ্মণের হোমধেনু বিনষ্ট হইল। মহাত্মা কর্ণ......ব্রাহ্মণের নিকট গমন পূর্ব্বক বিনয় সহকারে......কহিলেন—ভগবন্! আমি মোহ বশত আপনার হোমধেনু বিনষ্ট করিয়াছি। আপনি প্রসন্ন হইয়া আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন।" দ্বিজবর কোপাবিষ্ট হইয়া অভিশাপ দেন—"*দুরাচার! তুমি আমার বধার্হ। তোমারে অবশ্যই এই দুষ্কর্মের ফল ভোগ করিতে হইবে। **তুমি যাহার সহিত নিয়ত স্পর্দ্ধা করিয়া থাক এবং যাহারে পরাজয় করিবার নিমিত্ত সবিশেষ চেষ্টা করিতেছ তাহারই সহিত যুদ্ধ করিবার সময় পৃথিবী তোমার রথচক্র গ্রাস করিবেন।** চক্র ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইলে বিপক্ষ তোমার মস্তক ছেদন করিবে।" কর্ণ বিধিব রত্ন ও গোদান দ্বারা ব্রাহ্মণকে পরিতুষ্ট করিতে চেষ্টা করেন কিন্তু কোন ফলই হয় না।

দ্বিতীয় অভিশাপ পরশুরামের (শান্তিপর্ব্ব)

এদিকে পরশুরাম কর্ণকে সমস্ত ব্রহ্মাস্ত্র শিক্ষা করান। কর্ণও অধ্যবসায় ও নিষ্ঠার সঙ্গে ধনুর্ব্বেদ আলোচনায় মগ্ন থাকেন। "একদা উপবাসক্লিষ্ট পরশুরাম আশ্রমের সন্নিধানে কর্ণের সহিত ভ্রমণ করিতে করিতে নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া সূতপুত্রের ক্রোড়ে মস্তক সংস্থাপন পূর্ব্বক বিশ্বস্তচিত্তে নিদ্রাগত হইলেন। ঐ সময় এক......মেদমাংস লোলুপ দারুণ কীট কর্ণসমীপে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহার উরুদেশ ভেদ করিতে লাগিল। মহাবীর কর্ণ পাছে গুরুর নিদ্রা ভঙ্গ হয় এই ভয়ে সেই কীটকে দূরে নিক্ষেপ বা বিনাশ করিতে পারিলেন না... ...দারুণ বেদনা সহ্য করিয়া কম্পিত দেহে গুরুকে ধারণ করিতে লাগিলেন। ......কর্ণের উরু হইতে রুধির বিনির্গত হইয়া পরশুরামের গাত্রে সংলগ্ন হওয়াতে তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল......জমদগ্নিতনয় ক্রোধাবিষ্টচিত্তে কর্ণকে কহিলেন—এহে মূঢ়! তুমি কীটদংশনে যে কষ্ট সহ্য করিয়াছ ব্রাহ্মণে কখনই সেরূপ কষ্ট

সহ্য করিতে পারে না। ক্ষত্রিয়ের ন্যায় তোমার সহিষ্ণুতা দেখিতেছি, অতএব অচিরাৎ আমার নিকট সত্য পরিচয় প্রদান কর। তখন কর্ণ ভীত হইয়া……কহিলেন—ব্রহ্মণ! অমি সূতপুত্র, সূতনন্দিনী রাধা আমার মাতা। আমার নাম কর্ণ।……বেদবিদ্যাপ্রদ গুরু পিতার তুল্য, এই নিমিত্ত আপনার নিকট আমি ভৃগুবংশ সম্ভূত বলিয়া আত্ম-পরিচয় প্রদান করিয়াছিলাম। মহাবীর কর্ণ এই বলিয়া……ভূতলে পতিত হইলেন। তখন পরশুরাম কর্ণকে ক্রোধভরে……..কহিলেন * "সূতপুত্র! তুমি অস্ত্রলোভে আমার নিকট মিথ্যাকথা কহিয়াছ, অতএব **এই ব্রহ্মাস্ত্র তোমার বিনাশ-কালে বা সঙ্কট সময়ে স্ফুর্ত্তি পাইবে না।** এস্থান হইতে যথা ইচ্ছা হয় গমন কর॥"

* [কানীনত্ব এবং এই দুই ব্রহ্মশাপ লইয়া কর্ণের জীবনারম্ভ]

পরশুরামের নিকট অভিশপ্ত হইয়া কর্ণ দুর্য্যোধনের কাছে ফিরিয়া আসেন এবং দুর্য্যোধনের মন্ত্রণাদাতা হইয়া সুখে কালযাপন করেন। কিছুদিন পরে কলিঙ্গ দেশের রাজা চিত্রাঙ্গদের কন্যার স্বয়ম্বর সভায় যোগদান করেন এবং বলপূর্ব্বক কন্যা গ্রহণ করিয়া, দুর্য্যোধনকে দান করেন॥ তারপর মগধ-দেশাধিপতি জরাসন্ধের সহিত যুদ্ধ হয়॥ জরাসন্ধ পরাজিত হইয়া কর্ণকে মালিনী নগরী প্রদান করেন।

দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় কর্ণ

জন্মই যে কর্ণের জীবনের বড় অভিশাপ—প্রথম তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়—অস্ত্র পরীক্ষা-সভায় কৃপ যখন কর্ণের পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন। দ্বিতীয় প্রমাণ পাওয়া যায়—স্বয়ম্বর সভায়, যখন—"দ্রৌপদী কর্ণের ব্যবসায় দর্শনে মুক্তকণ্ঠে কহিলেন—আমি সূতপুত্রকে বরণ করিব না"। দ্রৌপদীর বাক্য শুনিয়া "কর্ণ সামর্ষহাস্যে সূর্য্য সন্দর্শন পূর্ব্বক শরাসন পরিত্যাগ করিলেন"। এখানেই অর্জ্জুনের সহিত কর্ণের একবার শক্তিপরীক্ষা হয়—তবে, কর্ণ "অর্জ্জুনের দুর্জ্জয় ব্রাহ্মতেজ স্বীকার পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ যুদ্ধ পরাঙ্মুখ হইলেন।"

সভাপর্বে কর্ণ

সভাপর্বের জীবনই কর্ণের জীবনের কলঙ্কময় অধ্যায়। ধৃতরাষ্ট্রতনয় বিকর্ণ দ্রৌপদীকে 'অজিত' প্রমাণ করিবার জন্য সভায় যে বক্তৃতা দেন তাহার উত্তর দিতে উঠিয়া কর্ণ যে সকল কথা বলেন তাহা যে কোন মহাত্মার পক্ষেই অনুচিত—কর্ণ বলেন—"......দেবতারা স্ত্রীলোক দিগের একমাত্র ভর্ত্তাই বিধান করিয়াছেন, দ্রৌপদী সেই বিধি অতিক্রম করিয়া অনেক ভর্ত্তার বশবর্ত্তিনী হইয়াছে, তখন ইনি বারস্ত্রী, তাহার সন্দেহ নাই।

সুতরাং বেশ্যাকে সভামধ্যে আনয়ন বা বিবসন করা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। দ্রৌপদীকে সম্বোধন করিয়া কর্ণ বলিয়াছেন......দাসের পত্নী ও তাঁহার সমুদায় ধন প্রভুর অধীন। এক্ষণে আমার অনুমতিক্রমে তুমি রাজভবনে প্রবেশপূর্বক রাজপরিবারের অনুগত হও। হে রাজপুত্রি! এখন ধৃতরাষ্ট্রনন্দনগণই তোমার প্রভু পাণ্ডুনন্দনেরা নহে।......"ঐ পরাজিত পঞ্চভ্রাতা তোমার পতি নহেন" তারপর—যখন "ঐশ্বর্য্যমত্ত দুরাত্মা দুর্য্যোধন ধর্মরাজকে এইরূপ কহিয়া হাসিতে হাসিতে দ্রৌপদীর প্রতি দৃষ্টিপাত করত বসন উত্তোলনপূর্ব্বক সর্বলক্ষণ সম্পন্ন বজ্রতুল্য দৃঢ় কদলীদণ্ড ও করিশুণ্ডের ন্যায় স্বীয় মধ্য উরু তাহাকে দেখাইলেন"—তখন "কর্ণ হাস্য করিতে লাগিলেন।"

বনপর্ব্বে কর্ণ

পাণ্ডবদিগকে বনে পাঠাইয়াও, শকুনি ও কর্ণের গায়ের জ্বালা প্রশমিত হয় না। দুর্য্যোধনকে প্ররোচনা দিয়া তাঁহারা "ঘোষযাত্রা"র আয়োজন করেন; দুর্যোধনের ঐশ্বর্য্য দেখাইয়া পাণ্ডবদিগের মনে দুঃখ দেওয়ার পরিকল্পনা করেন। একদিন মৃগয়া করিতে করিতে তাঁহারা দ্বৈতবনে উপস্থিত হন এবং সেখানে ঘটনাক্রমে গন্ধর্বরাজ চিত্রসেনের সহিত তাহাদের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। কর্ণ বীরত্ব সহকারে যুদ্ধ করেন বটে কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত পলায়ন করিয়া প্রাণ বাঁচান। দুর্য্যোধন অসমসাহসিকতা দেখাইতে গিয়া সপরিবার বন্দী হন এবং শেষে পাণ্ডবদের দয়ায় মুক্ত হন। এই মুক্তি দুর্য্যোধনের পক্ষে মৃত্যুর অধিক। আত্মগ্লানিতে তিনি প্রায়োপবেশন

করিয়া, জীবন ত্যাগ করিতে সঙ্কল্প করেন। কর্ণ তাঁহাকে অনেক ভাবে প্রবোধ দিতে চেষ্টা করেন। কর্ণ-দুঃশাসন-শকুনির সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে দুর্য্যোধন সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

কর্ণের দিগ্বিজয়

ইহার পর কর্ণ দিগ্বিজয়ে বহির্গত হন এবং সমগ্র ভারতবর্ষের পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ সমস্ত দিগবর্ত্তী রাজাদিগকে পরাজিত ও করপ্রদ করেন।

বিরাট পর্ব্বে কর্ণ

পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাস-সময়ে, ত্রিগর্ত্তরাজ সুশর্ম্মা পূর্ব পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার জন্য, বিরাট রাজ্য আক্রমণের মন্ত্রণা দান করিলে, কর্ণ তাহা সমর্থন করেন এবং সকলে মিলিয়া বিরাটের গো-ধন আক্রমণ করেন। এই সংঘর্ষেই বৃহন্নলারূপী অর্জ্জুনের সহিত কর্ণের আর একবার সম্মুখ সমর হয়। কর্ণ স্বভাব-সুলভ বাগদর্প প্রকাশ করেন যথেষ্ট। কৃপাচার্য্যের ও অশ্বত্থামার সঙ্গে বেশ খানিকটা বাগযুদ্ধও হয়। কিন্তু যুদ্ধকালে—ঘোরতর যুদ্ধের পরে—'গজ যেমন অন্য গজ কর্তৃক পরাজিত হইলে পলায়ন করে তদ্রূপ তিনি তখন অশনিসন্নিভ শর প্রহারে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া রণ পরিত্যাগপূর্ব্বক **পলায়ন করিলেন**।"

উদ্যোগপর্ব্বে :—ধৃতরাষ্ট্র প্রেরিত সঞ্জয় পাণ্ডবদের সংবাদ বহন করিয়া হস্তিনানগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবরা কে কি বলিয়াছেন, তাহা জিজ্ঞাসা করেন। সঞ্জয় একে একে সকলের কথাই জ্ঞাপন করেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে যুধিষ্ঠিরের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন এমন সময় কর্ণ আত্ম-শ্লাঘায় মুখর হইয়া উঠেন—পরশুরামের প্রসাদে তিনি এক নিমেষেই সব জয় করিবেন—এমন স্পর্দ্ধাও প্রাকশ করেন। ভীষ্ম কর্ণের দম্ভ সহ্য করিতে না পারিয়া বলেন—"হে কালহতবুদ্ধি কর্ণ। তুমি কেন আত্মশ্লাঘা করিতেছ ?......মহাত্মা মহেন্দ্র তোমারে যে শক্তি প্রদান করিয়াছেন তুমি তাহা সমর সময়ে বাসুদেবের চক্রে প্রতিহত, বিশীর্ণ ও ভস্মীভূত অবলোকন করিবে......"। ভীষ্মের তীব্র

কর্ণের অস্ত্র-ত্যাগ

ভৎসনার বাক্য শুনিয়া কর্ণ ক্রুদ্ধ হন এবং প্রতিজ্ঞা করেন *"আমি এই শস্ত্র পরিত্যাগ করিলাম; আপনি আমাকে আর কদাপি যুদ্ধে বা সভামধ্যে দেখিতে পাইবেন না; আপনি মানবলীলা সংবরণ করিলে পর ভূমিপালগণ আমার প্রভাব অবলোকন করিবেন।" কর্ণ এই কথা বলিয়া তৎক্ষণাৎ সভা ত্যাগ করেন।

ভগবদ্‌যান পর্ব্বাধ্যায়ে কর্ণ

যুদ্ধ আসন্ন বুঝিয়াও শ্রীকৃষ্ণ শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে কুরু-সভায় আগমন করেন। শান্তির কথায় কর্ণপাত না করিয়া দুর্মতি দুর্য্যোধন শ্রীকৃষ্ণকে বন্ধন করিতে উদ্যোগ করেন। শ্রীকৃষ্ণ "বিশ্বরূপ" প্রদর্শন করিয়া সকলকে স্তম্ভিত করিয়া দেন। এই সভা হইতে ফিরিবার সময় মহাত্মা বাসুদেব কর্ণকে আপনার রথে আরোহন করাইয়া বাহিরে লইয়া যান এবং তাহাকে তাঁহার জন্মরহস্য শুনাইয়া পাণ্ডব পক্ষে যোগদান করিতে আহ্বান জানান। বাসুদেব কর্ণকে বলেন—"হে রাধেয়!... তুমি সনাতন বেদবাক্য অবগত হইয়াছ এবং অতি সূক্ষ্ম ধর্মশাস্ত্রেও তোমার নিষ্ঠা জন্মিয়াছে। শাস্ত্রজ্ঞরা কহেন, যিনি যে কন্যার পাণি গ্রহণ করেন, তিনি সেই কন্যার কানীন ও সহোঢ় পুত্রের পিতা। হে কর্ণ তুমিও তোমার জননীর কন্যকাবস্থায় সমুৎপন্ন হইয়াছ। তন্নিমিত্ত তুমি ধর্ম্মত পাণ্ডুর পুত্র, অতএব চল ধর্ম্মশাস্ত্রের বিরুদ্ধেও, তুমি রাজ্যেশ্বর হইবে।" শ্রীকৃষ্ণ কর্ণকে আরো অনেক কিছুর লোভ দেখান এবং পাণ্ডবগণের সহিত মিলিত হইবার জন্য অনুরোধ করেন।

শ্রীকৃষ্ণের অনুরোধের উত্তরে কর্ণ বলেন—"হে কৃষ্ণ তুমি সৌহৃদ্য, প্রণয়, সখ্য বা হিতৈষিতাবশত ধর্ম্মশাস্ত্রের বিরুদ্ধে যাহা মনে করিতেছ, তাহা আমি নিশ্চয় অবগত হইলাম এবং আমি যে ধর্ম্মানুসারে পাণ্ডুর পুত্র তাহারও সন্দেহ নাই।......কিন্তু কুন্তী আমাকে অমঙ্গল উদ্দেশেই পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। অনন্তর সারথি অধিরথ আমাকে দর্শন করিবামাত্র গৃহে আনয়ন করিয়া...রাধার হস্তে সমর্পণ করিলেন, আমার প্রতি স্নেহবশত তৎক্ষণাৎ রাধার স্তনে ক্ষীর সঞ্চার

হইল। তিনি আমার মূত্র ও পুরীষ পরিষ্কার করিতে লাগিলেন। অতএব মাদৃশ ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি কি প্রকারে তাঁহার পিণ্ডলোপ করিবে।......অখণ্ড ভূমণ্ডল বা রাশীকৃত সুবর্ণের বিনিময়ে হর্ষ বা ভয়ে এই সকল অন্যথা করিতে আমার সামর্থ্য নাই।" কর্ণ আরো বলেন—দুর্যোধনের আশ্রয়ে ত্রয়োদশ বৎসর তিনি রাজ্য ভোগ করিতেছেন—সূতজাতির সহিত বহুবার যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছেন—সূতজাতির সহিত বিবাহাদি ক্রিয়াকলাপ নির্ব্বাহ করিয়াছেন, দুর্য্যোধন তাঁহারই ভরসায় যুদ্ধের উদ্যোগ করিয়াছেন, সুতরাং "বধ বন্ধন, ভয় বা লোভবশত ধীমান দুর্য্যোধনের সহিত মিথ্যা ব্যবহার করিতে" তিনি পারিবেন না। তুমি যে আমার জন্মবৃত্তান্ত যুধিষ্ঠিরের নিকট গোপন করিয়া রাখিয়াছ, ইহা আমি হিতকর বলিয়া অঙ্গীকার করিতেছি। জিতেন্দ্রিয় ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির আমাকে কুন্তীর প্রথমজাত পুত্র বলিয়া জানিতে পারিলে রাজ্য গ্রহণ করিবেন না; আর আমিই যদি সেই সুবিস্তীর্ণ রাজ্যপ্রাপ্ত হই, তাহা হইলে দুর্য্যোধনকেই প্রদান করিব, অতএব ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠিরই রাজ্যেশ্বর হইয়া থাকুন।"......

"হে কৃষ্ণ! আমি দুর্য্যোধনের প্রীতির নিমিত্ত, পাণ্ডবগণকে অনেক কটু-বাক্য কহিয়াছি, এক্ষণে সেই অপকর্মনিবন্ধন অনুতাপ হইতেছে।

"হে মধুসূদন! তুমি আমাকে অবগত হইয়াও কি মুগ্ধ করিতে অভিলাষ করিতেছ? এই যে পৃথিবীর প্রলয়দশা উপস্থিত হইয়াছে, আমি, শকুনি, দুঃশাসন দুর্য্যোধন এই চারিজন ইহার কারণ।......ভূরি ভূরি দুঃস্বপ্ন, ঘোরতর দুর্ণিমিত্ত ও নিদারুণ লোমহর্ষণ উৎপাত সকল যুধিষ্ঠিরের জয় ও দুর্য্যোধনের পরাজয় সূচনা করিতেছে।

শ্রীকৃষ্ণের সহিত বাক্যালাপ শেষ হইলে, কর্ণ কেশবকে গাঢ় আলিঙ্গন ও তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া রথ হইতে অবতরণ করেন।

কর্ণের সহিত কুন্তীর সাক্ষাৎকার

শ্রীকৃষ্ণের দৌত্য ব্যর্থ হইলে, বিদুর কুন্তীর নিকটে যুদ্ধের ভয়াবহ পরিণাম লইয়া অনেক কথা বলেন। কুন্তীও জ্ঞাতি-যুদ্ধকে কিছুতেই স্বীকার করিয়া লইতে পারেন না; বিশেষতঃ—"বৃথা-

দৃষ্টি মোহানুবর্ত্তী অনর্থনিরত বলবান দুরাত্মা কর্ণ পাপমতি দুর্য্যোধনের বশবর্ত্তী হইয়া পাণ্ডবগণকে দ্বেষ করে বলিয়া তাহার মন সতত দগ্ধ হয়। কুন্তী সঙ্কল্প করেন—'আজি আমি কর্ণের নিকট তাহার জন্মবৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া পাণ্ডবগণের প্রতি তাহার মন প্রসন্ন করিবার চেষ্টা করিব।" গঙ্গাতীরে কুন্তী কর্ণের সহিত দেখা করেন—জন্মবৃত্তান্ত শুনাইয়া পাণ্ডবপক্ষে যোগদানের জন্য আহ্বানও জানান কিন্তু কর্ণ বলেন—"ক্ষত্রিয়ে। আমি আপনার বাক্যে আস্থা করি না, আপনার বাক্যানুরূপ কার্য্য করিলে আমার ধর্মহানি হইবে।* দেখুন আপনা হইতেই আমার জাতিভ্রংশ হইয়াছে; আপনি তৎকালে আমাকে পরিত্যাগ করিয়া নিতান্ত অযশস্য ও কীর্ত্তিলোপকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। আমি ক্ষত্র-কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলাম কিন্তু আপনার নিমিত্তই ক্ষত্রিয়ের ন্যায় সৎকার প্রাপ্ত হই নাই; অতএব আর কোন শত্রু আপনা অপেক্ষা আমার অধিক অপকার করিবে।......আপনি পূর্ব্বে মাতার ন্যায় আমার হিত চেষ্টা না করিয়া এক্ষণে স্বকীয় হিতবাসনায় আমারে পুত্র বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন।" কর্ণ কুন্তীকে বুঝাইয়া দেন—ধৃতরাষ্ট্র তনয়দের পরিত্যাগ করা অধর্মের কার্য্য হইবে, সুতরাং তিনি পাণ্ডবপক্ষে যোগদান করিতে পারিবেন না। তবে বলিয়া দেন—"আমি যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল, সহদেব তোমার এই চারি পুত্রকে সংগ্রামে সংহার করিব না।......কেবল অর্জ্জুনের সহিত আমার সংগ্রাম হইবে......আপনার পঞ্চপুত্র কদাপি বিনষ্ট হইবে না।"...

ভীষ্মপর্বে কর্ণ

ভীষ্মের শরশয্যা পার্শ্বে ভীষ্ম ও কর্ণের শেষ সাক্ষাৎকার ঘটে। ভীষ্মকে শরশয্যায় শায়িত দেখিয়া "মহাদ্যুতি কর্ণ তৎক্ষণাৎ তাঁহার পদতলে নিপতিত হইয়া অশ্রুপূর্ণ কণ্ঠে কহিলেন—"হে কুরুশ্রেষ্ঠ। যে প্রতিদিন আপনার নয়ন পথে অতিথি হইত, আপনি সর্ব্বদাই যাহার প্রতি দ্বেষ প্রকাশ করিতেন, আমি সেই রাধেয়।" রক্ষিগণকে অপসারিত করিয়া "ভীষ্ম কর্ণকে এক হস্তে আলিঙ্গন করেন এবং সস্নেহ বচনে—কর্ণকে আবার তাহার জন্মবৃত্তান্ত বলেন এবং কেন তিনি তাহাকে

পরুষ বাক্য বলিতেন, তাহা ব্যক্ত করেন। ভীষ্ম কর্ণকে শতমুখে প্রশংসা করেন—উপদেশও দেন—"পুরুষকার দ্বারা দৈবকে অতিক্রম করা কাহারও সাধ্য নয়" এবং পাণ্ডবের সহিত মিলিত হইতেও অনুরোধ জানান।

কর্ণ ভীষ্মকে বুঝাইয়া বলেন—কেন তখন মিলন সম্ভব নয়; যুদ্ধের জন্য ভীষ্মের অনুজ্ঞা প্রার্থনা করেন এবং ভীষ্মের কাছে ক্ষমা ভিক্ষাও করেন।

দ্রোণপর্বে কর্ণ

দ্রোণপর্বে কর্ণের যোদ্ধৃসত্তাটিই প্রকটিত হইয়াছে। কর্ণ অভিমন্যুর সহিত যুদ্ধ করেন—সপ্তরথী মিলিত হইয়া অভিমন্যুকে বধ করেন। (২) ভীম সেনের সহিত কর্ণের তুমুল সংগ্রাম হয়, ভীমসেনের "শরাঘাতে ছিন্নচাপ ও বিকলাঙ্গ হইয়া সত্বরে অন্য রথে পলায়ন" করেন। কর্ণের এই পরাজয়ে ধৃতরাষ্ট্র বিলাপ করিয়া সঞ্জয়কে বলেন—"কর্ণের সমান যোদ্ধা পৃথিবী মধ্যে আর কেহই নাই, আমি এই কথা দুর্যোধনের মুখে বারংবার শ্রবণ করিয়াছি···কিন্তু এক্ষণে সে কর্ণকে নির্বিষ ভুজঙ্গের ন্যায় পরাজিত ও রণস্থল হইতে পলায়িত নিরীক্ষণ করিয়া কি কহিতেছে?" (৩) অগত্যা 'একঘাতী' বাণ দ্বারা ঘটোৎকচকে বধ করেন।

কর্ণপর্বে কর্ণ

কর্ণপর্বের উল্লেখযোগ্য সংবাদ এই—(ক) নকুলের সহিত সহিত কর্ণের যুদ্ধ (খ) কর্ণ দুর্যোধনের নিকট প্রতিজ্ঞা করেন—"আমি অর্জ্জুনকে বিনাশ না করিয়া রণস্থল হইতে কদাচ নিবৃত্ত হইব না।"···কিন্তু মদ্ররাজকে আমার সারথি হইতে হইবে। মহাবীর শল্য কৃষ্ণের সদৃশ (গ) শল্য সারথ্য স্বীকার করেন—একটি সর্ত্তে—"আমি উঁহারই সমক্ষে স্বেচ্ছানুসারে বাক্য প্রয়োগ করিব।" (ঘ) শল্য কর্ণের আত্মশ্লাঘা শুনিয়া, কর্ণের মুখের উপরেই অপ্রিয় সত্য বলিতে আরম্ভ করেন এবং উভয়ের মধ্যে তিক্ত বাক্‌যুদ্ধ হইয়া যায়। কর্ণ শল্যকে বলেন—"মহাবীর অর্জ্জুনের মহাস্ত্রনিচয়, শরাসন, ক্রোধ ও বলবিক্রম এবং মহাত্মা কেশবের মাহাত্ম্য আমার যেরূপ বিদিত আছে, তোমার তদ্রূপ নহে।···সমস্ত বৃষ্ণিবীর

মধ্যে কৃষ্ণে লক্ষ্মী ও পাণ্ডুতনয়গণ মধ্যে অর্জ্জুনের উপর জয় প্রতিষ্ঠিত আছে। ঐ উভয়ের হস্ত হইতে কেহ পরিত্রাণ লাভে সমর্থ হয় না; কিন্তু আজি সেই রথস্থিত মহাপুরুষদ্বয় আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে। তুমি অদ্য আমার আভিজাত্য সন্দর্শন কর।" পরশুরামের অভিশাপের কথা মনে পড়িয়া যাওয়ায় কর্ণ শল্যের কাছে অনুশোচনা করেন—ব্রাহ্মণের অভিশাপের কথা মনে পড়ে এবং তাঁহার মনে ভয় উপস্থিত হয়, তবু স্পর্দ্ধা প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হন না—"কর্ণ ভীত হইবার নিমিত্ত এই সংসারে জন্মগ্রহণ করে নাই, আপনার বিক্রম প্রকাশ ও যশোলাভের নিমিত্তই সমুদ্ভূত হইয়াছেন।" (ঘ) ভীমের সহিত প্রথম যুদ্ধে কর্ণের পরাজয়—কর্ণের শরাঘাতে যুধিষ্ঠিরের পলায়ন (চ) ভীম কর্ণের যুদ্ধ—**কর্ণ ও অর্জ্জুনের দ্বৈরথ যুদ্ধ** * **রথচক্রগ্রাস** —"সূতপুত্র! বসুন্ধরা তোমার রথচক্র গ্রাস করিতেছেন—কাল এই কথা কহিবামাত্র কর্ণ পরশুরাম প্রদত্ত অস্ত্র বিস্মৃত হইলেন এবং পৃথিবী তাহার রথের বামচক্র গ্রাস করিতে লাগিলেন। ঐ সময় ব্রাহ্মণ সন্তানের শাপে সূতপুত্রের রথ বিঘূর্ণিত হইতে আরম্ভ হইল। রথও…ভূতলে নিমগ্ন হইয়া গেল।"

কর্ণ অত্যন্ত বিমর্ষ ও বিহ্বল হইয়া যুদ্ধ করিতে থাকেন। রথচক্র উদ্ধার করিতে চেষ্টাও করেন কিন্তু চেষ্টা ব্যর্থ হয়। অর্জ্জুনকে ধর্ম্মের দোহাই দিয়া কিছুক্ষণের জন্য যুদ্ধ হইতে বিরত হইতে অনুরোধ করেন। বাসুদেব কর্ণকে তাহার অধর্ম্ম কার্য্যগুলি স্মরণ করাইয়া দেন—কর্ণ লজ্জায় অধোবদন হইয়া থাকেন। সেই অবস্থায় থাকিয়াও কর্ণ ভীষণ ও প্রাণপণ সংগ্রাম করেন; শেষ পর্য্যন্ত অর্জ্জুন নিক্ষিপ্ত 'অঞ্জলিক' বাণের আঘাতে প্রাণত্যাগ করেন।

কর্ণের মৃত্যুতে যুধিষ্ঠির ধনঞ্জয় বাসুদেব পাণ্ডবপক্ষে সকলেই আনন্দিত হন। যুধিষ্ঠির ধনঞ্জয় বাসুদেবকে প্রশংসা করিতে থাকেন—বলেন—"আমি নারদের নিকট শুনিয়াছি এবং মহর্ষি বেদব্যাসও বারংবার বলিয়াছেন যে তোমরা পুরাতন ঋষি মহাত্মা নর ও নারায়ণ"। যুধিষ্ঠির সন্দেহ ভঞ্জন করিতে সমর-

ভূমি পর্য্যন্ত যান এবং কর্ণকে নিহত দেখিয়া নিশ্চিন্ত হন—নিজেকে পুনর্জাত বলিয়া মনে করেন।

[বিঃ দ্রষ্টব্য :—কর্ণের মৃত্যু শয্যাপাশে অর্জ্জুন কৃষ্ণ ভীম যুধিষ্ঠির কেহই উপস্থিত হন নাই। কর্ণের মৃত্যুতে সকলেই আনন্দে উৎফুল্ল। শুধু তর্পণের সময়, কুন্তীর মুখে কর্ণের পরিচয় পাইবার পরে, যুধিষ্ঠির শোকপ্রকাশ করেন]

(খ) **সংস্কৃত নাটকে—কর্ণ**

মহাকবি ভাসের নামে প্রচলিত নাটকগুলির মধ্যে (১) পঞ্চরাত্র (২) দূতবাক্য (৩) মধ্যমব্যায়োগ (৪) দূত ঘটোৎকচ (৫) কর্ণভার (৬) উরুভঙ্গ —এই ছয়খানি নাটক মহাভারত-কাহিনী অবলম্বনে রচিত। এই নাটকগুলির মধ্যে, 'পঞ্চরাত্র' 'দূতবাক্য' 'কর্ণভার' এই তিনখানিতে কর্ণের চরিত্র পাওয়া যায় এবং বিশেষ ভাবে পাওয়া যায় পঞ্চরাত্র এবং কর্ণভার নাটকেই—দূতবাক্যে কর্ণ উল্লেখমাত্র।

(ক) **পঞ্চরাত্রে** কর্ণ দুর্যোধনের সখা—হিতবাদী এবং ধীরবুদ্ধি। দুর্যোধন পরামর্শ চাহিলে কর্ণ বলেন—

রামেণ ভুক্তাং পরিপালিতাং চ
স্ব ভ্রাতৃতাং ন প্রতিষেধয়ামি
ক্ষমাক্ষমত্বে তু ভবান প্রমাণং
সংগ্রামকালেষু বয়ং সহায়াঃ ॥

তারপর অভিমন্যু অপহৃত হইলে দুর্য্যোধন যখন বলেন—"সতি চ কুল-বিরোধে নাপরাধ্যন্তি বালাঃ"—কর্ণও সমর্থন করেন—বলেন—"অতিস্নিগ্ধমনুরূপং চাভিহিতম্"।

** (খ) **'কর্ণভার'**—নাটকে কৌরব সেনাপতি কর্ণ কেন্দ্রীয় চরিত্র। এই নাটকের বর্ণনীয় বিষয় ছদ্মবেশী ইন্দ্র কর্তৃক কর্ণের কবচকুণ্ডল-হরণ। কর্ণ কৌরব সেনাপতি—যুদ্ধ পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া সূত শল্যরাজের সহিত নিষ্ক্রান্ত। কিন্তু অগ্রগণ্য বীর কর্ণের সে দীপ্তি নাই—নিদায় সময়ে

ঘনরাশিরুদ্ধ সূর্য্যের মত কর্ণ শোকাচ্ছন্ন। শোকের কারণ—কর্ণ জানিয়াছেন— কুন্তীর গর্ভে তাঁহার জন্ম, পাণ্ডবগণ তাঁহার ভ্রাতা এবং—

নিরর্থমস্ত্রং চ ময়া হি শিক্ষিতং
পুনশ্চ মাতুর্বচনেন বারিতঃ।

কর্ণ শল্যের কাছে নিরর্থ অস্ত্রের বৃত্তান্ত বলেন…পরশুরামের কাছে অস্ত্র শিক্ষার জন্য মিথ্যা ভাষণ এবং শেষকালে পরশুরামের অভিশাপের কাহিনী বিবৃত করেন। তিনি দেখেন—সব অস্ত্রই যেন নির্বীর্য্য হইয়া গিয়াছে। তবু কর্ণের সান্ত্বনা—

হতোঽপি লভতে স্বর্গং জিত্বা তু লভতে যশঃ…

অগ্রসর হইতে যাইবেন এমন সময় নেপথ্যে হইতে আহ্বান আসে—হে কর্ণ! মহত্তর ভিক্ষা চাই। ব্রাহ্মণবেশী ইন্দ্র কর্ণকে আশীর্ব্বাদ করিয়া 'দীর্ঘায়ুভব না বলিয়া বলেন—সূর্য্যের মত, চন্দ্রের মত হিমালয়ের মত, সাগরের মত তোমার যশ অক্ষয় হো'ক। কর্ণ গো, অশ্ব, গজ, সুবর্ণ, পৃথিবীর আধিপত্য, অগ্নিষ্টোম ফল নিজ মস্তক সব কিছু দিতে চাহেন কিন্তু ব্রাহ্মণ উল্লিখিত দানের কোনটিই লইতে চাহেন না। শেষ পর্য্যন্ত কর্ণ—সহজাত কবচকুণ্ডল দান করেন। শল্য বারণ করিলে কর্ণ বলেন:—

* শিক্ষা ক্ষয়ং গচ্ছতি কালপর্য্যয়াৎ
'সুবদ্ধমূলা নিপতন্তি পাদপাঃ
জলং জলস্থানগতং চ শুষ্যতি
হুতং চ দত্তং চ তথৈব তিষ্ঠতি॥

ব্রাহ্মণবেশী ইন্দ্র অনুতপ্ত হন এবং "বিমলা" নামক শক্তি গ্রহণ করিবার জন্য কর্ণকে অনুরোধ করেন। কর্ণ প্রথমে প্রতিদান গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন, শেষে ব্রাহ্মণের অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া গ্রহণ করেন।

* বিশেষ লক্ষণীয় এখানে এই যে…ভাসের নাটকে—'কর্ণভার' নাটকে পরশুরামের অভিশাপের কথা নাটকের মধ্যে, গাঁথিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং

কর্ণের জীবনের "দ্বন্দ্ব", সামান্যভাবে হইলেও, কর্ণের শোকের মধ্যেই প্রকাশ করা হইয়াছে। তারপর 'দূতবাক্য' নাটকে শ্রীকৃষ্ণের দৌত্য এবং বিশ্বরূপ পরিগ্রহে নরনারায়ণত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে।

মহাকবি ভাসের পরেই উল্লেখযোগ্য—অশ্বঘোষ কালিদাস ভবভূতি। কুরু-পাণ্ডব কাহিনী লইয়া ইহারা কোন নাটক রচনা করেন নাই। পরবর্তী উল্লেখযোগ্য নাট্যকার—কবি ভট্ট নারায়ণ। তৎপ্রণীত 'বেণী সংহার' নাটকের তৃতীয় অঙ্কে কর্ণের সাক্ষাৎকার পাওয়া যায়। এখানে কর্ণ দুর্যোধন-সখা বটে কিন্তু কুমন্ত্রণাদাতা রণদর্পী। শোকার্ত্ত অশ্বত্থামাকে কটাক্ষ করিয়া কথা বলিতে তাহার বাধে না—পৌরষের আস্ফালনেও কুণ্ঠা নাই—

> সূতো বা সূতপুত্রো বা যো বা কো বা ভবাম্যহম্
> দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম মদায়ত্তং তু পৌরুষম্ ॥

দেখা যাইতেছে সংস্কৃত নাট্যকারদের মধ্যে এক মহাকবি ভাসই কর্ণের নিয়তি-বিড়ম্বিত জীবনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ এবং সমবেদনা প্রকাশ করিয়াছেন। ভট্টনারায়ণ কর্ণের বলদর্পের দিকটি ব্যক্ত করিয়াছেন বটে, কিন্তু কর্ণের কর্ণত্ব বলিতে যাহা বুঝায় তাহা ব্যক্ত করেন নাই।

(গ) কাশীদাসের মহাভারতে কর্ণ

আদিপর্বে (ক) দ্রোণাচার্য্যের নিকটে রাজকুমারদের শিক্ষা
(দ্রোণাচার্য্যের কাছে অস্ত্রশিক্ষা)
(খ) রঙ্গভূমিস্থলে কর্ণের আগমন
(গ) সকলকে লক্ষ্য বিন্ধনে ধৃষ্টদ্যুম্নের অনুমতি (দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভায় কর্ণ)
(ঘ) কর্ণের সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ

সভাপর্বে (ক) পঞ্চপাণ্ডবকে সভাতলস্থ করণ
(খ) সভাজনের প্রতি বিকর্ণের উত্তর (কর্ণের প্রত্যুত্তর)
(গ) যুধিষ্ঠিরদের দাসত্ব মোচন (কর্ণের শ্লেষ বচন)

বিরাটপর্বে কৃপাচার্য্যের সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ (গো-হরণ ব্যাপারে অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ)

উদ্যোগপর্বে (ক) কৌরবের সভায় শ্রীকৃষ্ণের পুনরাগমন (৫৩১)

(খ) উলূকের প্রতি পাণ্ডবের কথা

**(গ) কর্ণের জন্ম বিবরণ

ভীষ্মপর্বে কর্ণ দুর্য্যোধন ও ভীষ্মের মন্ত্রণা

দ্রোণপর্বে (ক) দ্রোণকে সেনাপতি করিবার মন্ত্রণা

(খ) কর্ণ কর্ত্তৃক ঘটোৎকচ বধ (এক-বিঘাতিনী অস্ত্র ব্যবহার)

*(গ) কর্ণের নিকট কপটে ইন্দ্রের কবচগ্রহণোপাখ্যান (দাতাকর্ণ)

কর্ণপর্বে কর্ণের সহিত যুদ্ধে যুধিষ্ঠিরের পরাজয়

* কর্ণবধ

বিঃ দ্রঃ * কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া আর সবই ব্যাস-কৃত মহাভারত অনুসারী

* কাশীদাসের মহাভারতে কয়েকটি ব্যতিক্রম :—

(ক) ব্যাসের মহাভারতে আছে—দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় কর্ণ লক্ষ্য ভেদ করিতে দাঁড়াইলে দ্রৌপদী উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেন—'সূতপুত্রে বরিব না কভু'—এই কথা শুনিয়া কর্ণ ধনু ত্যাগ করেন। কাশীদাসের মহাভারতে দেখা যায় :—কর্ণের বাণ—'সুদর্শন চক্রে ঠেকি চূর্ণ হৈয়া গেল'; কর্ণ লজ্জা পাইয়া সভায় অধোমুখ হইয়া বসিয়া থাকেন।

(খ) 'কুণ্ডলাহরণ' ব্যাসের মহাভারতে বনপর্বের ঘটনা—দ্বাদশ বৎসর অরণ্যবাসের পরেই এই ঘটনা ঘটে। কাশীদাসের মহাভারতে ইহা দ্রোণপর্বের ঘটনা।

বাংলা নাট্যে "কর্ণ"।

কর্ণের সমগ্র জীবন লইয়া অথবা জীবনের কোন বিশেষ ঘটনা লইয়া খুব কম নাটকই রচিত হইয়াছে। সংস্কৃত নাট্যকারগণের মধ্যে—শুধু মহাকবি ভাস কর্ণের জীবনের বিশেষ একটি ঘটনা—'কর্ণভার' নাটকে রূপকায়িত করিয়াছেন। ভট্টনারায়ণের 'বেণী সংহার' নাটকে কর্ণ দুর্যোধনের সখা রূপে অন্যতম পারিপার্শ্বিক চরিত্র মাত্র। বাংলা সাহিত্যেও কর্ণ কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসাবে বহুবার উপস্থাপিত হন নাই। বাংলা নাট্য-সাহিত্যে কর্ণ পার্শ্বচরিত্র-রূপেই উপস্থিত হইয়াছেন এবং খুব সম্ভব গিরিশচন্দ্রের 'অভিমন্যুবধ' নাটকেই (১৮৮০) প্রথম উপস্থিতি। মতিলাল রায়ের যাত্রা-নাটক 'কর্ণবধ'-এ কর্ণের প্রথম কেন্দ্রীয়ত্ব। গিরিশচন্দ্রের "বৃষকেতু" (১৮৮৪) কর্ণ-পরিবার-কেন্দ্রিক প্রথম নাটক। পাণ্ডবগৌরবে (১৯০০) কর্ণ আছেন—অপ্রধান রূপেই আছেন। * রবীন্দ্রনাথের "কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ (১৫ই ফাল্গুন ১৩০৬—১৮৯৯)—কর্ণের জীবনের একটি চরম আধ্যাত্মিক সঙ্কট-মুহূর্তের কবিত্বময় নাট্য রূপ। ইহার পরে, কর্ণকে অপ্রধান চরিত্র রূপে—হরিশ সান্যালের 'ভীষ্ম' এ, ক্ষীরোদপ্রসাদের 'ভীষ্মে' এবং আরো দুই একখানি নাটকে দেখা যায়। * ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে—অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় **"কর্ণার্জ্জুন"**-নাটকে, কর্ণকে প্রধান চরিত্ররূপে উপস্থাপিত করেন। কর্ণের জীবনের অধিকাংশ ঘটনাই নাটকে স্থান দেওয়া হইয়াছে—অবশ্য ক্রম সর্বত্র রক্ষা করা হয় নাই। **জন্ম-অভিশপ্ত কর্ণ—ব্রহ্ম-অভিশপ্ত কর্ণ দাতাকর্ণ**—কৃষ্ণপরায়ণ কর্ণ—এবং সমস্ত কিছুর মধ্য দিয়া নিয়তির হস্তে পুরুষাকারের পরাজয়, কর্ণার্জ্জুন নাটকের কর্ণ চরিত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে। * ইহার পরেই ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে **'নরনারায়ণ'** নাটকে—["দৈব নিগৃহীত পূর্ণশক্তিজ্ঞের মহাপুরুষের জীবনকাহিনী"] কর্ণকে একটু নূতন আলোকে রূপ দেওয়ার চেষ্টা হইয়াছে। এই নাটকেও কর্ণ **জন্ম-অভিশপ্ত**—কানীনত্বের অভিশাপ তাহার জীবনে সহজাত কবচকুণ্ডলের মতই সহজাত।

এই অভিশাপের উপরে আরো দুইটি অভিশাপ (একটি গো-বধ-জনিত, অন্যটি মিথ্যা পরিচয়দান-জনিত) যুক্ত হয় এবং তিনটি অভিশাপ মাথায় লইয়া কর্ণের জীবন আরম্ভ হয়। এখানেও কর্ণের প্রতিদ্বন্দ্বী ধনঞ্জয় এবং তাহাকে সমরে নিহত করাই কর্ণের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। এখানেও দাতাকর্ণ স্বমহিমায় বর্তমান, কিন্তু নরনারায়ণের কর্ণের বিলক্ষণ বৈশিষ্ট এই যে কর্ণ সমস্ত অন্তর দিয়া একথা বিশ্বাস করেন না—"নরনারায়ণ নরদেহধারী দেহরক্ষী গাণ্ডীবীর। সর্ব্বত্রগ, অনির্দ্দেশ্য, কূটস্থ অচল যেই ব্রহ্ম—আচ্ছাদন করে আছে অনন্ত ভুবন··· সে পশেছে চৌদ্দপোয়া পঞ্জর পিঞ্জরে।" কর্ণের কাছে ভীষ্মের উক্তি—"ধনঞ্জয় বাসুদেব—মায়াভিমানব। পূর্ব্বদেহে দুই ঋষি নরনারায়ণ"—অশ্রদ্ধেয় মূল্যহীন'—'প্রলাপবাক্য।' কিন্তু অবিশ্বাস-জ্ঞাপক এই সব উক্তির পিছনে একটি সন্দেহের সুরও আছে—কর্ণের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলে।—বাসুদেব নারায়ণ কিনা—এই সত্য আবিষ্কারেই কর্ণ বাসুদেব সখা অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে চাহেন। কর্ণ স্পষ্টভাবেই বলেন—"যদি মরি অর্জ্জুনের বাণে......সেই মৃত্যু মুখে তোমারে বলিব নারায়ণ"। এই নররূপী নারায়ণকে পাওয়ার ঐকান্তিকতাই যেন অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করার বাসনা হইয়া ব্যক্ত হয়। এই যুদ্ধেই যেন শ্রীকৃষ্ণের নরনারায়ণত্ব প্রমাণিত হইবে, তাই কর্ণের ঘোষণা—**সত্য যতদিন নিজে নাহি উপলব্ধি করি, ততদিন বিধাতাও দিলে সাক্ষী, মানব বলিব বাসুদেবে।**" অন্তিমে কর্ণ বাসুদেবকে—নরনারায়ণ স্বীকার করিয়া শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট— কর্ণের জীবনে পরিচয় জানিবার পরে যে দ্বন্দ্বের সম্ভাবনা আছে নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ সেই সম্ভাবনাকে করুণ-মধুর রূপ দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছেন। এই চেষ্টা করিতে গিয়া তিনি "কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ" বাদ দিয়া 'কৃষ্ণ কর্ণ-সংবাদ'কে গ্রহণ করিয়াছেন। কৃষ্ণের সহিত কথোপকথনে নাট্যকার কর্ণের দ্বন্দ্ব অভিব্যক্তির একটি সুন্দর অবকাশ লাভ করিয়াছেন—অবকাশের সদ্ব্যবহারও করিয়াছেন। নরনারায়ণের কর্ণ

নিঃসন্দেহে পূর্ব্ববর্ত্তী কর্ণের অপেক্ষা দ্বন্দ্বের দিক দিয়া অধিক অভিব্যক্ত। এই দ্বন্দ্বের বীজ মহাভারতে আছে, তবে আছে বীজাকারেই। নাট্যকার সেই বীজকেই অঙ্কুরিত-পল্লবিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

তবে কর্ণের পত্নীর ও পুত্রের কৃষ্ণপরায়ণতা—এতখানি কৃষ্ণানুরাগ অমহাভারতীয়—অবশ্য সম্পূর্ণ কবির নিজের কল্পিত নয়। কর্ণের ভ্রাতৃপ্রেমও মহাভারতে এত অভিব্যক্ত হয় নাই। কার্মুকের অগ্রভাগ দিয়া স্পর্শ করিয়া কর্ণ—চারিভ্রাতাকে পূর্বপ্রতিজ্ঞানুসারে ছাড়িয়া দেন—এই পর্যন্তই সত্য, গণ্ডদেশে চুম্বনাদি ব্যাপারে কল্পনার চমৎকারিত্ব যতই থাক, সত্য নাই। তারপর, কর্ণের মৃত্যুশয্যায় কৃষ্ণ ও পঞ্চপাণ্ডবের উপস্থিতিও অমহাভারতীয় কিন্তু চমৎকার-জনক কল্পনা।

* নরনারায়ণ কে

'নর-নারায়ণ'—কথাটি শুনিবামাত্র সঙ্গে সঙ্গে যে অর্থবোধ হয় তাহাতে 'নররূপী নারায়ণ' নরদেহধারী নারায়ণ অর্থাৎ "শ্রীকৃষ্ণ' ই মনের সামনে আসিয়া দাঁড়ায়—সাধারণতঃ মধ্যপদলোপী সমাসের সরল পথে অগ্রসর হইয়াই বিচার-বুদ্ধি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। কিন্তু কথাটি মধ্যপদলোপীর অন্তর্গত নয়; দ্বন্দ্বের একেকার অন্তর্ভুক্ত—অর্থাৎ নরনারায়ণ=নররূপী নারায়ণ 'শ্রীকৃষ্ণ' নহেন, নর-নারায়ণ=নর+নারায়ণ= ধনঞ্জয়-বাসুদেব। 'নরনারায়ণ' কে? এই সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত করিবার আগে,—এই কারণেই, পৌরাণিক বার্ত্তা জানিয়া লওয়া ভাল।

ব্যাসকৃত মহাভারতে এইরূপ বিবরণ বা ব্যাখ্যা পাওয়া যায়—

উদ্যোগপর্বে ভগবদ্‌যান পর্ব্বাধ্যায়ে,—জামদগ্নের সদৃষ্টান্ত বাক্যে, দম্ভোদ্ভব রাজার কাহিনী প্রসঙ্গে—নর-নারায়ণের কথা পাওয়া যায়। নর ও নারায়ণ—দুই মহাপুরুষ। "গন্ধমাদন পর্বতে কোন অনির্দ্দেশ্য তপস্যায় নিমগ্ন'—অবস্থায়, দম্ভোদ্ভবের সঙ্গে যুদ্ধ হয়, জামদগ্ন্য বলেন—"পূর্বে যে নর ও নারায়ণের কথা কীর্ত্তিত হইল, অর্জ্জুন ও কেশব সেই দুই মহাপুরুষ।"

ভীষ্মপর্বে—শরশয্যাশায়ী ভীষ্ম "অর্জ্জুনকে পূজাপূর্বক কহিলেন, হে মহাবাহু! এ কথা তোমার পক্ষে বিচিত্র নয়, নারদ তোমারে **পূর্বতন ঋষি** বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন।"

কর্ণপর্বে—কর্ণবধের পরে যুধিষ্ঠির নিজমুখে ব্যক্ত করিয়াছেন—বাসুদেবকে ও অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—"হে বীরদ্বয়! আমি নারদের নিকট শুনিয়াছি এবং মহর্ষি বেদব্যাসও বার বার বলিয়াছেন যে তোমরা **পুরাতন** ঋষি মহাত্মা নর ও নারায়ণ।"

শান্তিপর্বে—মোক্ষধর্ম পর্বাধ্যায়ে ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরের কাছে নারায়ণ-নারদ সংবাদ নামক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—"সত্যযুগে সায়ম্ভু মনুর অধিকার কালে বিশ্বাত্মা সনাতন নারায়ণ ধর্মের পুত্র হইয়া **নর নারায়ণ হরি ও কৃষ্ণ** এই চারি অংশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে নর ও নারায়ণ উভয়ে বদরিকাশ্রমে গমন পূর্বক কঠোর তপোনুষ্ঠান করেন। নারদের এই বদরিকাশ্রমে নর নারায়ণের সহিত সাক্ষাৎকার ঘটে এবং বার্ত্তালাপ হয়। নারায়ণ নিজ মাহাত্ম্য প্রকাশ করেন ...."অনন্তর দ্বাপর ও কলির সন্ধিতে—দুরাত্মা কংসের বিনাশসাধনের নিমিত্ত মথুরানগরীতে আমার জন্ম হইবে......পরিশেষে দ্বারকায় বাস করিব......জরাসন্ধ বিনাশের পর যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে পৃথিবীস্থ সমস্ত ভূপালগণ সমাগত হইলে আমি তাহাদের সমক্ষে শিশুপালকে বিনাশ করিব। * **এই সকল কার্যকালে একমাত্র মহাত্মা অর্জ্জুনই আমার সাহায্য করিবেন। তৎপরে আমি ভ্রাতৃগণের সহিত রাজা যুধিষ্ঠিরকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিব। "তৎকালে সকলেই কহিবে যে, মহাত্মা নর ও নারায়ণ পৃথিবীর কার্য সাধনের নিমিত্ত কৃষ্ণার্জ্জুনরূপে ক্ষত্রিয়কুল নির্ম্মূল করিলেন।"**

নারদের স্তব স্তুতি লক্ষ্য করিলে দেখা যায়—নরনারায়ণ, ঋষিরূপে অবস্থান করিলেও, নররূপী নারায়ণ। 'নর-নারায়ণ স্থলে অনেকক্ষেত্রেই শুধু 'নারায়ণ' শব্দটিও প্রযুক্ত হইয়াছে।

নর-নারায়ণ নাটকেও শব্দটিকে কথনও একক, কথনও বা দ্বৈত তাৎপর্য্যে ব্যবহার করা হইয়াছে। প্রথম অঙ্কে প্রথম দৃশ্যে ভীষ্ম রহস্য কথা শুনাইয়াছেন —"ধনঞ্জয়-বাসুদেব মায়াতিমানব। পূর্বদেহে দুই ঋষি নরনারায়ণ।" কিন্তু 'সূচনা'তে কর্ণ যেখানে বলেন 'নারায়ণ নরদেহ-ধারী। দেহরক্ষী গাণ্ডীবীর"। সেখানে নর-নারায়ণ একক তাৎপর্য্যে—অর্থাৎ 'নররূপী নারায়ণ' অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে। অর্জ্জুনও যে অবতার—এ ধারণা কর্ণের নাই।

তারপর প্রথম অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে—কর্ণের স্বগতোক্তির উদ্দেশ্য—'শ্রীকৃষ্ণ' —"বাসুদেব"। অৰ্জ্জুন এখানেও শ্রীকৃষ্ণের সখা মাত্র। শ্রীকৃষ্ণই—"মায়া-মনুষ্য-নারায়ণ" ..."নররূপে বিভু নারায়ণ আর অর্জ্জুন—"বাসুদেব-সখা"। চতুর্থ দৃশ্যে কর্ণের উক্তি—"যদুপতি! এ সাহস যার—কি বলিব—হয় সে নিতান্ত জড়, নর-নারায়ণ!—একক শ্রীকৃষ্ণেরই নর-নারায়ণত্ব প্রমাণ করে। প্রথম অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে কর্ণ যদিও নিজ মুখে বলেন—"পদ্মাবতী! আমিও শুনেছি ঋষিমুখে ধনঞ্জয়-বাসুদেব নর-নারায়ণ। বিশ্বাস না করি।" কিন্তু, ধনঞ্জয়ের "নরত্ব" স্থাপনে নাট্যকার তেমন সচেতন হন নাই। কারণ শেষ দৃশ্যে— কর্ণের অন্তিম উক্তির মধ্যেও শুধু বাসুদেবকেই সম্বোধন করিয়া কর্ণকে বলিতে শোনা যায়—"বাসুদেব! বাসুদেব, একবার সম্মুখে দাঁড়াও নর! সম্মুখে দাঁড়াও নারায়ণ।" 'ধনঞ্জয়-বাসুদেব' যেখানে নর-নারায়ণ সেখানে— 'সম্মুখে দাঁড়াও নর" ধনঞ্জয়কে লক্ষ্য করিয়াই বলা উচিত ছিল।

রচনা-নামকরণ-অভিনয়

নাটকের 'নিবেদন'-এ শ্রীযুক্ত সতীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় নাটক রচনার ইতিহাস যাহা বিবৃত করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায়—"১৯১২।১৩ সালে ৺কাশীধামে তিনি 'ভীষ্ম' নাটক লেখা শেষ করেন...তাহার পর 'দ্রোণ' ও 'কৃপ' লেখা আরম্ভ করেন। কিছু কিছু লেখার পর মহাভারতের "কর্ণ" চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ও মাধুর্য্য তাহাকে অভিভূত করায় 'কর্ণ' লেখা আরম্ভ করেন। কিন্তু বিভিন্ন রঙ্গালয়ের তাগিদে "কিন্নরী" প্রভৃতি ২।৩ খানি নাটক লিখিবার জন্য কর্ণ লেখা বন্ধ হয়। পরে যখন পুনরায় লেখা আরম্ভ করেন তখন নব গঠিত "আর্ট থিয়েটার লিমিটেড" কর্ত্তৃক সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার স্বর্গীয় অপরেশচন্দ্রের "কর্ণার্জ্জুন" নাটক অভিনয়ের আয়োজন সংবাদে "কর্ণ" লেখা বন্ধ রাখিয়া "আলমগীর" প্রভৃতি অন্যান্য নাটক লিখতে বাধ্য হয়েন"...

পরে নাট্যকলা ও সাহিত্যানুরাগী জমিদার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী মহোদয়ের সাগ্রহ অনুরোধে আনুকূল্যে ১৯২৪ সালে তিনি পুনরায় একাগ্র-ভাবে "কর্ণ" লেখা আরম্ভ করেন...—মহেন্দ্রবাবুর কাছে নাট্যকার এক পত্রে লিখিয়াছেন—"কর্ণ সম্বন্ধে বহু দিন হইতে যে একটা ধারণা পোষণ করিয়া আসিতেছিলাম সেইটাই পরিস্ফুটরূপে প্রকাশ করিবার বাসনা। *এক দৈব-নিগৃহীত পূর্ণ-শক্তিধর মহাপুরুষের জীবন কাহিনী।......

১৯২৫ সালে কর্ণ লেখা শেষ হয়। ইতিপূর্বে স্বনামধন্য প্রথিতযশা নট-নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী মহাশয়ও এই নাটক রচনায় ও অভিনয়ে আগ্রহ প্রকাশ করিলে, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনারায়ণের সৌজন্যে, শ্রীযুক্ত শিশির-কুমারের প্রযোজনা, অধ্যক্ষতা ও নামভূমিকা-অভিনয়ে **নরনারায়ণ নামে** ইহা ১লা ডিসেম্বর ১৯২৬, তারিখে নাট্যমন্দির লিমিটেড কর্ত্তৃক সর্ব্ব প্রথম অভিনীত হয়।"

এখানেই প্রশ্ন উঠিতেছে—"এক দৈব-নিগৃহীত পূর্ণ শক্তিধর মহাপুরুষের জীবন-কাহিনী"র দৃশ্য রূপটিকে—'নরনারায়ণ' নামে অভিহিত করা হইল কেন এবং সেই অভিধান কি পরিমাণেই বা সার্থক হইয়াছে। প্রশ্নটির উত্তর এই-ভাবে দেওয়া যাইতে পারে—'নিবেদন' হইতে জানা যায় যে 'কর্ণার্জ্জুন' নাটক অভিনয়ের আয়োজন সংবাদে 'কর্ণ' লেখা বন্ধ হয়...—কারণ "কর্ণ" অভিনয় করিবার জন্য অন্যান্য রঙ্গালয়ের চাহিদা কমিয়া যায়।' এই কারণেই বোধ হয়, কর্ণার্জ্জুনের কর্ণের স্পর্শ এড়াইবার জন্য নামকরণ করা হয়—"নরনারায়ণ।" ইহা অনুমান মাত্র। তবে একেবারে মিথ্যা অনুমান নাও হইতে পারে। অবশ্য এই অনুমানকে প্রশ্রয় না দিলেও প্রশ্ন উঠিবে—বর্ত্তমান গঠনে নরনারায়ণ নাম-করণ সার্থক হইয়াছে কি না, হইলে কোন্ দিক দিয়া সার্থক ?

নাটকের প্রস্তাবনা, সূচনা ও ঘটনাযোজনা লক্ষ্য করিয়া দেখা যায়—নাট্যকারের মুখ্য উদ্দেশ্য কর্ণের জীবনকে রূপ দেওয়া। সুতরাং আলম্বন বিভাবের দিক দিয়া, উপস্থাপ্য বিষয়ের দিক দিয়া হিসাব করিলে নাটকের নাম "কর্ণ" রাখাই যুক্তিযুক্ত। সেখানে 'কর্ণ' না রাখিয়া 'নরনারায়ণ' রাখায়—কর্ণের প্রতিপক্ষ 'ধনঞ্জয়-বাসুদেব'-এর দিকেই নাটকের উদ্দেশ্য-বিন্দু সরিয়া গিয়াছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। উদ্দেশ্য-বিন্দু সরিয়া যাওয়ার অর্থ কেন্দ্রান্তরের পরিবর্ত্তন ঘটা আর কেন্দ্রের পরিবর্ত্তন ঘটার অর্থ—গঠনেরও পরিবর্ত্তন ঘটা। "কর্ণ-কেন্দ্রিক গঠন এবং 'নরনারায়ণ" কেন্দ্রিক গঠন নিশ্চয়ই একরূপ হইতে পারে না। এই কারণেই অনেকে "নরনারায়ণ" নামকরণের কোন সার্থকতা খুঁজিয়া পান নাই।

এ কথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে স্থূল উদ্দেশ্যের দিক দিয়া 'কর্ণ' নামকরণই যথার্থ এবং সার্থক নামকরণ। কিন্তু এ কথা বলা চলে না যে 'নর-নারায়ণ'-নামের কোনরূপ সার্থকতাই নাই। সত্য বটে নাটকখানি—এক দৈব-নিগৃহীত পূর্ণ শক্তিধর মহাপুরুষের (কর্ণের) জীবন-কাহিনী, কিন্তু ইহাও মিথ্যা নয় যে নাট্যকার কর্ণের জীবন-কাহিনীর মাধ্যমে ধনঞ্জয়-বাসুদেবের নর-নারায়ণত্ব

প্রতিষ্ঠিত করিবার পরিকল্পনা করিয়াছেন। এই নরনারায়ণতত্ত্ব—প্রতিষ্ঠাকে নাটকের সূক্ষ্ম উদ্দেশ্য বা উপস্থাপ্য বলিয়া স্বীকার করিলে এবং সঙ্গে সঙ্গে সূক্ষ্ম উদ্দেশ্যানুসারে নামকরণের যুক্তিযুক্ততা স্বীকার করিলে নর-নারায়ণ নামকরণের সার্থকতা অবশ্যই খুঁজিয়া পাওয়া যাইতে পারে। বলা যাইতে পারে—**এই নাটকের বাহিরে কর্ণ, ভিতরে নর-নারায়ণ বিরাজ করিতেছে।** কর্ণের জীবনের সমস্যা ও নিয়তির নিগ্রহ দেখানো যেমন ইহার উদ্দেশ্য, তেমনি অন্যতম উদ্দেশ্য, একই সঙ্গে অবিশ্বাসী কর্ণের মুখে, বাসুদেবকে নরদেহধারী নারায়ণ বলিয়া প্রমাণ করা—অর্জ্জুন-কৃষ্ণের নর-নারায়ণত্ব প্রতিষ্ঠিত করা।

জাতি-পরিচয়

"মহাভারত" পুরাণ হইতে কাহিনীটি গৃহীত ; সুতরাং সূত্রানুসারে কাহিনীর উৎসের ভিত্তিতে, 'নর-নারায়ণ' নাটকের "পৌরাণিক" আখ্যা অবশ্যই প্রাপ্য। তবে এ কথাও এই সঙ্গে বলিয়া রাখা যাইতে পারে যে ইহা শুধু 'জাত্যা ব্রাহ্মণ'ই নয় অর্থাৎ নামেই পৌরাণিক নয়—স্বধর্মেও পৌরাণিক। বরং বলা চলে—পৌরানিকের উপর পৌরাণিক। বাস্তবিক, দৈব-লীলায় বিশ্বাস—মানুষের সংসারে, মানুষের দেহ ধারণ করিয়া দেবতাদের অবতরণে বিশ্বাস—নিয়তির অমোঘ নিয়মে বিশ্বাস—মন্ত্রতন্ত্রের শক্তিতে, অভিশাপ-অভিচারে বিশ্বাস যদি পৌরাণিক জীবনের তথা পৌরাণিকতার লক্ষণ বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলে অতিশয়োক্তির মত শোনাইলেও এ কথা সত্য কর্ণ-চরিত্র রূপায়ণে নাট্যকার মহাকবি ব্যাসেরও অপেক্ষা অধিক পৌরাণিক মনোভাবের পরিচয় দিয়াছেন—কর্ণকে অধিকতর অধ্যাত্মপরায়ণ করিয়া রূপ দিয়াছেন। কর্ণের 'অন্তঃ কৃষ্ণ বহিঃ কর্ণ'—রূপটি কল্পনা করিয়া নাট্যকার আরো এক ধাপ অগ্রসর হইয়াছেন। নাটকে দৈবলীলা—ব্রহ্মশাপ—নিয়তি (অবশ্য সাকার নহে) প্রভৃতি অতিপ্রাকৃত তো আছেই উপরন্তু আছে কৃষ্ণভক্তির আধিক্য। (মহাভারতে কৃষ্ণভক্তি আছে কিন্তু মহিমা প্রদর্শনের আতিশয্য নাই।)

তারপর, রস-বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে নাটকখানিকে 'ট্র্যাজেডি' শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে। পূর্ণশক্তিধর মহাপুরুষের দৈবহস্তে শোচনীয় নিগ্রহ—দৈবের বিরুদ্ধে পুরুষকারের নিষ্ফল সংগ্রাম ও শোচনীয় দ্বন্দ্ব-ক্ষোভ-পরাজয় যেখানে উপস্থাপ্য, সেখানে ট্র্যাজেডির রূপাদর্শেই যে কাহিনী পরিকল্পিত হইয়াছে, ইহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে। অবশ্য এসব ব্যাপারে পরিকল্পনাই যথেষ্ট নয়। পরিকল্পনার মধ্য দিয়া ট্র্যাজেডি-রস উপযুক্ত পরিমাণে নিষ্পন্ন হইয়াছে কি না অর্থাৎ নায়কের আচরণে (কায়িক-বাচিক-মানসিক) দর্শক-পাঠকের মনে ট্র্যাজেডি-সংবিদ (Tragic impression) জাগাইবার ক্ষমতা জন্মিয়াছে কি না, বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। পৌরাণিক পরিমণ্ডলে ট্র্যাজেডি-সংবিদ সৃষ্টি করা কঠিন কাজ। যেখানে পাত্র-পাত্রীর ভিতরে বাহিরে অতিপ্রাকৃতের প্রভাব বা দৈবের অস্তিত্ব বিরাজ করে—ভিতরে থাকে দৈবের অমোঘ নিয়মে বিশ্বাস আর বাহিরে থাকে দৈব-নিয়ন্ত্রিত ঘটনা-রাজি—নিয়তির স্থূল হস্তক্ষেপ, মন্ত্রতন্ত্র—অভিশাপ—আশীর্বাদের অব্যর্থ ক্রিয়া-কারিত্ব—সেখানে ট্র্যাজেডি সংবিদ জাগাইবার পথে বড় বাধা অতিপ্রাকৃতের অর্থাৎ দৈব প্রকৃতির সত্যস্বরূপতা ও মঙ্গলস্বরূপতা—দেবতা কৃপালাভে পরম পুরুষার্থতা। যে পরিমণ্ডলে দুঃখ-দুর্গতির বেদনা, মহত্তর কোন উপলব্ধির দ্বারা শোষিত হইয়া যায়, সেখানে ট্র্যাজেডির সংবেদনা তীব্র হইতে পারে না। মৃত্যু যেখানে অমৃত বহন করিয়া আনে—সব হারানোর বেদনাকে ছাড়াইয়া পরমার্থ পাওয়ার আনন্দ যেখানে বেশী হয়, ট্র্যাজেডি অপেক্ষা কমেডির রসই স্থায়ী হইয়া দাঁড়ায়। এই কারণেই—পৌরাণিক কাহিনী দ্বারা ট্র্যাজেডি-রস সৃষ্টি করিতে হইলে—পাত্র-পাত্রীর চরিত্রকে যথাসম্ভব লৌকিকবৎ করিতে হইবে—নাটকের সমগ্র আবহাওয়ায় মানবিকতার প্রাধান্য রাখিতে হইবে। কারণ ট্র্যাজেডি-সংবিদ মানবের প্রতি মানবের সহজ সহানুভূতির উৎস হইতেই জন্মে এবং ঐ ভাবে জন্মে বলিয়াই, দেবতাকেও ট্র্যাজেডির নায়ক হইতে হইলে—মানবের মত বেদনা বোধ লইয়া দুঃখ দুর্ভোগ ভোগ করিতে হইবে।

পৌরাণিক পরিমণ্ডলে দৈব বিশ্বাসের একাধিপত্য থাকা সত্ত্বেও, ট্র্যাজেডির অবকাশ সৃষ্টি হয় সেখানেই যেখানে ব্যক্তির অহংপুরুষ (ego) প্রবৃত্তির প্ররোচনায়, বাসনা চরিতার্থ করিতে তথা আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে গিয়া অহংকারবশে অন্যায় বা পাপ করিয়া বসে অথবা অনুচিত কর্মারম্ভ করে অথবা নিয়তির অমোঘ বিধানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া পুরুষকারকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করে এবং শেষ পর্যন্ত নিষ্ফল সংগ্রাম করিতে করিতে শোচনীয় ভাবে, অকালে, নিজকে ক্ষয় করিয়া দেয়। **অহং-মুক্তের জীবনে ট্র্যাজেডিও নাই—অহং-মুক্তের ট্র্যাজেডিবোধও নাই।** 'অহং'ই ট্র্যাজেডির জনক—'অহং'ই ট্র্যাজেডি রসের আস্বাদক। নিয়তিকে মনে মনে স্বীকার করিয়াও, কার্যে অস্বীকার করিয়া 'অহং' ট্র্যাজেডি ঘটায়; তেমনি ট্র্যাজেডির আস্বাদনকালেও 'অহং' দৈব-আনুগত্য স্বীকার করিয়াও সহানুভূতিবশে নিগৃহীত মানবের পক্ষে যোগদান করে। এইরূপ অবস্থাতেই ট্র্যাজেডি সম্ভব হয় এবং এই জাতীয় ট্র্যাজেডিতে শেষ পর্যন্ত দৈবের হস্তে পুরুষকারের পরাজয় ঘটে বটে, কিন্তু দৈবের কাছে আত্ম সমর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াও পুরুষকার বিশ্ব রঙ্গমঞ্চের বিরাট পটভূমিকায় জীবন রহস্য ও মানব মহিমার স্বাক্ষর রাখিয়া যায়।

'নর-নারায়ণ' নাটকের নায়ক দেবতাঔরসজাত হইলেও, সহজাত কবচ কুণ্ডল লইয়া জন্ম গ্রহণ করিলেও সামান্য একজন মানুষের মতই মর্ত্যের মানুষ। এমন কোন অবতার বা স্বর্গভ্রষ্ট দেবতা নহেন যিনি দুই চার দিনের জন্য লীলা করিতে বা পাপক্ষয় করিতে পৃথিবীতে আসিয়া স্বর্গের সন্তান স্বর্গে ফিরিয়া যাইয়া স্বস্তি পাইবেন। কর্ণে যে পরিমাণে **মানবিকতা** সেই পরিমাণেই কর্ণের বেদনায় আমরা ব্যথিত; আর সেই পরিমাণেই কর্ণের শোচনীয় দ্বন্দ্ব ও পরিণতি ট্র্যাজেডিরসাত্মক হইয়াছে। কর্ণের মৃত্যু সময়ে নর-নারায়ণ সম্মুখে দাঁড়াইয়াছেন বটে কিন্তু বেদনা-বিষাদের চাপ তাহাতে সামান্যই লঘু হইয়াছে। নিয়তির নিগ্রহ, জন্ম-অভিশাপের লাঞ্ছনা, নিরুপায় দ্বন্দ্ব ক্ষোভ শোচনীয় করুণ পরিণতি—সব কিছু মিলিয়া নাটকখানি ট্র্যাজেডি রসাত্মকই হইয়াছে।

কর্ণের জীবন অবশ্যই ট্র্যাজেডি-রসের উপযুক্ত আলম্বন বিভাব। কর্ণ কানীন পুত্র। এই কানীনত্বের অভিশাপে কর্ণ ক্ষত্রিয়ের মর্য্যাদা ও সংস্কার হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন—সূত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছেন। এই অভিশাপই যেন তাহার জীবনকে দুষ্ট গ্রহের মত তাড়না করিয়া লইয়া চলিয়াছে। এই অভিশাপের ফলেই কৌন্তেয় হওয়া সত্ত্বেও রাধেয় কর্ণ কৌন্তেয়-অর্জ্জুনের প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন হইয়াছেন—অর্জ্জুনকে পরাস্ত করিবার জন্য অস্ত্রশিক্ষা করিতে পরশু-রামের নিকট গিয়াছেন এবং দুই দুইটি মারাত্মক ব্রহ্মশাপ শিরে বহন করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। এই অভিশাপের সম্মুখে তাঁহার পুরুষকার বার বার যেন বিপর্য্যস্ত হইয়া গিয়াছে—লাঞ্ছিত হইয়াছে। অস্ত্রপরীক্ষাকালে কৃপাচার্য্যের প্রশ্নে, দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় দ্রৌপদীর—'সূতপুত্রে বরিব না কভু" ঘোষণায় ইহা কর্ণের মর্ম্মে তীব্রতম দংশন করিয়াছে। ভীষ্ম-দ্রোণ-কৃপ প্রভৃতির নিত্য গঞ্জনায় কর্ণের 'অঙ্গরাজত্বে'র দীপ্তিও যেন বার বার ম্লান হইয়া গিয়াছে। অপরিমেয় পৌরুষ ও অদ্বিতীয় দান-বীরত্ব, জন্মের গ্লানি হইতে কর্ণকে মুক্ত করিতে পারে নাই। দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম মদায়ত্তন্তু পৌরুষম্—কর্ণের মুখ—রক্ষা করিয়াছে মাত্র, কিন্তু কর্ণের মর্ম্মদাহ দূর করিতে পারে নাই। বাস্তবিক দেবতার ঔরসে ক্ষত্রিয় কন্যার গর্ভে যাহার জন্ম, দেবত্ব ক্ষত্রিয়ত্বের সহজ অধিকার তো তাঁহার জন্ম সূত্রেই পাওয়া। তবু যে সমাজ-বিধান নিয়তি-বিধানেরই অন্যতম ব্যক্ত রূপ—নিয়তি-বিধানের মতই দুর্নিবার, তাহার কাছে সূত ক্ষত্রিয়ের মর্য্যাদা পাইতে পারে না—এমন কি ক্ষত্রিয়ের সমস্ত গুণ থাকিলেও না। এই দিক দিয়া, কর্ণের ট্র্যাজেডি প্রথমতঃ—প্রধানতও বটে, জন্ম-অভিশপ্ত ব্যক্তিরই—অনিবার্য্য অথচ নিষ্ফল আত্ম-প্রতিষ্ঠা-সংগ্রামের ট্র্যাজেডি। আত্ম-প্রতিষ্ঠা কামনা চরিতার্থ করিতে গিয়া কর্ণ গোবধ পাপে লিপ্ত এবং তজ্জন্য অভিশপ্ত হন—গুরু অভিশাপের বজ্র বুক পাতিয়া গ্রহণ করেন—কর্ণের বহু কালের সাধনা—শতাব্দীর রচনা এক নিমেষে ধূলিসাৎ হওয়ার মতই অভিশাপের আগুনে দগ্ধ হইয়া যায়। দীর্ঘকালব্যাপী ঐকান্তিক সাধনার এইরূপ নিষ্ফলতা অবশ্যই শোচনীয়।

জন্ম-অভিশপ্তের জীবনে আসল ট্র্যাজেডি আরম্ভ হয় সেখানেই যেখানে তাহার জন্ম রহস্য আবিষ্কৃত বা প্রকাশিত হয় এবং অভিশপ্ত ব্যক্তির সম্মুখে চরমতম উভয়সঙ্কট—মহাসঙ্কট উপস্থিত হয়—কর্ণের জীবনেও সেই চরম সঙ্কট আসে যখন শ্রীকৃষ্ণ কর্ণের কাছে তাঁহার জন্ম রহস্য প্রকাশ করেন তখন কর্ণের অখণ্ড 'রাধেয়'-সত্তা ভাঙিয়া দিয়া "রাধেয়" ও "কৌন্তেয়" দুই খণ্ডে ভাগ করিয়া দেন। একদিকে ধর্মের প্রেরণা—রাধার ও অধিরথের স্নেহের ঋণ—দুর্য্যোধনের প্রীতির ঋণ, অন্য দিকে সোদর-স্নেহের সহজ আবেগ; দুই পক্ষই সমান প্রবল—সমান অপরিহার্য্য। সুতরাং দ্বন্দ্বও খুব তীব্র। আর সঙ্কটের চরম অবস্থা সেখানেই যেখানে—কর্ণের সেই চিরকালের সমকক্ষ ও শত্রু, যাহাকে সমরে নিহত করিবার জন্য কর্ণ অতন্দ্র সাধনা করিয়া আসিয়াছেন—যাঁহাকে বধ করিতে তিনি সখা দুর্য্যোধনের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, সেই অর্জ্জুন শেষ পর্য্যন্ত সহোদর ভ্রাতায় পরিণত হইয়া যান। রাধেয়ের সহিত কৌন্তেয়ের সংগ্রাম শেষে কৌন্তেয়ের সহিত কৌন্তের সংগ্রামে পরিণত হয়। কর্ণের অন্তর্দ্বন্দ্বের রূপ—কর্ণের নিজের ভাষায়—

"মর্ম চায় পরাজয়, ধর্ম চায় জয়—মনুষ্যত্ব চায় নিষ্ঠুরতা" এই দ্বন্দ্বকে অবশ্যই 'ট্র্যাজেডি-করুণ' বলিতে হইবে। পরিপূর্ণ শক্তিধর অতুলনীয় বীর, অদ্বিতীয় উদার দাতা এবং ধর্ম্মনিষ্ঠ মহাপুরুষ কর্ণের দৈবশক্তির বিরুদ্ধে ব্যর্থ সংগ্রাম ও শোচনীয় পতন নিঃসন্দেহে ট্র্যাজেডিরসাত্মক।

আর একটি বৈশিষ্ট্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া 'জাতি-পরিচয়' আলোচনা শেষ করা যাউক। নর-নারায়ণ গদ্য-পদ্যময় রচনা—(চম্পু নাট্য বলা যাইতে পারে ইংরাজীতে যে জাতীয় নাটককে 'Poetic drama' বলে ইহা অনেক পরিমাণ সেই জাতীয় নাটক) এই প্রসঙ্গেই বলিয়া রাখা ভাল—এ শ্রেণীর নাটকের উৎকর্ষ—বিচারে, কবিত্ব ও নাটকত্বের মধ্যে সমন্বয় স্থাপিত হইয়াছে কি না, বিশেষভাবে তাহা প্রণিধানযোগ্য; কারণ এই জাতীয় রচনায় বচনের বাস্তবিকতা অপেক্ষা কবিত্বময় বিস্তারের দিকে অধিকতর প্রবণতা থাকে।

গঠন

গঠনের উৎকর্ষ-অপকর্ষ বিচার করিবার মুখে গঠন সম্পর্কিত মূল সূত্রটি স্মরণ করিয়া লওয়া ভাল। এ সম্পর্কে মণীষী এরিস্টটল যাহা লিখিয়া গিয়াছেন তাহা প্রথম সূত্র হিসাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে—"So in poetry the story, as an imitation of action must represent one action a complete whole, with its several incidents so closely connected that the transposal or withdrawal of any one of them will disjoin and dislocate the whole" (Ingram Bywater) ইহা কিন্তু সেই আদর্শ রূপেরই কথা যাহাতে কোনরূপ অবান্তরেরই স্থান নাই—যাহাতে প্রত্যেকটি "অঙ্গ" নিখুঁতভাবে "অঙ্গী"র স্বরূপকেই ব্যক্ত করিয়া থাকে। বড় বড় শিল্পীরা এইরূপ পরা-আদর্শে পৌঁছিতে পারেন বা পৌঁছিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। অবশ্য এখানকার ঐ "অঙ্গীর স্বরূপ" কথাটি (complete whole) সংকীর্ণ অর্থাৎ কাহিনীর মোটামুটি কাঠামো অর্থে প্রয়োগ করিলে চলিবে না। 'অঙ্গীর স্বরূপ' বলিতে বুঝিতে হইবে কবির ধ্যানটি—কবির মানস নেত্রে প্রতিভাত বিষয়ের স্বরূপটী। এই স্বরূপ-ধ্যানের বৈশিষ্ট্যের বা পার্থক্যের ফলেই, একের 'অঙ্গী' অন্যের অঙ্গী হইতে ভিন্ন হয় এবং অঙ্গ বিন্যাসের ছাঁদেও পার্থক্য আসিয়া যায়। এই দিক দিয়া দেখিলে আদর্শ গঠন বা রূপ সেইটিই যাহা পরিপাটি অথচ সুষ্ঠভাবে 'অঙ্গী'কে অর্থাৎ মূল পরিকল্পনা-টিকে ব্যক্ত করিয়া থাকে।

এই নাটকের মূল-পরিকল্পনা বাহ্যত—দৈব-নিগৃহীত পূর্ণ শক্তিধর এক মহাপুরুষের জীবনী বটে কিন্তু নাট্যকার এই 'বাহ্য'কে অতিক্রম করিয়া আরো একটু—বেশ একটু, আগে বাড়িয়া গিয়াছেন। কর্ণের জীবনের অন্তরতম

প্রদেশে তিনি একটি ভাব-কেন্দ্র স্থাপিত করিয়াছেন এবং সেই কেন্দ্রের অভিমুখী করিয়াই কর্ণের আচরণ সমূহ সন্নিবেশিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই "ভাব কেন্দ্র"টি নাট্যকার নিজের প্রতিভালোকের শক্তিতেই মহাভারতের কর্ণের চরিত্র হইতে আবিষ্কার করিয়াছেন। "কর্ণের ধনঞ্জয় বিদ্বেষের কারণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া নাট্যকার নরনারায়ণতত্ত্বের গহনে নামিয়া গিয়াছেন। বাসুদেব 'নারায়ণ নর দেহধারী' কি না এই সত্য পরীক্ষা করিবার প্রবল বাসনাই যেন কর্ণকে বাসুদেব-সখা অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিবার প্রেরণা যোগাইয়াছে—কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ কর্ণের চাইই চাই। কারণ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ না ঘটিলে, বাসুদেব-সখা তথা বাসুদেবের নারায়ণত্ব পরীক্ষা করা সম্ভব হইবে না। মোট কথা কর্ণের যুদ্ধ কামনার এবং যুদ্ধ বাধাইবার কুমন্ত্রণাদির উৎস—রহিয়াছে নর-নারায়ণকে পরীক্ষা করার তথা পাওয়ার কামনারই মধ্যে। কর্ণ যে পরিমাণে অন্তরে কৃষ্ণপরায়ণ, বাহিরে সেই পরিমাণেই বাসুদেব ও ধনঞ্জয় বিরোধী। ইহা কর্ণ চরিত্রের নূতন ব্যাখ্যাই বটে এবং মহাভারতের কর্ণের যথাযথ প্রতিরূপ নয়—আরোপিত রূপ।

পরিকল্পনার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, যেখানে মহাভারতে কর্ণের রাধেয় কৌন্তেয় সত্তার দ্বন্দ্ব খুব পরিস্ফুটাকারে ব্যক্ত করা হয় নাই সেখানে নাট্যকার সেই দ্বন্দ্বের অবকাশ গ্রহণ করিয়াছেন এবং দ্বন্দ্বকে পরিস্ফুট আকার দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছেন। মহাভারতে কর্ণের 'ধর্ম' ও মনুষ্যত্ব যে পরিমাণে সংলক্ষ্য রূপ পাইয়াছে, 'মর্ম' তাহা পায় নাই। নরনারায়ণ নাটকে নাট্যকার কর্ণের মধ্যে 'মর্ম্ম' 'ধর্ম্ম' এবং 'মনুষ্যত্বের' দ্বন্দ্ব কল্পনা করিয়াছেন (কর্ণের উক্তি স্মরণীয়— "মর্ম চায় পরাজয়, ধর্ম্ম চায় জয়, মনুষ্যত্ব চায় নিষ্ঠুরতা")

সুতরাং এখানকার মূল কল্পনাটি, কর্ণের জীবনের প্রচলিত ঘটনার সহিত উল্লিখিত ভাব-বৈশিষ্ট্য সংযুক্ত হইয়া গড়িয়া উঠিয়াছে এবং এই নব-গঠিত কাহিনীই নরনারায়ণ নাটকের উপস্থাপ্য বিষয়বস্তু। এই বিষয়বস্তুকে কত সুষ্ঠুভাবে নাট্যকার রূপ দিতে সক্ষম হইয়াছেন তাহাই এখন বিচার্য্য। অর্থাৎ

বিচার্য্য এখন—সন্ধি বিভাগ—অঙ্ক দৃশ্যাদি বিভাগের সামর্থ্য ও সৌষ্ঠব—এক কথায় উৎকর্ষ—অপকর্ষ। আরো একটু বিশ্লেষণ করিয়া বলিলে বলা যাইতে পারে—অঙ্ক এবং দৃশ্যাদি বিভাগ এমন হইয়াছে কি না যাহাতে কাহিনীর ক্রমাভিব্যক্তিতে ঘটনাপরম্পরায় কার্য্যকারণ নিয়ম-নিয়তি, এবং কেন্দ্রাভিমুখিতা অক্ষুন্ন রহিয়াছে এবং সব কিছুর মধ্য দিয়া মুখ্য উপস্থাপ্য—ভাব বা রস চমৎকারজনক রূপে নিষ্পন্ন হইয়াছে। অঙ্ক বা দৃশ্য কেহই নিরপেক্ষভাবে স্বতন্ত্র নয়।—দৃশ্য যেমন অঙ্ক সাপেক্ষ, 'অঙ্ক' তেমনি সমগ্র পরিকল্পনা বা অংশী-সাপেক্ষ। একটি বাক্য যতই অলঙ্কার বহুল হউক না কেন সে যেমন একটি বিশেষ পরিচ্ছেদের বা বক্তব্যেরই অংশ, তেমনি দৃশ্য অঙ্কের এবং অঙ্ক সমগ্র পরিকল্পনারই অংশ। প্রত্যেকের স্বকীয় রূপ ও রসের সৌষ্ঠব বা চমৎকারিত্ব আছে বটে, কিন্তু সমগ্রের রূপ-রসের তাৎপর্য্য তাহাতে না থাকিলে তাহা সার্থক বলিয়া মনে করা যায় না।

গঠনে বা কাহিনী পরিকল্পনায় সমর্থ ঘটনার নির্বাচনই খুব বড় কথা এবং দুঃসাধ্য ব্যাপার। কোন্‌টি পরিহার্য্য কোন্‌টি অপরিহার্য্য তাহা স্থির করা এবং স্থির করার পরে নির্বাচিত ঘটনারাজিকে কেন্দ্রাভিমুখী করিয়া অঙ্গাঙ্গিযোগে যুক্ত করিয়া যোজনা করা—যোজনার মধ্য দিয়া চরিত্রের রূপ ও রস পরিণতি ব্যক্ত করা—নির্মাণক্ষমতার প্রথম ও প্রধান পরিচয়।

এইবার দেখা যাক নরনারায়ণ নাটকে এই ক্ষমতা কিভাবে এবং কতখানি প্রকাশ পাইয়াছে। বলা বাহুল্য হইলেও বলা ভাল—নাট্যকার, জন্ম হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত কর্ণের জীবনে যত ঘটনা ঘটিয়াছে সমস্ত ঘটনাকে প্রত্যক্ষভাবে উপস্থাপিত করেন নাই। উদ্যোগ পর্বের ঘটনা লইয়াই তিনি মূল নাটক আরম্ভ করিয়াছেন এবং পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনাগুলির অনেকগুলি আনিয়াছেন স্বগতোক্তি বা বিবৃতির সাহায্যে আর কয়েকটি আনিয়াছেন—'সূচনা' দৃশ্য পরিকল্পনা করিয়া। কর্ণের জীবন দৈব-নিগৃহীত। দৈব-নিগ্রহ দেখাইতে হইলে অবশ্যই—কর্ণের জন্ম-বৃত্তান্ত, গোবধ জনিত ঋষিশাপ এবং মিথ্যাচার-জনিত গুরু-

অভিশাপ প্রভৃতি ঘটনার দ্বারা ভিত্তি রচনা করিতে হইবে। অবশ্য এই ঘটনাগুলি কর্ণের প্রথম জীবনের ঘটনা এবং উদ্যোগ পর্ব্বে ঘটনা হইতে ব্যবহিত। ব্যবহিত ঘটনাকে যোজনা করিবার রীতি—তিনটি। এক রীতি—নির্বাচিত ঘটনাগুলি পর পর কালক্রম অনুসারে প্রত্যক্ষভাবে উপস্থাপনা করা—(পাত্রপাত্রীর রূপসজ্জা এবং ঘোষণা দ্বারা কালের গতি বুঝাইয়া দেওয়া ছাড়া ব্যবধান পূরণের কোন উপায় নাই) অন্য রীতি—অতীত ঘটনাকে পাত্রপাত্রীর স্মৃতি বা সংস্কারের মধ্য দিয়া অর্থাৎ চরিত্রেরই মানসিক ক্রিয়া হিসাবে প্রয়োগ করা আর অগত্যা—অতীত ঘটনাকে নাটকের মূল দেহ হইতে বিযুক্ত রাখিয়া 'সূচনা' দৃশ্যে স্থান করিয়া দেওয়া। নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ অগতির গতিই অবলম্বন করিয়াছেন—'সূচনা' দৃশ্যে তাপসের অভিশাপ এবং পরশুরামের অভিশাপ প্রত্যক্ষভাবে রূপ দিয়াছেন। কর্ণের জন্ম বৃত্তান্তটি উহ্যই রাখিয়াছেন। যাঁহারা কর্ণের জন্ম-বৃত্তান্ত না জানেন তাহাদের কাছে কর্ণের নিরুপায় অবস্থাটি সম্যকভাবে ধরা পড়ে বলিয়া মনে হয় না। তবে সূচনা দৃশ্য সম্বন্ধে কোন মন্তব্য করার আগে এ কথাও ভাবিয়া দেখা দরকার ঐ দুইটি ঘটনাকে পরোক্ষভাবে রূপ দিলে ঘটনার কার্য্যকরিতা এক কথায় রস প্রত্যক্ষ উপস্থাপনার সমান হইবে কি না। যদি তাহা নাই-হয় তাহা হইলে প্রত্যক্ষ উপস্থাপনতার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিতে হইবে এবং নাটকের ঘটনার আরম্ভ ঐ স্থান হইতে করিতে হইবে। যদি পরবর্ত্তী ঘটনাকে প্রত্যক্ষবৎ না করিয়া ডিঙাইয়া যাওয়া অসম্ভব বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা হইলে অবশ্য "সূচনা" দৃশ্যে স্থান দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই।

যাহা হউক নাট্যকার সূচনা দৃশ্যে একই কালের ভিন্ন-ভিন্ন-সময়ে-ঘটিত দুইটি ঘটনার সংশ্লেষণ করিয়াছেন—দুইটি অভিশাপ একই দৃশ্যে রূপায়িত করিয়াছেন। সংশ্লেষণের বিরুদ্ধে বিশেষ কিছু বলিবার নাই। তবে সংশ্লেষণ যে নির্দ্দোষ হয় নাই—এ কথা বলা যাইতে পারে। তাপসের আশ্রম-সান্নিধ্যে পরশুরামের উপস্থিতি অসম্ভব ঘটনা নয় বটে, কিন্তু অপ্রস্তুতভাবে

পরশুরামের কর্ণের জানুতে শয়ন এবং নাটকীয়? নিদ্রা, ঔচিত্যবাধক। রসের দিক দিয়াও যে দৃশ্যটি চিত্তাকর্ষক হইয়াছে তাহা বলা যায় না। অভিশাপ দেওয়ার আগেই তাপসের ও পরশুরামের ক্রোধের উত্তেজনা অনুচিত মাত্রায় প্রশমিত হইয়া গিয়াছে। তবে পরশুরামের চরিত্রকে নাট্যকার উল্লেখযোগ্য মাত্রায় ভাব-গভীর করিতে সক্ষম হইয়াছেন। বিশেষ লক্ষ্যণীয় এই যে, 'সূচনা' দৃশ্যে নাটকের "ভাব-বীজ"টিকে—নর-নারায়ণের প্রতি কর্ণের মনোভাবকে নাট্যকার সুন্দরভাবেই স্থাপনা করিয়াছেন এবং পরশুরামের অভিশাপে, "সত্যই যদি হীন সূত্রপুত্রের শোণিতে অশুচি হইয়া থাকি আমি এ পাপ না স্পর্শিবে তোমারে।"—এইটুকু অ-মহাভারতীয় আরোপ মিশাইয়া ভাবী একটি দ্বন্দ্বের জন্য সুন্দর অবকাশ সৃষ্টি করিয়াছেন। তাপসের অভিশাপ অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণ হিসাবে প্রয়োগ করিবার চেষ্টা করিলে, বলা যাইতে পারে দুইটি অভিশাপেরই সদ্ব্যবহার হইত।

এইবার, অঙ্ক ও দৃশ্য-পরিকল্পনা সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক।

প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্য—হস্তিনার সভামণ্ডপ। এখানে সঞ্জয়ের বার্তাকে কেন্দ্র করিয়া ভীষ্ম-কর্ণের বাগযুদ্ধ, কর্ণের বীরদর্প, অভিমানে অস্ত্র পরিহার এবং দানব্রতগ্রহণ উপস্থাপিত হইয়াছে। ভাবে ও ভাষায় দৃশ্যটি মহাভারত-অনুসারী। তবে কর্ণের আত্মপক্ষ সমর্থনটুকু অকাট্য যুক্তির দ্বারা নিষ্পন্ন হয় নাই এবং কর্ণের 'নর-নারায়ণ'—বিরাগ কবিকল্পিত—অবশ্য ভাব-বীজের স্বাভাবিক বিকাশেরই নিদর্শন। **দ্বিতীয় দৃশ্য**—পাণ্ডবশিবির। শ্রীকৃষ্ণের দৌত্য এই দৃশ্যের মুখ্য বর্ণনীয় বিষয় হইলেও প্রসঙ্গক্রমে যুধিষ্ঠির প্রমুখ পাণ্ডবগণের বিশেষতঃ দ্রৌপদীর চরিত্র বৈশিষ্ট্য (যুধিষ্ঠিরের শান্তি-অভিলাষ, ভীম-অর্জ্জুন-নকুলের যুধিষ্ঠির-ভক্তি, দ্রৌপদীর তেজস্বিতা ও কৃষ্ণপ্রীতি) প্রদর্শিত হইয়াছে। এই দৃশ্যের প্রথম প্রয়োজন—কুরুক্ষেত্রের প্রস্তুতি—দ্বিতীয় প্রয়োজন—কৌরবের অধর্ম্মাচার ও পাণ্ডবদের ধর্মপরায়ণতা প্রদর্শন তথা পাণ্ডবশিবিরকে ধর্মের শিবির রূপে প্রতিষ্ঠিত করা, তৃতীয় প্রয়োজন—

কৃষ্ণকে দূত রূপে প্রেরণ করিয়া কৃষ্ণের বিশ্বরূপ প্রদর্শনের—নারায়ণ-মহিমা প্রদর্শনের অবকাশ সৃষ্টি করা এবং 'কর্ণ-কৃষ্ণ সংবাদ'কে প্রয়োগ করিয়া কর্ণের অন্তর্বিক্ষোভ দেখাইবার আয়োজন করা। অবশ্য দৃশ্যটির বিস্তার এবং উপযোগিতা সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিতে না পারে এমন নয়।* তবে এখানেই উল্লেখ করা দরকার—নাটকখানির নাম 'নর-নারায়ণ' এবং কর্ণের জীবন যেমন উপস্থাপ্য তেমনি ধনঞ্জয়-বাসুদেবের নর-নারায়ণত্বও অন্যতম উপস্থাপ্য; মোটকথা নাটকখানির উদ্দেশ্য সরল নহে—যৌগিক। এই কারণেই নাট্যকার কর্ণের দিকে একচক্ষু এবং নর-নারায়ণের দিকে আর একচক্ষু রাখিয়া অগ্রসর হইয়াছেন।

তৃতীয় দৃশ্য—'কর্ণভবন'—বিশ্রাম কক্ষ। দৃশ্যের আরম্ভে "বৃষকেতু"র 'গীতি'টি, বৃষকেতুর কৃষ্ণানুরাগ যতই অভিব্যক্ত করুক, শিল্পের দিক দিয়া—গীতিনাট্যিক বা অপেরাধর্মী হইয়াছে। কর্ণের স্বগতোক্তিতে, কর্ণের—(নাটকেরও) কেন্দ্র-ভাবটি—কৃষ্ণের নরনারায়ণত্ব লইয়া কর্ণের দ্বিধাগ্রস্থ মনোভাব (বিশ্বাস-কোটির দিকেই মন ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে) ব্যক্ত হইয়াছে বটে কিন্তু দ্বন্দ্বের জোর বেশ কমিয়া গিয়াছে এবং অবিশ্বাসের মাত্রা অপেক্ষা বিশ্বাসের মাত্রাই বেশী হইয়াছে। তবে নারায়ণত্ব যাচাই করিতে কর্ণ কৃতসঙ্কল্প—এবং একটি মাত্র প্রমাণ দ্বারা তিনি যাচাই করিতে চাহেন—"যদি মরি অর্জ্জুনের বাণে……সেই মৃত্যুমুখে বাসুদেব তোমারে বলিব নারায়ণ।" তারপর কর্ণেরও পদ্মাবতীর কল্পিত কথোপকথন সাহায্যে নাট্যকার কর্ণের অতীত জীবনের ইতিহাস—দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর-সভায় কর্ণের গ্লানি, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ ব্যাপারে কর্ণের অমার্জ্জনীয় অপরাধ—ধনঞ্জয় যুধিষ্ঠিরের প্রতি কর্ণের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও প্রীতি-বোধ প্রভৃতি সুন্দরভাবেই ব্যক্ত করিয়াছেন। কর্ণ পদ্মার কাছে যে মনস্তাপ প্রকাশ করিয়াছেন—পদ্মার কাছে প্রকাশ করার জন্য তাহা অ-মহাভারতীয় বটে, কিন্তু কৃতকর্ম্মের জন্য কর্ণের মনস্তাপ প্রকাশ (কৃষ্ণের কাছে) মহাভারত সমর্থিত। এই দৃশ্যে, নাট্যকার কর্ণের অর্জ্জুন-বিদ্বেষের

মূল কারণ নির্দ্দেশ করিতে লিখিয়াছেন—

"দেবেরও অবধ্য আমি। জ্বলন্ত সকল্প
সেই হেতু নিত্য মোরে করে উত্তেজিত
যুঝিতে দ্বৈরথে-যুদ্ধে ধনঞ্জয়-সনে।'

অর্থাৎ নাট্যকার দেখাইতে চাহেন—কর্ণের ধনঞ্জয়-বিদ্বেষ বা যুদ্ধকামনা—দুর্য্যোধনকে কুমন্ত্রণা দিয়া কুরুক্ষেত্র সৃষ্টি প্রভৃতি ব্যাপার পরম্পরা, চিত্তের গভীরতম প্রদেশের নরনারায়ণ—কামনারই যেন ব্যক্ত রূপ। ধনঞ্জয়-বাসুদেবকে নর-নারায়ণ বলিয়া কর্ণ মনে মনে স্বীকার করেন বলিয়াই, নিজের 'দেবের অবধ্যত্ব'—পরীক্ষা করিতে নর-নারায়ণকেই সম্মুখ সমরে আহ্বান করিতে চাহেন। একটি কেন্দ্রীয় 'ভাব'কে সমস্ত আচরণের হেতু রূপে দেখাইবার প্রচেষ্টা খুবই প্রশংসনীয়। এই কর্ণকে যথাযথ মহাভারতের কর্ণ বলা না গেলেও—এ কথা অবশ্যই বলিতে হইবে—এই কর্ণেরআধ্যাত্মিক গভীরতা ও জটিলতা অনেক বেশী—অনেক প্রশংসনীয়।

চতুর্থ দৃশ্য—'কর্ণভবন—কক্ষান্তর।' এই দৃশ্যে নাট্যকার মোট চারিটি ব্যাপার একসঙ্গে গ্রথিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। প্রথম ব্যাপার—শ্রীকৃষ্ণের আগমন-বিষয়ে কর্ণের সহিত দুর্য্যোধন-দুঃশাসন-শকুনি প্রভৃতির পরামর্শ। প্রথমাংশে এই ঘটনাটি রূপ দেওয়া হইয়াছে এবং কর্ণের ঐকান্তিক যুদ্ধকামনার রূপটিও বিশেষ সতর্কতার সহিত প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু "দারুণ সমস্যা"র মধ্যে শকুনির স্থূল রসিকতা, এক কথায় 'বাচলতা' অনুচিত হইয়াছে। দ্বিতীয় ব্যাপার—কর্ণের অন্তরতম সত্তাটিকে স্বপ্নের সাহায্যে প্রদর্শিত করা—কৃষ্ণকে কর্ণ যে নারায়ণ বলিয়াই অন্তরে অন্তরে স্বীকার করেন ইহা ব্যক্ত করা। নাট্যকার স্বপ্ন সাহায্যে কর্ণের অবচেতন মনটি দেখাইবার—জাগ্রত-চৈতন্যে অহংকারের বাধায় যে সত্য প্রতিভাত হয় না সেই সত্যকে নিদ্রা-অবকাশে দেখাইবার যে পরিকল্পনা করিয়াছেন তাহা অ-মহাভারতীয় হইলেও,—প্রশংসনীয় যোজনা। এক নিদ্রার ঢিলে নাট্যকার দুই কাজের পাখী মারিয়াছেন—

যে নিদ্রায় কৃষ্ণের আবির্ভাব ঘটিয়াছে, সেই নিদ্রাবস্থাতেই স্বপ্নে ব্রাহ্মণবেশী সূর্য্য প্রবেশ করিয়া কর্ণকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। তারপর সূর্য্যের সতর্কী-করণ এবং ইন্দ্র কর্তৃক কবচ-কুণ্ডল হরণ—এই দুইটি ঘটনাকে সংশ্লেষণ করিয়াছেন। মোট কথা নাট্যকার এই দৃশ্য—কল্পনায় প্রশংসনীয় গঠনৈনপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন। তবে কবচ-কুণ্ডল ভিক্ষার স্থলে, পদ্মাবতীর ছুরিকা আনিতে প্রস্থান এবং ছুরিকা লইয়া প্রবেশের মধ্যে যথেষ্ট কালব্যবধান রক্ষিত হয় নাই। পরিশেষে ইহাও উল্লেখযোগ্য—ভাসের 'কর্ণভার' নাটকে প্রতিদান গ্রহণে-অনিচ্ছুক দাতাকর্ণের যেরূপ মহিমোজ্জ্বল মূর্ত্তি দেখা যায় এখানে সেই মূর্ত্তি পাওয়া যায় না।

দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্য—"উদ্যান"। উদ্যানে চারণীগণের 'গীত' ঘটনার স্বাভাবিক বা অপরিহার্য্য পরিণতি হিসাবে সংযোজিত হয় নাই। 'উদ্যান ও 'চারণী' উভয়ই যেন অনাবশ্যক আগন্তুক। দ্বিতীয় দৃশ্য—(বার পৃষ্ঠাব্যাপী একটি দৃশ্যে) কৃষ্ণের বিশ্বরূপ তথা নারায়ণত্ব প্রমাণিত করা হইয়াছে। কর্ণ-চরিত্রের সহিত প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত নয় বলিয়া ১২ পৃষ্ঠাব্যাপী একটি দৃশ্যে উক্ত ঘটনাটিকে রূপ দিতে যাওয়া অমিতব্যয় বলিয়াই মনে হয়। কর্ণ ও নর-নারায়ণকে যুগপৎ লক্ষ্যস্থলে স্থাপন করিতে চেষ্টা করায় এই ত্রুটী দেখা দিয়াছে। এই দৃশ্যে ধৃতরাষ্ট্রের এবং দুর্য্যোধনের চরিত্র অভিব্যক্ত হইয়াছে, সত্য, কিন্তু ইহার প্রয়োজনকে অপরিহার্য্য বলা যায় না।

তৃতীয় দৃশ্য—গান্ধারী—দুর্য্যোধনের কথোপকথন উভয়ের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হইয়াছে এবং যুদ্ধ যে অবশ্যম্ভাবী তাহা ঘোষণা করা হইয়াছে। তারপর ভীষ্মের সৈনাপত্য গ্রহণ এবং শিখণ্ডীর মধ্যেই যে ভীষ্মের মৃত্যুবাণ নিহিত সেই বিষয় বিবৃত করা হইয়াছে। চতুর্থ দৃশ্যে—কর্ণ প্রত্যক্ষভাবে উপস্থাপিত। প্রথমাংশে—দুঃশাসনের সহিত সংলাপে শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ প্রদর্শন ব্যাপারে কর্ণের সংশয় এবং ঐকান্তিক যুদ্ধকামনা ব্যক্ত হইয়াছে। (দ্বিতীয়াংশে) পদ্মাবতীর সহিত সংলাপে, কর্ণের 'রাধেয়'—সত্তাটির তাৎপর্য্য

বা গুরুত্ব প্রকাশিত হইয়াছে। কবচকুণ্ডলহীন কর্ণের অভেদ্য বলিতে এখন শুধু 'রাধেয়' পরিচয়টুকু অবশিষ্ট। যে পর্য্যন্ত কর্ণ 'রাধেয়' সেপর্য্যন্ত তিনি অজেয়। কর্ণ প্রাণপণে যেন 'রাধেয়'-সত্তাটিকেই আকড়াইয়া ধরিয়া আত্মরক্ষা করিতে চাহেন। পদ্মাবতীর মনের আকাশে সংশয়ের মেঘ বার বার হানা দিয়া বিষাদের অন্ধকার ঘনাইয়া তুলে ; তাঁহার ভয়—দৈব বিপাকে 'রাধেয়' পরিচয় ভাঙিয়া গেলে কর্ণের পতন অনিবার্য্য। পদ্মাবতীর সংশয় এবং আতঙ্ক একটু বেশী পরিস্ফুট হইয়াছে বটে কিন্তু কর্ণের জয়-অভিলাষী আত্মপ্রত্যয় এবং পদ্মাবতীর মৃত্যু-আতঙ্কিত সংশয়ের মিশ্রণটুকু চমৎকার উপভোগ্য হইয়াছে।* (তৃতীয়াংশে)—কৃষ্ণের সহিত কর্ণের সংলাপ—এবং কৃষ্ণের মুখে জন্মবৃত্তান্ত শ্রবণ। এই অংশ সম্পর্কে প্রথম বক্তব্য এই যে মহাভারতে কৃষ্ণ কর্ণের গৃহে আসেন নাই ; কৌরব সভা হইতে ফিরিবার সময়, কর্ণকে রথে তুলিয়া নগরের বাহিরে লইয়া গিয়া নির্জ্জনে জন্মরহস্য জানাইয়াছেন। এখানে কর্ণের গৃহেই কৃষ্ণ আসিয়াছেন। দ্বিতীয় বক্তব্য এই যে, অন্তর্নিহিত কৃষ্ণ-ভক্তি, রাধেয়-সত্তা এবং নবাবিষ্কৃত কৌন্তেয়-সত্তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সংযোগে এই অংশে যে ভাবাবেগ সৃষ্টি করা হইয়াছে, কর্ণে যে দ্বন্দ্বকরুণ মনঃক্ষোভের রূপটি ব্যক্ত করা হইয়াছে তাহা খুবই চিত্তাকর্ষক। এখান হইতেই কর্ণের জীবনে নূতন ও মর্ম্মান্তিক দ্বন্দ্ব আরম্ভ হইয়াছে। এই দ্বন্দ্বের রূপ—কর্ণের ভাষায়—"**মর্ম্ম চায় পরাজয়, সত্য চায় জয়, মনুষ্যত্ব চায় নিষ্ঠুরতা।**" ধর্ম্ম ও মর্মের দ্বন্দ্বে কর্ণ-চরিত্র খুবই লক্ষণীয় হইয়া উঠিয়াছে। মহাভারতের কর্ণে ধর্ম্মনিষ্ঠাই প্রবল, 'নর-নারায়ণে'র কর্ণে ধর্ম্ম ও মর্ম্ম উভয়ই প্রতিস্পর্দ্ধার সহিত ব্যক্ত হইয়াছে।

তবে যদিও এই দৃশ্যটিকে নাটকের মধ্যমণি বলা যাইতে পারে, তবু কর্ণের জন্ম-পরিচয় আবিষ্কার মুহূর্ত্তে 'রাধেয়'-সত্তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া আরো তীব্রভাবে ব্যক্ত করিতে পারিলে কর্ণ-চরিত্রের প্রাণবত্তা তথা দৃশ্যটির উৎকর্ষ আরো বৃদ্ধি পাইত।

তৃতীয় অঙ্কের—প্রথম দৃশ্যটি, কর্ণের জীবনকে মুখ্য উপস্থাপ্য হিসাবে দেখিলে, অপরিহার্য্য বলিয়া মনে করা চলে না। যদিও ইহাতে কৃষ্ণের অলৌকিক মহিমা—নারায়ণত্বের মহিমা দ্রৌপদীর মুখে আর একবার কীর্ত্তিত হইয়াছে এবং যুধিষ্ঠিরের চরিত্র-মাহাত্ম্যের ও পরোক্ষভাবে কর্ণের বীরত্বের উপর আলোকপাত করা হইয়াছে। তবু এ কথা সত্য যে এই দৃশ্য বাদ দিলে নাটকের তেমন কোন অঙ্গহানি ঘটে না। **দ্বিতীয় দৃশ্যে** কর্ণ যুদ্ধ শিবিরে; স্বগতোক্তিতে যুদ্ধের অগ্রগতি এবং কর্ণের দ্বন্দ্ব বিবৃত হইয়াছে। পদ্মাবতীর সহিত সংলাপে—প্রথমতঃ জয়দ্রথবধ-কাহিনী বিবৃত করা হইয়াছে এবং সেই প্রসঙ্গেই কর্ণের মনে, বাসুদেবের নারায়ণত্ব লইয়া যে সংশয় ও দ্বন্দ্ব আছে তাহা আবার ব্যক্ত করা হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ অত্যাসন্ন দ্বৈরথ যুদ্ধ গমনের প্রাক্‌কালে, পদ্মাবতীকে সান্ত্বনা দেওয়ার স্থলে, কর্ণের মধ্যে, মর্ম্মের ও ধর্ম্মের দ্বন্দ্ব চমৎকার আবেগের সহিত রূপ দেওয়া হইয়াছে—কর্ণ পদ্মাবতীকে যখন নিজের পরিচয় দিয়াছেন তখন যেন নিজের নিশ্চিত মৃত্যু সংবাদই দিয়াছেন। কল্পনাটি খুবই চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। তবে শেষ অংশে পদ্মাবতী ও বৃষকেতুর কৃষ্ণভক্তি মাত্রা অতিক্রম করিয়াছে। তাহাতে বাসুদেবের নারায়ণত্ব এবং নাটকের পৌরাণিকত্ব যতই বৃদ্ধি লাভ করুক, আতিশয্য দোষের স্পর্শ এড়ানো যায় নাই। **তৃতীয় দৃশ্যে**—কর্ণের ট্র্যাজেডি আরো এক ধাপ অগ্রসর হইয়াছে। কবচ কুণ্ডলহীন এবং 'রাধেয়'-বর্ম্মহীন কর্ণের অবশিষ্ট রক্ষাকবচ—"একবিঘাতিনী"ও তাঁহার হাতছাড়া হইয়া যায়—ধনঞ্জয়-বধের জন্য সযত্নে-রক্ষিত 'একঘ্নীবাণ' ঘটোৎকচ-বধের জন্য প্রযুক্ত হয়। এই দৃশ্যের শেষাংশে বিকর্ণ ও শকুনির আলাপ-প্রলাপ লঘু হাস্যোদ্দীপক হইয়াছে। **চতুর্থ দৃশ্যে**—কর্ণ-বধের আয়োজন করা হইয়াছে। যুধিষ্ঠির-ভীম-নকুল-সহদেবকে কর্ণের বিরুদ্ধে প্রেরণ করা হইয়াছে। তবে ঘটোৎকচের আলাপ-আচরণ হাস্যরসাত্মক হইয়া পড়ায় পরিস্থিতির গুরুত্ব কমিয়া গিয়াছে।

পঞ্চম দৃশ্যে—পরাজিত যুধিষ্ঠির-ভীম-নকুল-সহদেবের সহিত বিজয়ী কর্ণের

সস্নেহ আচরণে, কর্ণের ধর্ম্মের ও মর্ম্মের দ্বন্দ্বটিকেই—দুঃসহ অন্তর্বিক্ষোভকেই রূপ দেওয়া হইয়াছে। মহাভারতে এইরূপ পরিস্থিতি আছে বটে কিন্তু সেখানে যুধিষ্ঠিরাদি যেমন উপবিষ্ট নহেন এবং তেমনি কর্ণও ভীমের গণ্ডে সস্নেহ চুম্বন করেন নাই। দৃশ্যান্তরে—"একবিঘাতিনীর" জন্য কর্ণের আক্ষেপ—নিগূঢ় দ্বন্দ্ব-ক্ষোভের অভিব্যক্তি প্রশংসণীয়। ঘটোৎকচ বধে দুঃশাসন-শকুনির উল্লাস হাস্যোদ্দীপক, অর্জ্জুনের শোকাবেগ এবং কৃষ্ণের উল্লাসে দুই বিপরীত ভাব-রসের যে সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে তাহা খুবই কৌতূহলোদ্দীপক হইয়াছে। আর অর্জ্জুনের ও কৃষ্ণের সংলাপ দ্বারা কর্ণের অপরাজেয়-বীরত্ব-খ্যাতি প্রতিফলিত করায়—যথাসময়ে নেতৃ-চরিত্রের মহত্বের উপর আলোকপাত করা হইয়াছে।

চতুর্থ অঙ্কের—প্রথম দৃশ্যে, অর্জ্জুনকে শোধন করিবার জন্য এত সময় বা স্থান দেওয়ার বিশেষ কোন সার্থকতা নাই। দ্রৌপদীর মুখে বাসুদেবের নারায়ণত্ব এবং কৃষ্ণের মুখে কর্ণের অজেয়ত্ব ঘোষিত হইয়াছে—এবং সমাধিস্থ কৃষ্ণের উক্তিতে কৃষ্ণের পদ্মাবতী প্রীতিও ব্যক্ত হইয়াছে; শেষাংশ নাটকীয় বটে কিন্তু অ-মহাভারতীয়। **দ্বিতীয় দৃশ্যে**—বৃষকেতুর ও পদ্মাবতীর দিব্যোন্মাদ-সদৃশ কৃষ্ণোক্তিতে অতি নাটকীয় উদ্দীপনা ব্যক্ত হইয়াছে কিন্তু আসলে ব্যাপারটি কল্পনা-প্রসূত। কর্ণার্জ্জুনের যুদ্ধের অবকাশ এই দৃশ্য দ্বারা পূরণ করা যুক্তিযুক্ত হইয়াছে কি না বিচার্য্য বিষয়। রণস্থলে রথচক্রগ্রাস এবং ব্রহ্মাস্ত্রের বিস্মরণ—কর্ণের জীবনোপস্থপনায় প্রত্যক্ষ উপস্থাপনার দাবী অবশ্যই করিতে পারে, কারণ নিয়তির অনিবার্য্য গতি এবং পুরুষকারের নিষ্ফল সংগ্রামের রূপ ঐ দুইটি ঘটনায় চমৎকাররূপে উদভাসিত হইয়া থাকে। "মগ্নরথে পৃষ্ঠ দিয়া উপবিষ্ট কর্ণ"—ততখানি উদভাসিত করিতে পারে না। **তৃতীয় দৃশ্যে**—"মগ্নরথেপৃষ্ঠ দিয়া উপবিষ্ট কর্ণ"—এর মৃত্যু মুখে আত্ম-বিশ্লেষণ—মহাশূন্যতার জন্য মনঃক্ষোভ, শ্রীকৃষ্ণের কর্ণ প্রশস্তি—কর্ণের জন্য বেদনাবোধ—কর্ণের কৃষ্ণকে ভগবান বলিয়া স্বীকার—শেষ মুহূর্ত্তে ভীমের কর্ণ-পরিচয়লাভ যুধিষ্ঠির প্রভৃতির কর্ণের পাদমূলে উপবেশন এবং কর্ণের ভীমের উদ্দেশে দীর্ঘ

আত্মবিবরণ প্রদান—প্রভৃতি বিষয় উপস্থাপিত হইয়াছে। ঘটনার মূলটুকু মহাভারতীয়, কিন্তু "শ্রীকৃষ্ণের কর্ণ প্রশস্তি" হইতে আত্ম-বিবরণ দান পর্য্যন্ত—সবই কবি-কল্পিত। তবে ভাব-বিরোধী হয় নাই এই কারণে যে—পাণ্ডবগণ তর্পণকালে কুন্তীর মুখে কর্ণের পরিচয় পাইয়া খুবই শোক প্রকাশ করিয়াছিলেন।

চরিত্র-বিশ্লেষ ও বিচার

নর-নারায়ণ নাটকে পাত্রপাত্রীর সংখ্যা মোট ৩০ (পুরুষ—২৬; নারী—৪)। সুতরাং, চরিত্রের সংখ্যাও, সাধারণ নিয়ম অনুসারে—অর্থাৎ যেখানেই 'ব্যক্তিত্ব' সেখানেই 'চরিত্র' (ব্যক্তিত্বহীন ব্যক্তিও বিশেষ ধরণের চরিত্র) এই নিয়ম অনুসারে সমান বলা যাইতে পারে, যদিও চরিত্র-বিচারে সমালোচকরা সাধারণতঃ উল্লেখযোগ্য চরিত্রগুলিরই বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া থাকেন। মনে রাখা দরকার চরিত্র-বিচার প্রথমতঃ চরিত্রের **সাধারণ পরিকল্পনা'র** বিচার এবং দ্বিতীয়তঃ **পরিকল্পনার রূপায়ণের** বিচার। অর্থাৎ যে পরিকল্পনা করা হইয়াছে, সেই পরিকল্পনাটিকে সার্থকভাবে ব্যক্তি-জীবনের আকারে রূপ দেওয়া হইয়াছে কি না তাহার বিচার। কাহিনী যেখানে সামাজিক সেখানে চরিত্রের সাধারণ পরিকল্পনা" এবং বিশেষ রূপ সবই কবির নিজের করা; আর কাহিনী যেখানে পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক সেখানে পাত্র-পাত্রীদের সাধারণ পরিকল্পনার রেখা-রূপটি দেওয়া থাকে বটে কিন্তু সেখানেও কবির কৃতিত্ব প্রকাশ পায় সাধারণের মধ্যে অসাধারণকে অর্থাৎ অনভিব্যক্ত 'সম্ভাব্য'কে আবিষ্কার করায়। 'ঘটে যাহা সব সত্য নহে'... কবির এই কথাই সেখানে সত্য—বাল্মীকির মনোভূমি যেমন রামের জন্মভূমি হিসাবে অযোধ্যার চেয়েও সত্য তেমনি পৌরাণিক-ঐতিহাসিক চরিত্রেরও শৈল্পিক জন্মভূমি কবি-মনোভূমি। যে কবির সংস্কৃতি (জ্ঞান-অনুভব-ইচ্ছা) যত বড় তিনি তত বড় আকারে বা প্রকারে চরিত্রের পরিকল্পনা ও রূপদান

করিতে পারেন। স্রষ্টার সৃষ্টি-কৌশল সেই পরিকল্পনাতেই—সেই সুষ্ঠু রূপদানের মধ্যেই অভিব্যক্ত।

কর্ণ (ক) নর-নারায়ণ নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র—"কর্ণ"। নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ পৌরাণিক "কর্ণ" চরিত্রকে এখানে নূতন রূপাদর্শে পরিকল্পিত করিয়াছেন। তিনি মহাভারতের কর্ণের বাহ্য রূপটি অর্থাৎ কর্ণের জীবনের তথ্যরাজি মোটামুটি গ্রহণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু কর্ণের "হৃদয়-মন গঠনে অনেক পরিমাণে স্বাধীন কল্পনা আশ্রয় করিয়াছেন। নাটকে কর্ণ-চরিত্রের সাধারণ পরিকল্পনা"—এইরূপ :—

(ক) কর্ণ—"দৈব নিগৃহীত পূর্ণ শক্তিধর মহাপুরুষ"। "সহজাত কবচ-কুণ্ডল—জ্যোতির্ময় সুন্দর দেহধারী, সত্যবাদী নির্ভীক দেবতারূপী নর"—হইয়াও জন্ম-অভিশপ্ত—'কৌন্তেয়' হওয়া সত্বেও 'রাধেয়'—অবশ্য 'কৌন্তেয়'-পরিচয় তাহার কাছে অজ্ঞাত।

(খ) প্রতিদ্বন্দ্বী ধনঞ্জয়কে সমরে বিনাশ করিবার জন্য ঐকান্তিক আগ্রহে ধনুর্বেদ শিক্ষা করিতে এবং মিথ্যা পরিচয় দিয়া পরশুরামের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে গিয়া 'গো-বধ' জনিত ঋষি-শাপে এবং মিথ্যা পরিচয়-জনিত 'গুরু শাপে' অভিশপ্ত।

*(গ) "নারায়ণ নরদেহধারী!—দেহরক্ষী গাণ্ডীবীর।"—এ কথা কর্ণ বিশ্বাস করেন না, ইহা তাঁহার কাছে 'অশ্রদ্ধেয় মূল্যহীন'।

(ঘ) ধনঞ্জয়ের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রথম কারণ যাহাই হউক—দ্বিতীয় এবং পরবর্তী কারণ—কর্ণের ভাষায়—"দেবেরও অবধ্য আমি। অনন্ত সঙ্কল্প সেই হেতু নিত্য মোরে করে উত্তেজিত, যুঝিতে দ্বৈরথ-যুদ্ধে ধনঞ্জয় সনে।" অর্জুনের সহিত দ্বৈরথ-যুদ্ধই তাঁহার একমাত্র কামনা; এই যুদ্ধের বিনিময়ে বিশ্বের কর্তৃত্বও তিনি চাহেন না। *সুতরাং কর্ণের যুদ্ধ কামনার বাহিরে আছে—ধনঞ্জয়-প্রতিদ্বন্দ্বিতা বটে কিন্তু মূলে আছে—'নর-নারায়ণ' বলিয়া

কথিত ধনঞ্জয়-বাসুদেবের সহিত যুদ্ধ করিয়া নিজের 'দেবের-অবধ্যত্ব' পরীক্ষা করার প্রেরণা এবং আরো গভীরে আছে—ধনঞ্জয়-বাসুদেবের নর-নারায়ণত্ব যাচাই করিয়া লইবার নিগূঢ় বাসনা—এক কথায় অন্তরতম প্রদেশে নারায়ণকে পাইবার কামনা। (কর্ণ বাসুদেবকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছেন—তুমি যদি সেই নারায়ণ...এ অন্তরে কি আছে আমার সমস্ত অবশ্য জান তুমি, এই যে আমার দেহ-আবরণ...এ তো পারিবে না—কোন মতে পারিবে না, এ হৃদয়ে তোমার দর্শনে দিতে বাধা। এই সত্য আবিষ্কারে করেছি সর্বস্ব দানপণ। এই সত্য আবিষ্কারে আমি জীবন-মরণ যুদ্ধে করিতে চলেছি একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী তোমার সখায়" (প্রথম অঙ্ক তৃতীয় দৃশ্য)।

কর্ণের হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে আছে—কৃষ্ণের নারায়ণত্বে প্রবল বিশ্বাস কিন্তু বুদ্ধির স্তরে আছে বিশ্বাস অবিশ্বাসের দ্বন্দ্ব এবং এই দ্বন্দ্বই যুদ্ধ-কামনার রূপে—ধনঞ্জয়-প্রতিদ্বন্দ্বিতার রূপে ব্যক্ত হইয়াছে। দুর্যোধনকে কুমন্ত্রণাদান প্রভৃতি আচরণও এই যুদ্ধকামনার অর্থাৎ "নর নারায়ণ"কে লাভ করিবার গোপন কামনা হইতেই প্রেরিত হইয়াছে। এইভাবে—"প্রাণ বুদ্ধি ধর্ম"—অধিকারে ব্যক্তিত্বের যে দ্বন্দ্বজটিল রূপ, কর্ণে তাহাই দেখাইবার চেষ্টা হইয়াছে।

(ঙ) "রাধেয়"—সত্তাটি কর্ণের—"ধর্ম-সত্তা" এবং তদপেক্ষা আরো কিছু বেশী। গুরু অভিশাপেই, কর্ণ যতক্ষণ "রাধেয়' ততক্ষণ ব্রহ্মাস্ত্রের অধিকারী—ততক্ষণ অপরাজেয়। কবচকুণ্ডলহীন—'একঘ্ন'-হীন কর্ণের শেষ বর্ম রাধেয়ত্ব। একে একে কবচকুণ্ডল, "একঘ্ন" এবং রাধেয়ত্ব সবই অপহৃত হইয়াছে। "রাধেয়-পরিচয়" যাইবার সময় কর্ণের মর্ম জ্বালাইয়া দিয়া গিয়াছে—"রাধেয়"-কর্ণকে কৌন্তেয়-কর্ণে পরিণত করিয়াছে—কর্ণকে ভাঙিয়া 'রাধেয়' ও 'কৌন্তেয়' দুইখণ্ড করিয়া দিয়াছে। একদিকে ধর্ম একদিকে মর্ম—দুইয়ের দ্বন্দ্বে কর্ণের জীবনও এক মহাকুরুক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে।

বাস্তবিকই, কর্ণ-চরিত্রের 'সাধারণ পরিকল্পনা'টির মধ্যে অভিনবত্ব আছে।

এইবার দেখা যাক নাট্যকার চরিত্র-রূপায়ণে কিরূপ দক্ষতা দেখাইতে সক্ষম হইয়াছেন।

'সূচনা'তে দেখা যায়—কর্ণ তাপসের উদ্যত অভিশাপের সম্মুখে নির্ভীকভাবে মাথা পাতিয়া দিয়াছেন—নির্ভীকভাবে সত্য কথা বলিয়াছেন—"মৃগভ্রমে বধিয়াছি ধেনু।" সত্যই প্রাণভয়ে কর্ণ সত্য গোপন করেন নাই—অভিশাপ-ভয়েও তিনি ভীত ন'ন। বাহিরের পরিচয়ে কর্ণ হস্তিনা নগরবাসী এবং কর্ণ নামে প্রসিদ্ধ হইলেও এবং ভগবান রামের শিষ্য হইলেও কর্ণের আসল পরিচয় তাহার আবির্ভাবেই ব্যক্ত হইয়াছে; তাপসের বিস্মিত বচনেই প্রকাশিত হইয়াছে—"দেহধারী অংশুমালী সম স্বতেজে স্বরূপ সুপ্রকাশ" অতিও সবিস্ময়ে কর্ণের বিস্ময়কর এবং রহস্যময় রূপটির প্রতি অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়াছে—"সহজাত কবচকুণ্ডল, জ্যোতির্ম্ময় সুঠাম সুন্দর দেহধারী, সত্যবাদী, নির্ভীক দোতারূপী নর"। তাপস যেন নিয়তির মত সর্ব্বজ্ঞ দৃষ্টি লইয়াই দেখেন—"এই বিশ্বমাঝে কোন শ্রেষ্ঠ ধনুর্দ্ধরে, পরাজিত করিতে সমরে" কর্ণ গোপনে বিচিত্র বিদ্যা শিখিয়াছেন এবং "সর্ব্বদা সর্ব্বথা সঙ্গে তার—রক্ষিরূপে দেহধারী ভ্রমে নারায়ণ" কিন্তু কর্ণকে তিনি অভিশাপদিতে কুণ্ঠিত হন না—অভিশাপ দেন—"**তোমার রথের চক্র গ্রাসিবে মেদিনী।**" কর্ণ নির্ব্বেদের সহিত অভিশাপ গ্রহণ করেন। নিয়তি-প্রেরিত কর্ম্ম যদি,—অভিমান করিবেন তিনি কাহার উপর? কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার মনে হয়—ব্রাহ্মণ গাভীশোকে আত্মহারা, মোহাচ্ছন্ন সুতরাং মোহাচ্ছন্নের অভিশাপে—'বিন্দুমাত্র ক্ষতি নাহি হবে।' পুরুষকার মাথা তুলিয়া দাঁড়ায়—মূর্খ ব্রাহ্মণের শাপের প্রলাপে তাহার শিক্ষা নিষ্ফল হইবে তাহা তিনি ভাবিতে পারেন না। শুধু ভাবিতে পারেন না তাহা নহে ব্রাহ্মণের-ঐ "**সর্ব্বদা সর্ব্বথা সঙ্গে তার রক্ষিরূপে দেহধারী ভ্রমে নারায়ণ**—কথাটিকে ক্ষিপ্তের উক্তি বলিয়াই তিনি উপেক্ষা করেন; কারণ—'সব্বত্রগ, অনির্দ্দেশ্য, কূটস্থ অচল যেই ব্রহ্ম—আচ্ছাদন করে আছে অনন্ত ভুবন……সে পশেছে চৌদ্দপোয়া পঞ্জর-পিঞ্জরে'—এই কথা যে বলে সে "মূর্খ—মূঢ়—ক্ষিপ্ত" ছাড়া কি!

ভগবান পরশুরাম কর্ণকে খুঁজিতে খুঁজিতে সেইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হন এবং তাঁহার উদ্বেগের কারণ ব্যক্ত করেন—শব্দভেদী বাণ-শিক্ষায় কোন ক্ষত্রিয় যে সুফল লাভ করে নাই তাহার ইতিহাস শোনান।

কর্ণ সেই সব কাহিনী শুনিয়া মলিন ও বিচলিত হইয়া পড়েন। অনেক চেষ্টায় আত্ম-গোপন করিতে সক্ষম হন। পরশুরাম আনন্দিত চিত্তে কর্ণকে প্রশংসা করেন—বলেন—"কর্ণ! সহজাত কবচ-কুণ্ডলধারী তুমি—ধরাতলে সূর্যের সচল প্রতিমূর্ত্তি। পূর্ব্ব হ'তেই তুমি দেবতারও অজেয়—তার উপর এই শিক্ষা। এ ভুবনে তোমার তুল্য বীর আর হয়নি, হবে না, হ'তে পারে না।" কর্ণ বার বার গুরুকে প্রণাম করিয়া—সর্ব্বার্থসিদ্ধির আনন্দ ব্যক্ত করেন।

এই পূর্ণ সিদ্ধির মুহূর্ত্তে, নিয়তির চক্র পরশুরামের নিদ্রাবেশ এবং বজ্র-কীটের মূর্ত্তি ধরিয়া আপন গতিপথে অগ্রসর হয়। পরশুরাম কর্ণের জানুতে মস্তক রাখিয়া শয়ন করিলে বজ্রকীট জানুভেদ করিতে থাকে। গুরুর নিদ্রাভঙ্গ না হয়—এই জন্য কর্ণ "শত বৃশ্চিকের একসঙ্গে দংশন"—অচঞ্চল হইয়া সহ্য করেন। কিন্তু রক্তের স্পর্শে রাম অশুচি বোধ করেন এবং ক্রোধান্ধ হইয়া কর্ণের সত্য পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন। কারণ—ব্রাহ্মণের এত ধৈর্য্য অসম্ভব। কর্ণ সত্য পরিচয় দিয়া বলেন—"আমি সূতপুত্র" এবং 'ভার্গব' পরিচয় দেওয়ার কারণও ব্যাখ্যা করেন। পরশুরামও (তাপসের মতই) কর্ণের জন্য আক্ষেপ প্রকাশ করেন—"সহজাত কবচ-কুণ্ডল, বিমল আদিত্য-জ্যোতি মুখে, নয়নে গায়ত্রী দীপ্তি, বুদ্ধির জননী—দেবতার আকাঙ্ক্ষিত সৌন্দর্য্য-সম্পদ দেহে ধরে জীবন প্রারম্ভ পথে সর্ব্বভাগ্য দিলি বিসর্জ্জন!" কর্ণ করুণা ও ক্ষমা ভিক্ষা করেন—সূতপুত্র অপেক্ষা অধিক হীনতা যেন তাঁহার না হয়। রাম কিন্তু কিছুতেই স্বীকার করেন না—কর্ণ সূতপুত্র। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস—"সূতপুত্র কভু নহ তুমি', (বিঃ দ্রঃ—নাটক হইতে কর্ণের আসল পরিচয় কর্ণ বা পাঠক এপর্য্যন্ত কেহই জানেন না, সুতরাং পরশুরামের দৃঢ় ঘোষণা—কৌতূহল জাগায় বটে কিন্তু ইহাতে পরিচয় যিনি জানেন তাঁহার মধ্যে রসাস্বাদন

ঘটিবার যেরূপ সম্ভাবনা, যিনি না জানেন তাহার মধ্যে তেমন সম্ভাবনা নাই।) শেষপর্য্যন্ত পরশুরামের অভিশাপও বর্ষিত হয়—

সত্যই যদি হীন সূতপুত্রের শোণিতে
অশুচি হইয়া থাকি আমি,
এ পাপ না স্পর্শিব তোমারে
নহে—দ্বিজ-পুত্র জ্ঞানে জগত কল্যাণে,
যে গুহ্যাস্ত্র শিক্ষা দানে, প্রয়োগ সংহারে
তোমারে করেছি আমি অজেয় ধরায়,
রে মূঢ়, সঙ্কটকালে—বিনাশ সময়ে
সে অস্ত্র বিস্মৃত হবে তুমি।"

ইহাও কম তীব্র অভিশাপ নহে। তবে কর্ণের বিষাদ বিপুল হর্ষে পরিণত হয়, কারণ কর্ণ তো জানেন—"সত্য—সত্য—যথাব্রহ্ম সূতপুত্র আমি।" *(কিন্তু এখানেও বক্তব্য এই যে কর্ণ যে আসলে সূতপুত্র ন'ন—এই জ্ঞান পাঠক দর্শকের থাকা দরকার; না থাকিলে—অভিশাপের শোচনা তেমন জন্মিতে পারে না। নাট্যকার কর্ণের জন্ম-রহস্য ব্যক্ত করিবার সুযোগ পান নাই বা সুযোগ করিয়া লইতে চাহেন নাই। কারণ তিনি রহস্যটি পরে 'আবিষ্কার' করিতে তথা 'discovery of the unknown' জনিত আনন্দ সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছেন! এইরূপ ক্ষেত্রে এই রীতি কতখানি সফল হয় বা হইয়াছে পরে আলোচনা করা যাইতেছে)।

দেখা যাইতেছে কর্ণের 'পশ্চাতের আমি'তে আছে—(ক) ধনঞ্জয়-প্রতি স্পর্দ্ধিতা (খ) "নারায়ণ নরদেহধারী। দেহরক্ষী গাণ্ডীবীর"—এই সত্যের প্রতি অবিশ্বাস (গ) সহজ কবচকুণ্ডলধারী, সুতরাং দেবতারও অজেয়—এই অভিমান। (ঘ) 'গো বধ' জনিত অভিশাপের স্মৃতি (ঙ) গুরু-অভিশাপের স্মৃতি এবং তদনুপাতী 'রাধেয়'—পরিচয়ের প্রতি প্রসক্তি।

এই "পশ্চাতের-আমি"-যুক্ত কর্ণকে প্রথমেই হস্তিনার সভামণ্ডপে—

'দুর্য্যোধন-সখা' রূপে দেখা যায়। নর-নারায়ণত্বে-অবিশ্বাসী কর্ণ ভীষ্মের উক্তি—"ধনঞ্জয়-বাসুদেব—মায়াতিমানব

পূর্ব্বদেহে দুইঋষি নর-নারায়ণ

এক আত্মা দ্বিধাভূত ভিন্ন রূপে"—শুনিয়া উপেক্ষা প্রকাশ করেন; "নর-নারায়ণ—অশ্রদ্ধেয় মূল্যহীন...... প্রলাপবাক্য।" ভীষ্ম কর্ণকে—'হীনজাতি সূতপুত্র' বলিয়া তিরস্কার করেন বটে কিন্তু কর্ণ আত্মশ্লাঘা প্রকাশ করিয়া দুর্য্যোধনকে যুদ্ধ করিবার জন্য প্ররোচনা দান করেন।

'দুর্ম্মতি সূতপুত্র'—কর্ণের আত্মশ্লাঘাকে ভীষ্ম আঘাত করেন—পাণ্ডবদের শক্তির প্রশংসা করিয়া এবং (গো-গ্রহণে ও ঘোষযাত্রা পর্ব্বাধ্যায়ে বর্ণিত) কর্ণের কাপুরষতার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া। বাক্‌যুদ্ধে কর্ণও পশ্চাৎপদ হন না। নাট্যকার কর্ণের কাপুরুষতাকে অ-মহাভারতীয় যুক্তির দ্বারা ঢাকিতে চেষ্টা করিয়াছেন—দেখাইয়াছেন গো-গ্রহণের ব্যাপারে কর্ণ নারীবেশী (বৃহন্নলার) সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করেন নাই, আর ঘোষযাত্রায় গন্ধর্ব্বগণের সহিত যুদ্ধ করেন নাই—"নারীহত্যা"র ভয়ে অর্থাৎ গো-হত্যার উপর নারীহত্যা করিয়া কর্ণ আর পাপ বৃদ্ধি করিতে চাহেন নাই। কর্ণের যুদ্ধ কামনা যেন আত্মশ্লাঘারূপে আত্মপ্রকাশ করিতে থাকে। দুর্য্যোধন যখন বলেন—'বিনা যুদ্ধে আমি সূচ্যগ্র প্রমাণ ভূমি দিব না পাণ্ডবে', কর্ণ "সাধুবাদ দ্বারা দুর্য্যোধনকে উৎসাহ তথা যুদ্ধের প্ররোচনা দান করেন'॥ বীরদর্পে কর্ণ মুখর—"সৈন্য ল'য়ে একা আমি যাব রণস্থলে। অর্জ্জুন বধের ভার লইলাম আমি।" অর্জ্জুন-প্রতিদ্বন্দী কর্ণ অর্জ্জুনকে বধ করিয়া অপ্রতিদ্বন্দীর কীর্ত্তি লাভ করিতে উৎসাহিত কিন্তু ভীষ্মের তিরস্কারে—"ওরে কাল-হত-বুদ্ধি কর্ণ। ওরে হীন সূতপুত্র, আত্মশ্লাঘা কর কা'র কাছে? (কাল-হত-বুদ্ধি কর্ণ। তুমি কেন আত্মশ্লাঘা করিতেছ?—মহাভারত), কর্ণ ক্ষুব্ধ হইয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া অস্ত্র পরিহার করেন—প্রতিজ্ঞা করেন—'যতদিন জীবিত রবেন পিতামহ, ততদিন কেহ না দেখিবে মোরে কৌরব সভায়, কেহ না দেখিবে দাঁড়াইতে রণাঙ্গণে। যে দিন সমরে পড়িবে

পিতামহ। সেইদিন অস্ত্র পুনঃ করিব গ্রহণ॥" এবং সঙ্গে সঙ্গে অর্জ্জুন-নাশ সঙ্কল্প করিয়া—দানব্রত গ্রহণ করেন।—"দেব, নর দ্বিজ দ্বিজেতর—যে কেহ প্রার্থী আসিয়া আমার বাসে, যে বস্তু করিবে ভিক্ষা থাকিতে আমার দেয়, না করিব নিরস্ত তাহারে॥" (মহাভারতে এখানে কোন ব্রত গ্রহণের কথা নাই এবং কর্ণের দানব্রতের সহিত অর্জ্জুন-নাশ সঙ্কল্পেরও কোন যোগ নাই। কর্ণ স্বভাব-দাতা এবং তাহাতেই তাঁহার মহত্ব) গুরু অভিশাপের স্মৃতি জাগিয়া যায়—রাধেয়-পরিচয়ই যে কর্ণের অন্যতম রক্ষা-কবচ। যতক্ষণ তিনি 'রাধেয়' ততক্ষণ তিনি অপরাজেয়—ব্রহ্মাস্ত্রের অধিকারী তাই কর্ণ 'সূতপুত্র' তিরস্কারে গর্ব্ব অনুভবই করেন এবং সেই অভিমানেই 'সর্ব্ব সভাস্থ মণ্ডলী'কে জানাইয়া দেন—"সত্য যদি হই আমি রাধার নন্দন। সত্য যদি অধিরথ পিতা·········এই সূতপুত্র-কর-ক্ষিপ্ত বাণের প্রহারে, ওই॥ তব গাণ্ডীবীর নিশ্চয় বিনাশ॥" [**নর-নারায়ণে—অবিশ্বাস+অর্জ্জুন-প্রতিদ্বন্দ্বিতা+"গুরু-অভিশাপ"—স্মৃতির প্রেরণায় "রাধেয়"-অভিমান ও আত্মশ্লাঘা**—এই তিন প্রবণতা প্রদর্শিত হইয়াছে]।

বাসুদেব—নারায়ণ,—'ধনঞ্জয়-বাসুদেব—নর-নারায়ণ'—কর্ণ এ কথা এতদিন বিশ্বাস করেন নাই বটে, কিন্তু, কৃষ্ণ দূত হইয়া হস্তিনায় আসিতেছেন—এই সংবাদ শুনিয়া, কর্ণের মধ্যে, অন্তরাত্মার বা মর্ম্মের নারায়ণ-প্রবণতা—'বিশ্বাস' এবং বুদ্ধির 'অবিশ্বাস' মিলিয়া একটি মহান্দোলন উপস্থিত হয়। 'বুদ্ধির "যদি" যদিও লোপ পায় না—"বাসুদেব! তুমি যদি সেই নারায়ণ, যদি এই অসম্ভব সত্যই সম্ভব হয়—ওই ক্ষুদ্র দেহের ভিতরে বিরাট পশিয়া করে লীলা"—তবু কর্ণের হৃদয় কিন্তু নারায়ণদর্শন-পরায়ণ। কর্ণের স্থির বিশ্বাস কোন দেহ-আবরণই, হৃদয়ে নারায়ণ দর্শনে বাধা দিতে পারিবে না। কর্ণের গভীর-গোপন বাসনা প্রকাশ পায়—এখানেই তাঁহার 'দানব্রত'-গ্রহণের এবং অর্জ্জুন প্রতিদ্বন্দ্বিতার নিগূঢ় কারণটি জানা যায়। কর্ণ ব্যক্ত করেন—এই সত্য আবিষ্কারের করেছি সর্ব্বস্ব দানপণ। এই সত্য আবিষ্কারে

আমি জীবন-মরণ যুদ্ধ করিতে চলেছি। একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী তোমার সখায়।" অর্থাৎ কর্ণ অন্তরের নারায়ণ পরায়ণতা বশেই যেন অর্জ্জুনের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে চাহেন (বিঃ দ্রঃ—আগের অর্জুন-প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রাণ-ধর্ম্মের প্রেরণা হইতে ; এখনকার প্রতিদ্বন্দ্বিতার উৎস আরো গভীরে—নর-নারায়ণের সাক্ষাৎকারের আবেগই ইহার উৎস।) যুদ্ধ দ্বারাই তিনি সত্য আবিষ্কার করিতে চাহেন। কর্ণ "দেবেরও অবধ্য" সুতরাং মায়া-মনুষ্য-নারায়ণ-এর ও অবধ্য। সেই "কবচকুণ্ডলধারী রাধার নন্দন" কর্ণ যদি বাসুদেব-সখা অর্জ্জুনের বাণে মরেন, তবেই তিনি বুঝিবেন বাসুদেব নারায়ণ॥ যুদ্ধ দ্বারাই তিনি ধনঞ্জয়-বাসুদেবের নর-নারায়ণত্ব যাচাই করিয়া লইতে চাহেন। [নারায়ণ কামনাই ধনঞ্জয় তথা বাসুদেব-বিরোধিতা রূপে প্রকাশিত]

কৃষ্ণের আগমনে পরীক্ষার সেই শুভদিন সমাগত। এই আনন্দ, স্ত্রী পদ্মাবতীর কাছে ব্যক্ত করিতে করিতে কর্ণ 'নিরুত্তর' ও শূন্যদৃষ্টি 'অন্যমনা' হইয়া পড়েন। কর্ণ পদ্মাকে আজ সব গোপন কথা শুনাইতে প্রস্তুত।

পদ্মার তীব্র একটি কৌতুহল—অতুল শক্তিধর কর্ণ বর্ত্তমানে দীন দ্বিজবেশী ধনঞ্জয় পাঞ্চালীরে কিভাবে লাভ করিল। কর্ণ পাঞ্চালীর স্বয়ম্বর-সভার ঘটনা—সঙ্গে জন্ম-অভিশাপ—জনিত বেদনাও ব্যক্ত করেন॥ পদ্মার দ্বিতীয় কৌতূহল—সভামধ্যে দ্রৌপদীর লাঞ্ছনা-বিষয়ে। কর্ণ স্বীকার করেন—"সমগ্র জগতবাসী কভু করিবে না/আমার সে কার্য্য সমর্থন—করিবে না—করিতে পারে না।" সে এক অশুভ দিন। কর্ণ অন্যায় কার্য্যের জন্য অনুতাপ (মহত্বও বটে) প্রকাশ করেন। কিন্তু পদ্মার কাছে কর্ণের বক্তব্য অত্যন্ত নিগূঢ়......অন্তরের কথা।" এবং সেই অন্তরের কথা—'যেদিন দ্বৈরথযুদ্ধে নিধন করিব আমি তৃতীয় পাণ্ডবে, সেদিন জানিব পদ্মাবতী শস্ত্রশিক্ষা সকল আমার।" পদ্মাবতী কর্ণের এই অর্জ্জুন-বিদ্বেষের নিগূঢ় কারণ বুঝিতে পারেন না, প্রশ্ন করেন—'কি হেতু জন্মিল প্রভু এমন বিদ্বেষ।' কর্ণ জানান—বিদ্বেষ কিছুই নাই, ধনঞ্জয়কে অন্তরে অন্তরে তিনি বীরত্বের জন্য শ্রদ্ধা করেন। শুধু শ্রদ্ধাই নয়, ধনঞ্জয়কে

দেখিলে তাহার হৃদয়ে প্রীতি জাগে। কৌন্তেয়-সত্তা তাহার অজ্ঞাতসারেই সক্রিয় হইয়া উঠে। কিন্তু তবু অর্জ্জুনের সহিত শক্তি-পরীক্ষা তাহাকে করিতেই হইবে—দেবেরও অবধ্য'—ইহা সত্য কিনা সে পরীক্ষা অবশ্যই করিতে হইবে—যুদ্ধ-কামনার কারণ কর্ণ নিজেই ব্যাখ্যা করিয়া বলেন—"দেবের ও অবধ্য আমি। অলস্ত সঙ্কল্প সেই হেতু নিত্য মোরে করে উত্তেজিত যুঝিতে দ্বৈরথ-যুদ্ধে ধনঞ্জয় সনে॥" ইহার অধিক ভাগ্য তিনি চাহেন না—এই শক্তি-পরীক্ষার বিনিময়ে তিনি বিশ্বের কর্ত্তৃত্বও কামনা করেন না। যুদ্ধের প্রলোভন তাহার ঐকান্তিক। তাইতো কর্ণ দুর্য্যোধনকে যুদ্ধের প্ররোচনা দেন—জীবিত থাকিতে সূচ্যগ্র প্রমাণ ভূমিও দিতে দিবেন না। ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধ তাহার অবশ্যই চাই—কারণ 'পশ্চাতে তাহার'—বাসুদেব।—'অতি অশ্রেদ্ধয় বাণী' বলিয়া কর্ণ হাসিয়া উড়াইতে চাহেন বটে, কিন্তু পদ্মা যে ঋষিশ্রেষ্ঠ ব্যাস, সত্যবাদী পিতামহ এবং সর্ব্বার্থদর্শী মহাত্মা সঞ্জয়ের নিকট ঐ বার্ত্তা শুনিয়াছেন। অবিশ্বাসের কোটি হইতে মন বিশ্বাসের কোঠির দিকে অগ্রসর হয়। কর্ণের নিগূঢ় কামনাটুকু ব্যক্ত হয়—"দ্বিগুণ উৎসাহে তবে, দ্বিগুণ আনন্দে......বাসুদেব-সখা ধনঞ্জয়ে জীবন মরণ যুদ্ধ করিব আহ্বান।" কারণ—"ধনঞ্জয়-বাসুদেব নর-নারায়ণ" ইহা কর্ণ সম্পূর্ণ অন্তর দিয়া বিশ্বাস করেন না। এই সম্বন্ধে তাহার মন দ্বিধা-গ্রস্ত ; তাঁহারা নর-নারায়ণ কিনা—যুদ্ধ করিয়া তিনি পরীক্ষা করিতে চাহেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মনে জাগে পরশুরামের অভিশাপের স্মৃতি—যতক্ষণ তিনি রাধেয় ততক্ষণ 'দেবেরও অবধ্য' তিনি। ধনঞ্জয়-বাসুদেব নর-নারায়ণ হইলেও কর্ণ নর-নারায়ণকেও পরাস্ত করিবার আশা রাখেন। অবচেতন মন হইতে তাই বার বার সন্দেহের ? বুদবুদ জাগে—"সত্য আমি হই যদি রাধার নন্দন।" [পদ্মাবতী কর্ণের এই উক্তিকে 'সহসা জাগিয়া ওঠা......সন্দেহ বলিলেও, ইহাকে 'সন্দেহ' না বলিয়া অভিশাপের স্মৃতি হইতে উদ্গত—,'অবধ্য'ত্বের অভিমান বলাই যেন ঠিক। কারণ "রাধেয়"-পরিচয় লইয়া সন্দেহ তাহার মনে এ পর্য্যন্ত জাগে নাই]।

কর্ণ বাসুদেব-সখা ধনঞ্জয়ের সহিত জীবন-মরণ যুদ্ধ কামনা করেন। সুতরাং সন্ধির প্রস্তাবকে তিনি আশঙ্কার চোখেই দেখেন। তাই তাঁহার ভবনে "দুর্য্যোধন-দুঃশাসন-শকুনি'র আগমন সংবাদ শুনিয়া কর্ণ ভাবিত হইয়া পড়েন— "বাধা কি পড়িল যুদ্ধে?—অন্ধরাজা মোর অসাক্ষাতে পাণ্ডবে কি/স্তবে অর্দ্ধ-রাজ্য দানে করিল স্বীকার। এই শঙ্কিত প্রশ্নই মনে জাগে। দুর্য্যোধন সমর-সঙ্কল্পে অটল জানিয়া কর্ণ নিশ্চিন্ত হন এবং কৃষ্ণকে বন্ধন করিয়া হস্তিনার কারাগারে আবদ্ধ করিবার তথা যুদ্ধকে অনিবার্য্য করিবার পরামর্শ দেন। দুর্য্যোধন আগেই বন্ধনের সঙ্কল্প করিয়া আসিয়াছেন,—কর্ণের পরামর্শ একরূপ লুফিয়াই ল'ন আর কর্ণও চিরকাম্য যুদ্ধের পথ প্রস্তুত করিতে পারিয়া নিশ্চিন্ত হন॥ কিন্তু অন্য চিন্তা মনকে অধিকার করিয়া বসে—কৃষ্ণের এ কী দুঃসাহস দুর্য্যোধন একাদশ অক্ষৌহিণী-পতি, তদুপরি দুর্মতি। এ সমস্ত জানিয়াও কৃষ্ণ হস্তিনা নগরে একাকী আসিয়াছেন। "এ সাহস যার—হয় সে নিতান্ত জড় নর-নারায়ণ॥" ইহারও গভীরে—কৃষ্ণের বাণী শুনিতে পাইবেন না—কৃষ্ণের রূপ দেখিতে পারিবেন না—এ জন্য কর্ণের মনে আক্ষেপ জন্মে; তবে সান্ত্বনা লাভ করেন এই মনে করিয়া যে বাসুদেব যদি অন্তর্যামী হন' তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাঁহার অন্তরের ইচ্ছা তিনি অবগত হইবেন।—বলিতে বলিতে কর্ণ নিদ্রাচ্ছন্ন হইয়া শয়ন করেন। দেখেন তাঁহার "চারিদিকে—জ্যোতির উৎসব" চলিতেছে; তাহার মধ্যে বাসুদেবের নবীন নীরোদ শ্যাম আয়তলোচন কিশোর মূর্ত্তি। এখন কর্ণের অন্তরতম সত্তা—কৃষ্ণপরায়ণ-সত্তাটি জাগ্রত। সংজ্ঞান মন-বুদ্ধির নিদ্রাবকাশে, অন্তরতম বিশ্বাসী সত্তার কণ্ঠে ধ্বনিত হয়—"কে বাঁধিবে? কে বেঁধেছে কবে?" কর্ণ "বুদ্ধি" অধিকারে স্বীকার না করিলেও, "মর্ম্ম"-অধিকারে বাসুদেবকে নারায়ণ বলিয়া স্বীকার করেন। (কৃষ্ণ দর্শনের কালব্যাপ্তি খুবই সামান্য) তবে কর্ণ শুধু বাসুদেবকেই দেখেন না; এ স্বপ্নালোকে স্বপ্নচোখে সূর্য্যকেও দেখেন—স্বপ্নকর্ণে সূর্য্যের কথাও শোনেন—স্বপ্নমুখে সূর্য্যের সহিত কথাবার্ত্তাও বলেন। সূর্য্য কর্ণকে স্নেহবশে মায়াবশে সাবধান করিতে

আবির্ভূত হন—সাবধান করিয়া বলেন—যদি জীবিত রহিতে থাকে বাসনা তোমার/ইচ্ছা থাকে দ্বৈরথ সমরে, প্রতিযোদ্ধা অর্জ্জুনে করিতে পরাজয়...... দিয়ো না বাসবে ওই কবচকুণ্ডল" কিন্তু ধর্মনিষ্ঠ কর্ণের কাছে—দাতাকর্ণের কাছে প্রাণের ও মানের অপেক্ষাও ধর্ম্ম বড়। ব্রতভঙ্গ করিয়া, সত্যের আশ্রয়চ্যুত হইয়া তিনি এক মুহূর্ত্তও বাঁচিতে চাহেন না—এমন কি অর্জ্জুনকে পরাজিত করিবার চিরবাঞ্ছিত গৌরব পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে প্রস্তুত। কর্ণ মনে করেন ইষ্ট সবিতা স্নেহবশেই বোধ হয় সতর্ক করিতে আসিয়াছেন কিন্তু সূর্য্য যখন বলেন—"হে সন্তান, মায়াবশে", কর্ণের বিস্ময় ও কৌতূহলের অবধি থাকে না। কর্ণ "দৈবকৃত রহস্য" জানিবার জন্য ব্যাকুল হন। কিন্তু রহস্য শুনানো হয় না; কর্ণ জাগিয়া উঠেন—পদ্মাবতীকে 'বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ'কে খুঁজিয়া দেখিতে বলেন—তাঁহার ব্যাকুলতা যায় না। দ্বিজবেশী সবিতার উদ্দেশে কাতর প্রার্থনা জানান—"হে সবিতা রহস্য শুনায়ে যাও মোরে॥" পদ্মাবতী দ্বিজবেশী ইন্দ্রকে লইয়া প্রবেশ করেন (পূর্ব্বের কৌতূহল অকস্মাৎ প্রশমিত)। ইন্দ্র কবচকুণ্ডল প্রার্থনা করেন—কর্ণ কবচকুণ্ডল-বিনিময়ে সুবর্ণ, প্রমদা, ধেনু, সাম্রাজ্য পৃথিবী সব দিতে চাহেন। কিন্তু ইন্দ্র কবচ কুণ্ডল ছাড়া আর কিছুই লইবেন না। অগত্যা কর্ণ "ছুরিকাযোগে কবচকুণ্ডল ছিন্ন করিয়া ইন্দ্রকে প্রদান" করেন। ইন্দ্র দাতাকর্ণের মহত্ত্ব দেখিয়া শ্রদ্ধায় অবনত হন এবং "একঘ্নী" অস্ত্র দান করিয়া প্রস্থান করেন। *[কর্ণ-চরিত্র-চিত্রনে এখানে যে ত্রুটি লক্ষিত হয় তাহা এই যে এক বিষয় হইতে অন্য বিষয়ে পরিক্রমণের সন্ধিস্থলে যেরূপ মানসিক অবস্থা প্রত্যাশিত তাহা পাওয়া যায় না। স্বপ্নের আরম্ভ বাসুদেব-দর্শনে, সামান্য একটু ক্ষণের বাসুদেব-দর্শনের পরেই সূর্য্য-দর্শন আর সূর্য্যদর্শনের সঙ্গে সঙ্গেই বাসুদেবদর্শনের প্রতিক্রিয়া শুরু; আবার সূর্য্যদর্শনের পরেই জাগ্রত অবস্থায় দ্বিজবেশী ইন্দ্রের সহিত কথোপকথন—এবং স্বপ্নের প্রতিক্রিয়া অস্তমিত। পরেও ইহা লইয়া তেমন কোন মানসিক বা প্রতিক্রিয়া দেখানো হয় নাই]।

শ্রীকৃষ্ণ কুরুসভায় বিশ্বরূপ প্রদর্শন করিয়া নারায়ণের অলৌকিক মহিমা

দেখাইয়া সভা হইতে বিদায় লইলে দুর্য্যোধন যুদ্ধের উদ্যোগ করেন এবং ভীষ্মকে সেনাপতি পদে বরণ করেন। প্রশ্ন উঠে কে কতদিনে পাণ্ডবের সপ্ত অক্ষৌহিণী নাশ করিতে পারিবেন? ভীষ্মের উত্তর—একমাসে, দ্রোণেরও একই উত্তর। কৃপাচার্য্য পারিবেন—দুই মাসে, অশ্বত্থমা পারিবেন—দশদিনে কর্ণ বলেন—তিনি পারিবেন পাঁচদিনে। কর্ণের আত্মশ্লাঘা শুনিয়া ভীষ্ম উত্তেজিত হইয়া উঠেন এবং কর্ণকে তিরস্কার করেন—অবশ্য কর্ণের আত্মশ্লাঘা বন্ধ হয় না—'একঘ্ন' বাণের সংহার-শক্তির দম্ভে, কর্ণ মুখর হইয়া উঠেন।

ওদিকে কৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শনের পরে সকলেই চিন্তিত। চিন্তিত দুঃশাসনকে কর্ণ বুঝাইয়া দেন—বিশ্বরূপ প্রদর্শন নিপুণ বাজীকরের মোহিনী-মায়ামাত্র;—ভীষ্ম বিদুর পূর্ব হইতেই সম্মোহিত; কৃষ্ণ যাহা দেখিতে বলিয়াছেন তাহাই দেখিয়াছেন। ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ—'যা শুনেছেন কানে, অন্তর্দৃষ্টি দিয়া তাই করেছেন দর্শন।' কর্ণের ভয়—"অদর্শন অবকাশে যদি সন্ধি করে ফেলে রাজা"।

দুঃশাসন চলিয়া গেলে কর্ণ বিষণ্ণা পদ্মাবতীকে প্রবোধ দিতে চেষ্টা করেন এবং দেবেন্দ্রকে ধিক্কার দিতে নিষেধ করেন কারণ দেবেন্দ্র কবচকুণ্ডল হরণ করিয়া কর্ণকে একরূপ দয়াই করিয়াছেন—একটি মর্ম্মপীড়ক অশান্তি হরণ করিয়া লইয়াছেন—"নিভৃত চিন্তার এক নিষ্ঠুর প্রহার" হইতে কর্ণকে নিষ্কৃতি দিয়াছেন। এই নিভৃত চিন্তা—'সেই চিরঘৃণ্য রাধার নন্দন, আমারে কি হেতু···দেবতাদুর্ল্লভ এই দান?' সহজ কবচকুণ্ডল লইয়া অর্জ্জুনকে বধ করিলে অভিজাতরা চীৎকার করিত—"হীন সূতপুত্র বধেনি অর্জ্জুনে। বধেছে তাহার ঐ কবচ-কুণ্ডল? এখন আর সে কথা কেহ বলিতে পারিবে না। কর্ণ এখন পুরুষকার-সর্ব্বস্ব। যতক্ষণ 'রাধেয়' উপাধির অধিকারী—রামশিষ্য কর্ণকে পরাজিত করিবে কে? পদ্মাবতীকে কর্ণ উল্লাস করিতে বলেন, কর্ণের গৃহিনীর মুখে বিষাদ মানায় না। কিন্তু পদ্মাবতীর মনের সংশয় কাটে না। পরাজয়ের সংশয়? পরাজয় হইবে—কর্ণ সে কথা ভাবিতেই পারেন না। সুতরাং পদ্মাবতীর সংশয়ের কারণ খুঁজিয়া পান না। মনে সংশয় আসিলে পদ্মাবতী যেন তখনই শুনাইয়া

দেন—"স্বামী মোর মহীয়সী রাধার নন্দন।" পদ্মাবতী খুশিতাই বলেন অনেকটা দিব্য-দৃষ্টি লইয়াই বলেন—মনে হয় সংশয়ের মূল যেন নিহিত রয়েছে ...তোমার রাধেয় পরিচয়ে। মনে হয় ওই পরিচয়-গর্ভে তোমার সমস্ত শক্তি রয়েছে নিহিত।' কর্ণ পদ্মাবতীর কথা স্বীকার করেন—স্বীকার করেন—"যত কিছু শক্তি মোর সমস্ত ওই 'রাধেয়' সজ্ঞায়।" পদ্মাবতীর মনে 'তবে কি' অর্থাৎ তবে কি তুমি 'রাধেয়' নও—এই প্রশ্ন জাগিতেই কর্ণের মাতৃস্নেহাতুর রাধার অপূর্ব্ব মাতৃস্নেহের কথা মনে জাগে—পদ্মাবতীকে রাধেয়-পরিচয়ে সন্দেহ—মৃত্যুভয় ত্যাগ করিতে বলেন—বলেন—"নারীশিরোমণি রাধা জননী আমার।"

এই সময়েই অন্তর্য্যামী নারায়ণ কৃষ্ণ কর্ণের সহিত দেখা করিতে উপস্থিত হন, পরোক্ষভাবে কর্ণ কৃষ্ণকে নারায়ণ বলিয়াই সম্বোধন করেন—বৃষকেতুকে পাঠাইয়া পদ্মাবতীকে সংবাদ দিতে বলেন—'বল তারে এসেছে তাহার ঘরে। বিনা নিমন্ত্রণে তার নারায়ণ"। কর্ণ মর্মে মর্মে কৃষ্ণকে 'দিব্য' পুরুষ বলিয়াই মানেন কিন্তু কৃষ্ণ কর্ণকে 'আর্য্য' সম্বোধন করিয়া নমস্কার জানাইলে কর্ণ বিস্মিত হন—মুগ্ধ হন, মনে করেন—ঐন্দ্রজালিক কৃষ্ণ তাহাকে ঐভাবে মন্ত্রমুগ্ধ করিতে চাহেন! তাই তিনি দৃঢ়ভাবেই তাঁহার 'রাধেয়' পরিচয় ঘোষণা করেন।

কৃষ্ণ জানাইয়া দেন—কর্ণ রাধার নন্দন নহে। এই কথা শুনিয়াই কর্ণের সর্ব্বেন্দ্রিয় শিথিল হইয়া পড়ে। কিন্তু অবিশ্বাস করিবেন তাহারও উপায় নাই—কথা যে 'সত্য-আবির্ভাব' কৃষ্ণের কথা। আর সে কথা যে ব্রহ্মাস্ত্রের শক্তি লইয়া কর্ণের বুক বিদীর্ণ করিয়া দিয়াছে—কর্ণকে সকলের বধ্য করিয়া তুলিয়াছে। কথা শুনিয়া কর্ণ বসিয়া পড়েন, কৃষ্ণের মুখ হইতে আর একবার তাহার পরিচয় জানিতে চাহেন। কৃষ্ণ জন্ম-রহস্য ব্যক্ত করিতেই কর্ণ উঠিয়া দাঁড়াইয়া কৌতূহল-কাতর প্রশ্ন করেন—আর্ত্তনাদের স্বরেই জিজ্ঞাসা করেন—"জানিয়া পরম শত্রু মোরে বধিতে কি এলে কৃষ্ণ? গাণ্ডীবীর বাণের চেয়েও যে এই পরিচয়-কথা সুতীক্ষ্ণ ও মর্মান্তিক। কৃষ্ণ কর্ণের সম্মুখে—সিংহাসনের এবং

পাণ্ডবদের সেবার প্রলোভন তুলিয়া ধরেন। প্রতিদানে কর্ণ কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করেন, স্নেহবশে শ্রীঅধরে চুম্বন করেন এবং নরোত্তম কৃষ্ণকে তাহার প্রকৃতির কথা স্মরণ করাইয়া দেন—একটি অনুরোধও জানান—'যতদিন নাহি মরি আমি, এ নিষ্ঠুর ইতিহাস শুনায়ো না তাঁরে' কারণ যুধিষ্ঠির এ কথা শুনিলেই গলবস্ত্রে পূজা করিতে ছুটিয়া আসিবেন—যুধিষ্ঠিরের অনুরোধ উপেক্ষা করা তাঁহার দ্বারা সম্ভব হইবে না। আর তাহা না হইলে কর্ণের সঙ্কল্প চূর্ণ হইয়া যাইবে॥ কর্ণের মধ্যে আবার 'রাধেয়' অভিমান প্রবল হয়। 'কৌন্তেয়' বলিয়া আহ্বান করিতে কৃষ্ণকে নিষেধ করেন। অভিমানের ক্ষোভে কর্ণের হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে—পৃথিবী রসাতলে চলিয়া গেলেও তাহার কোন চিন্তা নাই—বরং তাহাই তিনি চাহেন॥ কৃষ্ণ মনঃক্ষোভের কথা বলিলে কর্ণ কৃষ্ণের কাছে সেই মনঃক্ষোভের স্বরূপটি—ক্ষোভের তীব্রতার মাত্রা জানিতে চাহেন—বুঝাইতে চাহেন তাহার মনঃক্ষোভের সহিত তুলনা হতে পারে এমন মনঃক্ষোভ কোথাও নাই। এমন দ্বন্দ্বের সম্মুখীন কে কবে হইয়াছে স্বর্গ-মূল্যহীনকরা' কৃষ্ণের ভ্রাতৃত্ব গ্রহণ করিতে তিনি অশক্ত; যে অর্জ্জুনকে প্রতিযোদ্ধাজ্ঞানে এতকাল নির্ধন করিতে চাহিয়াছেন, অদৃষ্টের নিষ্ঠুর—পরিহাসে—সেই অর্জ্জুন তাঁহার কনিষ্ঠ সোদর। মুগ্ধ আলিঙ্গনে যাহাকে বক্ষে ধারণ করিবেন সেই প্রাণাধিক ধনঞ্জয়ে মর্ম্মহীন শরে বিঁধিতে হইবে। কর্ণের জীবনে ধর্ম্মের, সত্যের এবং মনুষ্যত্বের জটিল দ্বন্দ্ব উপস্থিত।—"ধর্ম্ম চায় পরাজয় সত্য চায় জয়, মনুষ্যত্ব চায় নিষ্ঠুরত।

* * * *

অজেয় মহাবীর ভীষ্মের পতনের পর দ্রোণাচার্য্য সেনাপতি হইয়াছেন। কর্ণের মনে চিন্তা—"ভীষ্ম যাহা পারিল না, দ্রোণ যাহা পারিবে না, সেই কার্য্য অর্জ্জুন-বিনাশ—আমি কি পারিব?" রাধেয় ও কৌন্তেয় সত্তার মধ্যে দ্বন্দ্ব বা বুঝাপড়া চলে। কৌন্তেয়ের যত দুর্বলতা, রাধেয়ের তত সঙ্কল্প—অর্জ্জুনের সহিত কর্ণের রক্তের সম্পর্ক—তবু তিনি অর্জ্জুন-বিনাশে সমর্থ

হইবেন। তিনি যে হীন সূতপুত্র—রাধেয়। বালক অভিমন্যুকে—পুত্রকে, যদি তিনি বধ করিতে পারিয়া থাকেন—অভিমন্যুর পিতা অর্জ্জুনকেও পারিবেন। কর্ণ কৌন্তেয়ের দুর্বলতা জয় করিবার জন্য রাধেয় সত্তাটিকে উত্তেজিত রাখিতে চেষ্টা করেন—অর্জ্জুনকে অভিজাত রাজপুত্র বলিয়া তাঁহার সহিত সমস্ত সম্পর্ক মুছিয়া ফেলেন এবং অর্জ্জুন বধের জন্য সঙ্কল্পকে একাগ্র করিয়া তুলেন।

এই চিন্তা ছাড়া আর একটা ঘটনাও কর্ণের মধ্যে ভাবান্তর সৃষ্টি করিয়াছে। ঘটনাটি জয়দ্রথ-বধ।" আশ্চর্য্যকর এবং অলৌকিক ব্যাপার—বাসুদেবের নারায়ণত্ব-জ্ঞাপক ঘটনাই বটে—"সূর্য্য ঢেকেছিল সুদর্শন।" এই কারণেই কর্ণের মুখ "বড়ই গম্ভীর হইয়াছিল।" কিন্তু তবু কর্ণ কেশবকে নর বলিয়াই মনে করেন এবং বলেন—"সত্য যতদিন নিজে নাহি উপলব্ধি করি, ততদিন বিধাতাও দিলে সাক্ষী, মানব বলিব বাসুদেবে।" তবে স্বীকার করেন—'আসে নাই আর—এই পূর্ণ মাণবত্তা"। স্ত্রীর সহিত পরিহাস ছলে কর্ণ কৃষ্ণকে নারায়ণ-জ্ঞানে প্রণাম করেন—(বুদ্ধির বাধা এবং মর্মের সহজ প্রবণতার মধ্যে সূক্ষ্ম দ্বন্দ্বের চমৎকার নিদর্শন)।

কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গণ হইতে কৌরবের মরণ চীৎকার কর্ণে প্রবেশ করে—কর্ণ বুঝিতে পারেন—জয়দ্রথকে বধ করিয়া অর্জ্জুন কর্ণকেই অনুসন্ধান করিতেছেন। পদ্মাবতীকে সান্ত্বনা দেওয়ার ছলে নিজের গোপন আকাঙ্ক্ষাও ব্যক্ত করেন—'তোমার সেই ইষ্ট নারায়ণে—যদি আজ প্রাণ মোর দিই উপহার ......। কর্ণের পরাজয় পদ্মাবতী যেমন কল্পনা করিতে পারেন না, কর্ণ নিজেও পারেন না কিন্তু—সকলের উপরে—যে নিয়তি; "নিয়তির কার্য্য কোন-কালে হয় নাই, মানবের কল্পনা-চালিত।"

এদিকে নিজের মৃত্যু যেমন অকল্পনীয়, তেমনি অন্যদিকে ধনঞ্জয়ের মৃত্যুর কল্পনা কর্ণের কাছে বেদনাদায়ক। প্রহেলিকার মত শুনাইলেও—তিনি পদ্মাবতীকে অজস্র অশ্রুর ধারায় কৌন্তেয়ের তর্পণ করিতে বলেন। প্রহেলিকা কি শুধু ইহাই? এক-বিঘাতিনী শক্তি লাভ করিবার দিন হইতেই কর্ণ

রাত্রিকালে মনে করেন—'এই অস্ত্র সঙ্গে ল'য়ে যাব রণস্থলে' কিন্তু আশ্চর্য্যেরই ব্যাপার—শয্যাত্যাগকালে যেই তিনি ইষ্টকে স্মরণ করেন, অমনি কেশব আসিয়া সম্মুখে দাঁড়ান এবং সব সঙ্কল্প হারাইয়া যায়—"অস্ত্র-কথা মুছে যায় স্মৃতি হ'তে।" এই কারণে আজ কর্ণ আগে হইতেই বক্ষের পঞ্জরের সঙ্গে অস্ত্র বাঁধিয়া রাখিয়াছেন। অর্জ্জুন-বধ—অনিবার্য্য। এক-বিঘাতিনী থাকিতে, অর্জ্জুনকে রক্ষা করিবার সাধ্য কেশবেরও নাই। কিন্তু নিয়তির পরিহাসে কর্ণের মুখেও হাসি দেখা দেয়—যাঁহার বিরুদ্ধে এত আয়োজন সেই ধনঞ্জয় যে তাঁহার সোদর! পদ্মাবতীকে তিনি জানাইয়া দেন—'ধনঞ্জয় দেবর তোমার' —তিনি 'রাধেয়' ন'ন—'কৌন্তেয়'।

পত্নীর নিকট হইতে কর্ণ বিদায় গ্রহণ করেন—ধনঞ্জয়-বধের সঙ্কল্প লইয়া। কিন্তু নিয়তির চক্রান্তে—দুর্য্যোধনের অনুরোধে 'ঘটোৎকচ'কে বধ করিতেই একঘ্ন অস্ত্র প্রয়োগ করিতে হয়। কৃষ্ণের চক্রান্তে কর্ণের শেষ সম্বলটুকুও এইভাবে হাতছাড়া হইয়া যায়।

এদিকে কুরুক্ষেত্রের অপর পার্শ্বে—কর্ণের জীবনে সুখ-দুঃখের নূতন এক সঙ্কট উপস্থিত হয়। কর্ণ যুধিষ্ঠির—ভীম—নকুল—সহদেবকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছেন। কর্ণের সম্মুখে চারিভ্রাতা নতমস্তকে উপবিষ্ট। চারিভ্রাতাকে কাছে পাইয়া কৌন্তেয়-কর্ণ মনে মনে আনন্দিত। যুধিষ্ঠির, নকুল ও সহদেবকে একে একে স্নেহগর্ভ তিরস্কারে বিদায় দিয়া বৃথাগর্ব্বী ভীমকে পূর্ব্বের দুর্বাক্যের কথা স্মরণ করাইয়া ভীমের বীরত্বের প্রতি কটাক্ষ করেন এবং ভীমের গলদেশে ধনু প্রবেশ করাইয়া আকর্ষণ করিয়া মৃত্যুযন্ত্রণার-অধিক যন্ত্রণা দেন এবং শেষ-পর্য্যন্ত স্নেহবশে—ভীমের গণ্ডে চুম্বন করেন। নত মস্তকে ভীম প্রস্থান করিলে —কর্ণের হৃদয় বেদনায় বিদীর্ণ হইতে থাকে। কর্ণ 'মা! মা!' বলিয়া আর্ত্তনাদ করেন—রাধাকে স্মরণ করিয়া 'কৌন্তেয়-সত্তাকে' বিস্মৃত হইতে চেষ্টা করেন কিন্তু রাধার স্থলে কুন্তী-মূর্ত্তি সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায়—নিয়তিরূপা—মৃত্যুরূপা কুন্তী মাতার স্থান অধিকার করে।

ঘটোৎকচকে বধ করিতে কর্ণ 'এক-বিঘাতিনী' প্রয়োগ করিয়াছেন—'শৈল-বিদারণ-শক্তিধারী' এক-বিঘাতিনীকে তিনি বল্মীকের পিণ্ড চূর্ণ করিতে নিয়োগ করিয়াছেন। কর্ণের সম্মুখে নৈরাশ্যের ঘোর অন্ধকার। কর্ণের মনে হয়—দূরে দাঁড়াইয়া তাঁহার আজন্ম প্রতিদ্বন্দ্বী অর্জুন হাসিতেছে—ঘটোৎকচের মত তৃণ উৎপাটিত করিতে বজ্রবাহু ক্ষত করিতে দেখিয়া হাসিতেছে। কর্ণের অজ্ঞাতসারে চোখ সজল হয়। এ অশ্রু বিষাদের অশ্রু নয়—আনন্দেরই অশ্রু। কর্ণ অর্জুনের অন্তরালে অপূর্ব্ব দুইটি করুণাপূর্ণ আঁখি—যুগযুগান্তের আত্মীয়তা-উদ্ভাসক আঁখি—মধুভরা সম্পর্কের ইতিহাস—বলা আঁখি দেখিতে পান—বুঝিতে পারেন, তাঁহারই 'কাঁদানো পরশ' তাহাকে বিকল করিয়াছে। কর্ণ উল্লসিত হইতে চেষ্টা করেন।

কর্ণের জীবন সমাপ্তির শেষ রেখায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। অর্জুনের সহিত যুদ্ধে—কর্ণেররথ মগ্ন হইয়াছে—নাগদত্ত মহাশক্তি--অর্জ্জুনকে বধ করিবার যত উদ্যম—সব ব্যর্থ হইয়াছে,—'মগ্নরথে পৃষ্ঠ দিয়া উপবিষ্ট কর্ণ' মৃত্যুর অপেক্ষা করিতেছেন।—কর্ণ মুগ্ধ বিস্ময়ে বাসুদেবের কীর্ত্তি স্মরণ করেন। কপিধ্বজ রথকে ভূতলে প্রোথিত করিয়া বাসুদেব সখার জীবন রক্ষা করিয়াছেন—কর্ণের সমস্ত শর-শক্তি নিষ্ফল করিয়া দিয়াছেন; আর তো বাসুদেবকে মানব বলা চলে না। কর্ণের মনে প্রশ্ন জাগে—কে আমি? কিরূপ আমি?......কোন ছিদ্রপথে প্রবেশিয়া আমারে করিল মৃত্যুগ্রাস? কর্ণ বুঝিতে পারেন—জন্ম—জন্ম—'একমাত্র রন্ধ্রপথ ছিল ওইখানে। মৃত্যু আসিয়াও কর্ণের 'জন্মের লাঞ্ছনা-স্মৃতি মুছাইতে পারিতেছে না। কর্ণের চারিদিকে—বিরাট শূন্য। এই বিরাট অসহ্য স্তব্ধ শূন্যকে দূর করিবার জন্য বাসুদেবের নিকট কর্ণ কাতর আহ্বান জানান।

কর্ণের অবস্থা দেখিয়া কৃষ্ণের চোখেও জল আসে। এই চোখের জল 'পৌরুষের অভিমানী কর্ণের মরণে'র জন্য নয়—"পৃথিবীর দৈন্য দেখে ঝরিতেছে আঁখি'; কারণ আজি দাতাকর্ণ চ'লে যায় নিঃস্ব ক'রে তারে।" কর্ণ একদিকে

কৃষ্ণকে 'ভগবান' বলিয়া সম্বোধন করেন। কৃষ্ণ স্নেহাকাঙ্ক্ষী ভ্রাতা হইতে চাহিলেও—কর্ণ স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেন—'তুমি ভগবান'……… "ভগবান হয় ভগবান"। কর্ণ ভীমকে আসিতে দেখিয়া কৃষ্ণের কাছে আত্মসমর্পণ করেন এবং সমাধিস্থ হন।

এই সমাধির পরে—যুধিষ্ঠিরাদি কর্ণের পদমূলে বসিলে—কর্ণ 'ব্যুত্থিত' হন এবং ভীমসেনকে সম্বোধন করিয়া—আত্মকাহিনী বিবৃত করেন; শেষ পর্যন্ত বাসুদেবের সম্মুখে—নর-নারায়ণের সম্মুখে প্রাণত্যাগ করেন।

কর্ণ-চরিত্রের বিশ্লেষণ এই পর্য্যন্ত। এইবার—বিচার। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—কর্ণ-চরিত্রের 'সাধারণ পরিকল্পনা'র মধ্যে নাট্যকার প্রশংসনীয় মৌলিক দৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন এবং কিছু কিছু অ-মহাভারতীয় উপাদান যোজনা করিলেও মহাভারতের সংস্কার অক্ষুণ্ণই আছে। রূপায়ণের বিচার মুখেও, আমরা গোড়াতেই কর্ণ চরিত্র সৃষ্টির উৎকর্ষের জন্য নাট্যকারকে প্রশংসা করিতে পারি। এষণায়—ভাবে ও ভাবনায় চরিত্রটি সর্ব্বত্র নিখুঁত হইয়াছে—এ কথা বলা না গেলেও, চরিত্রটিতে নানা ব্যক্তিত্বের—আত্মা—মন ও প্রাণের, জটিল দ্বন্দ্বের যে রূপ অভিব্যক্ত হইয়াছে তাহাতে এ কথা অবশ্যই বলা যায়—বাংলা নাট্য সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য চরিত্রগুলির মধ্যে কর্ণ চরিত্র একটি বিশেষ স্থান লাভ করিবার অধিকারী। তবে চরিত্রটি যে সর্ব্বতোভাবে অনবদ্য হয় নাই—ইহাও বলা দরকার। প্রথমতঃ জন্ম-রহস্যকে গোড়ার দিকে পাঠক-দর্শকের কাছে ব্যক্ত না করায়—জন্ম-অভিশাপের রূপ ও ক্রিয়াটি খুব পরিস্ফুট হইতে পারে নাই এবং তজ্জনিত সম্ভাব্য রস-সৃষ্টিও যথেষ্টমাত্রায় ঘটে নাই। দ্বিতীয়তঃ—'ধনঞ্জয়-বাসুদেব নর-নারায়ণ'—এই সত্যে কর্ণের যে অবিশ্বাস তাহা বিশেষ তীব্র দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়া, ধীরে ধীরে ক্ষয় পাইতে পাইতে, বিশ্বাসে পরিণত হয় নাই। মর্মের বিশ্বাস এবং বুদ্ধির অবিশ্বাস—এই দুইয়ের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব পরিকল্পিত হইয়াছে তাহা সর্ব্বত্র সঙ্গতিপূর্ণরূপে রূপায়িত হয় নাই। তৃতীয়তঃ—কৌন্তেয়-সত্তায় ভ্রাতৃস্নেহের যে অভিব্যক্তি দেওয়া

হইয়াছে তাহা কোন কোন স্থলে একটু মাত্রাতিরিক্তই হইয়াছে। **চতুর্থতঃ**—চরিত্র অনেক স্থলে নিজেই নিজের ভাষ্যকার হইয়া পড়িয়াছে। **পঞ্চমতঃ**—ভাব-কল্পনাকে রূপ দিতে গিয়া নাট্যকার সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে পারেন নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে—অর্জ্জুন-বিদ্বেষের কারণ গোড়ার দিকে একরূপ—শেষদিকে অন্যরূপ। নাট্যকার—প্রথম দিকের কারণটি ব্যক্ত করেন নাই এবং শেষ দিকে যে কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন প্রথম দিকের কর্ণ-চরিত্রে তাহার আভাস দেন নাই। যাহা হউক এইরূপ ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও, '**কর্ণ-চরিত্র**' চরিত্র-সৃষ্টি হিসাবে প্রশংসনীয়।

কর্ণের পরে—উল্লেখযোগ্য চরিত্র, পুরুষদিগের মধ্যে—"যুধিষ্ঠির" এবং নারীদিগের মধ্যে—"দ্রৌপদী" ও "পদ্মাবতী।"

যুধিষ্ঠির:। 'যুধিষ্ঠির-চরিত্রটি কর্ণের মত অত বিরাট ব্যাপ্তি লইয়া নাটকে প্রকাশিত হয় নাই বটে কিন্তু চরিত্রটির আকৃতি ছোট হইলেও, 'প্রকৃতি বেশ গুরুত্বপূর্ণ। যুধিষ্ঠির বাহিরের পরিচয়ে "ক্ষত্রিয়"; সেই হিসাবে ক্ষাত্রধর্ম তাঁহার ধর্মকায়ার অন্যতম অঙ্গ। এই ধর্মের প্রেরণাতেই—নষ্টরাজ্য উদ্ধার করিতে যুধিষ্ঠির ব্যবসিত—এই ক্ষাত্রধর্ম্মই তাঁহাকে—"নষ্টরাজ্য করিতে উদ্ধার পলে পলে.........করিছে উত্তেজিত" কিন্তু যুধিষ্ঠিরের ভিতরের পরিচয় এই যে, যুধিষ্ঠির—"প্রকট ধর্মের মূর্তি"—যে উদ্দেশ্যে কেশবের আগমন সেই ধর্মেরই—নূবিগ্রহ। সমস্ত লোকধর্মের—বর্ণাশ্রম ধর্মের উর্দ্ধে এই ধর্মের অধিষ্ঠান। করুণা—ক্ষমা—শান্তি দ্বারা এই ধর্ম্মের আত্মা গঠিত। এই ধর্ম্মগুণেই যুধিষ্ঠির—'প্রকট ধর্ম্মের মূর্তি'—পরম ধার্মিক। যুধিষ্ঠির বাহিরকে 'ক্ষত্রিয়', অন্তরঙ্গে—'ধার্মিক।' 'ক্ষত্রিয়' যুদ্ধ করিতে চায় কিন্তু "ধার্মিক" যুদ্ধের কল্পনায় শিশুহত্যা, গুরুহত্যা, বান্ধবহত্যার কল্পনায় শিহরিয়া উঠে—। 'মহাভয়ে তাঁহার হৃদয় মুহুর্মুহু কম্পিত হয়। কেশবের কাছে তাঁহার প্রার্থনা—'তোমার প্রসাদে ভাই, কৌরব পাণ্ডব আবার প্রশান্ত চিত্তে একত্র মিলিয়া পরমানন্দে কাল যেন করহে যাপন"। যুধিষ্ঠির ধর্ম্মের প্রতীক এবং শান্তরসের আলম্বন

বিভাব। তাই বলিয়া যুধিষ্ঠির দুর্ব্বল বা অক্ষম নহেন। যুধিষ্ঠিরের শক্তি—ধর্ম্মের শক্তি—শম-দম-তিতিক্ষার শক্তি—শান্ত করুণার শক্তি। যুধিষ্ঠিরের 'শান্ত করুণ দর্শণের সমক্ষে দাঁড়াইয়া প্রতিরোধ করিতে পারে এমন শক্তি কোথায়? কর্ণ কৃষ্ণের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিতে সমর্থ হইলেও—বাসুদেবকে বলিয়াছেন—"ঠেলিলাম বাসুদেব তব অনুরোধ—পারিনা উপেক্ষা করিতে তাঁর। চিরলোভনীয় সঙ্গ যাঁর……"। দুর্য্যোধনের মত দুর্মতিও যুধিষ্ঠিরের প্রাণবধ করিবার সঙ্কল্প মনে আনিতে চাহে না। শকুনি পর্য্যন্ত এই ধর্ম্মমহিমা উপলব্ধি করে—বলিতে বাধ্য হয়—"ধর্ম্মরাজই বটে তুমি যুধিষ্ঠির—একটিবারের তরে দুর্য্যোধন—মুখ হতে বহির্গত হ'ল না তোমার নিধন-কথা।" তবে এ কথা স্বীকার করিতে হইবে—চরিত্রটি যত পরোক্ষভাবে উপস্থাপিত হইয়াছে তত প্রত্যক্ষভাবে রূপ পায় নাই।

দ্রৌপদী ঃ—অল্প অবসরে অধিক চিত্তাকর্ষক চরিত্রের তালিকায় যুধিষ্ঠিরের পরেই দ্রৌপদীর স্থান। দ্রৌপদী যাজ্ঞসেনী—অগ্নিশিখা শিরে তাঁহার জন্ম।—'দীপ্ত বহ্নিশিখা সম' তেজস্বিনী। সংক্ষিপ্ত পরিচয় তাঁহার নিজের মুখেই শোনা যায়—"দ্রুপদনন্দিনী আমি, দীপ্ত বহ্নিশিখা সম ধৃষ্টদ্যুম্নের ভগিনী—বাসুদেব-প্রিয়সখী পাণ্ডুরাজ স্নুষা—ভূমণ্ডলে অতুল সৌভাগ্যবতীনারী…"। কিন্তু এত সৌভাগ্য থাকা সত্ত্বেও—'ভূবিজয়ক্ষম পঞ্চ স্বামীর সম্মুখে একবস্ত্রা' দ্রৌপদী লাঞ্ছিত হইয়াছেন। দুঃশাসনের কেশাকর্ষণ, বস্ত্রহরণ, দুর্য্যোধনের উরু-প্রদর্শন—এত অসহ্য লাঞ্ছনা সবই সহ্য করিয়াছেন। ত্রয়োদশ বর্ষ ধরিয়া প্রতিপলে দ্রৌপদী—"অগ্নিজিহ্বা সহস্র ফণার বজ্রজ্বালা প্রচণ্ড দংশন" সহ্য করিয়া আসিয়াছেন—আর, আসিয়াছেন ভীমের প্রতিজ্ঞার, অর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞার মুখের দিকে চাহিয়া—কিন্তু সেই ভীম-অর্জ্জুনাদি প্রায় সকলকেই (সহদেব ছাড়া) শান্তির প্রস্তাব করিতে দেখিয়া দ্রৌপদীর তীব্র অভিমান শ্লেষ—বক্রোক্তির সঞ্চারিভাবে, দৃঢ় তীব্র ভঙ্গিমায় উৎক্ষিপ্ত হয়। দ্রৌপদী স্বামীদের মুখের দিকে না চাহিয়া নিজের লাঞ্ছনার প্রতিশোধ লইতে

সঙ্কল্প করেন—যাজ্ঞসেনী জ্বলিয়া উঠেন—"অগ্নিশিখা শিরে যদি জনম আমার, উত্তাপ ভিক্ষার আমি কোন দীপশিখা মুখে বাড়াইব কর ?"……কৌরববিনাশে নিজে যাব আমি।'

কিন্তু এই বহ্নিশিখা রূপ দ্রৌপদীর সবটুকু নহে। দ্রৌপদী 'বাসুদেব-প্রিয়সখী' 'পাণ্ডব-সখা'-রূপী কৃষ্ণের কৃপালাভে ধন্যা। এই কৃষ্ণার নিঃশ্বাসেই "সন্ধির সকল চেষ্টা করেছে নিষ্ফল", কারণ বিধাতা সব সহিতে পারেন—শুধু "অনাথ ক্রন্দন অনশনে জাতির মরণ আর 'কার্য্যে বাক্যে লাঞ্ছনায় নারীর লাঞ্ছনা —সহিতে পারেন না।

দ্রৌপদী প্রতিহিংসা কামনায়—লাঞ্ছনার জ্বালায় যুধিষ্ঠিরকে তীব্র গঞ্জনাবাক্য বলিলেও যুধিষ্ঠিরের অপূর্ব্ব ধর্মনিষ্ঠা দেখিয়া বিমুগ্ধ এবং যত বিমুগ্ধ হইয়াছেন, তত গঞ্জনা দেওয়ার জন্য অনুতপ্ত হইয়াছেন। ক্ষাত্রতেজ এবং ধর্মনিষ্ঠার মহিমা মিশিয়া দ্রৌপদী-চরিত্রটি চিত্তাকর্ষক হইয়া উঠিয়াছে।

পদ্মাবতী। পদ্মাবতী কর্ণের জীবন-সঙ্গিনী—বীরশ্রেষ্ঠের যোগ্য সহধর্মিনী কিন্তু এক স্থানে কর্ণের সহিত তাঁহর মতপার্থক্য আছে। যেখানে কর্ণ ধনঞ্জয় বাসুদেবকে নর-নারায়ণ বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত নন পদ্মাবতী সেখানে বাসুদেবকে শুধু নারায়ণ বলিয়া স্বীকার করিয়াই ক্ষান্ত নহেন—পদ্মাবতী কৃষ্ণ-পরায়ণা। (কর্ণেরই আত্মিক সত্তা যেন।) এই কৃষ্ণপরায়ণতার ফলেই পদ্মাবতী যতটা 'ভাবে ভরা' হইয়াছেন ততটা রক্তমাংসের দেহ হইতে পারেন নাই। স্বামীর জন্য তাঁহার উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা সবই আছে বটে, কিন্তু—সকলের উপরে আছে তাঁহার কৃষ্ণপ্রাণতা। চতুর্থ অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে—পদ্মাবতীর আচরণ দিব্যোন্মাদিনীরই মত। বৃষকেতুকে তিনি বলেন—পাণ্ডবের সখা কৃষ্ণ —সে যে সখা তোর, সখা মোর, সখা তোর মহাত্মা পিতার।" বৃষকেতুকে তিনি "বাসুদেব! রক্ষা কর তোমার পাণ্ডবে।"—এই প্রার্থনায় যোগ দিতে বলেন—বলেন—"পাণ্ডব-উল্লাস-সঙ্গে উল্লাসে উঠুক নেচে হৃদয় তোমার।…… আমি তোকে আগে হতে করিয়াছি কৃষ্ণে সমর্পণ।" পদ্মাবতীর এই দিব্যোন্ম-

দিনী—মূর্ত্তি, কৃষ্ণ ভাবুকতায় যত পরিপূর্ণই হোউক, বাস্তবিক চরিত্র হিসাবে লঘু হইয়া পড়িয়াছে। পদ্মাবতী—অর্দ্ধেক মানবী আর অর্দ্ধেক যোগিনী—(কৃষ্ণযোগিনী)।

অন্যান্য চরিত্রে তেমন উল্লেখযোগ্য কোন জটিলতা নাই। **দুর্য্যোধনকে**—'অহঙ্কাররজ্জু-মূর্ত্তি' রূপে, **ধৃতরাষ্ট্রকে**—'পুত্র মোহ-গ্রস্ত' রূপে, **ভীষ্মকে**—'কৃষ্ণভক্ত, পাণ্ডবানুরাগী, কর্ণ-ভৎর্সনাকারী' রূপে, **গান্ধারীকে**—ধর্মানুরাগিনী রূপে, **ভীমার্জ্জুন**—প্রভৃতিকে—"ইষ্টসম জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরের অনুগামী রূপে এবং **শকুণিকে**—'বাকচপল লঘু হাস্যরসিক রূপে উপস্থাপিত করা হইয়াছে।

রস-বিচার

নরনারায়ণ নাটকের প্রধান রস—বীর-ভক্তি সম্বলিত 'করুণ'। 'কর্ণ' এই রসের অবলম্বন বিভাব। কর্ণে বীরত্ব আছে, কৃষ্ণের প্রতি আপাত অবিশ্বাসের তলে ভক্তির ফল্গুধারা আছে এবং সব কিছুর ভিতর দিয়া আছে জন্ম-অভিশপ্তের মর্মবেদনা,—নিয়তির হস্তের দারুণ নিগ্রহ,—অভিশাপের উপর অভিশাপ—সমস্ত সাধনা-ব্যর্থ করা অভিশাপ, নিজেরই এক সত্তার সহিত অন্য সত্তার করুণ দ্বন্দ্ব—অবশ্যম্ভাবী নিয়তির বিরুদ্ধে নিষ্ফল সংগ্রামের শোচনীয় পরিণতি। কর্ণের বীরত্বে ও নির্ভীকতায় বীররসের উদ্দীপনা ঘটিয়েছে এবং কৃষ্ণরতির মধ্যে ভক্তিরসের নিষ্পত্তি হইয়াছে বটে কিন্তু কর্ণের বীরত্ব নির্ভীকতা ধর্মনিষ্ঠা এবং কৃষ্ণপরায়ণতা কর্ণকে যত মহিমান্বিত করিয়াছে নিয়তির সহিত কর্ণের নিষ্ফল সংগ্রামের শোচনাও তত তীব্র হইয়া উঠিয়াছে। বীর ও ভক্তিরসের ধারা, শেষ পর্য্যন্ত করুণরসের ধারাটিকেই পরিপোষণ করিয়াছে—করুণরসের সহায়ক হিসাবেই উহারা সার্থকতালাভ করিয়াছে। কর্ণ যে পরিমাণে বীর ও ধর্মনিষ্ঠ হইয়াছেন সেই পরিমাণেই আমাদের সভানুভূতি লাভ করিয়াছেন এবং সেই পরিমাণেই কর্ণের মর্মবেদনা পাঠক-দর্শকের কাছে শোচনীয় হইয়াছে।

কর্ণ যে পরিমাণ কৃষ্ণভক্ত হইয়াছেন—কৃষ্ণকে নারায়ণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন সেই পরিমাণে কর্ণের শোচনাও বৃদ্ধি পাইয়াছে—কর্ণের তীব্র মনঃক্ষোভ প্রকাশিত হইয়াছে—"স্বর্গ-মূল্যহীন করা উপহার—ভ্রাতৃত্ব তোমার লইতে অশক্ত আমি।" এই সব কারণেই কর্ণ—অবলম্বনে বীর ও ভক্তিরসের সংযোগে করুণ রসই প্রধানভাবে নিষ্পন্ন হইয়াছে।

অন্যান্য রসের মধ্যে,—তাপস অবলম্বনে রৌদ্র-রস (জমে নাই), পরশুরাম অবলম্বনে করুণ,—মিশ্র রৌদ্র—দ্রৌপদী-অবলম্বনে বীরসর, দুর্যোধন অবলম্বনে বীররস, ভীম-অর্জ্জুন-নকুল-সহদেব-সাহায্যে বীররস ও ভ্রাতৃভক্তি ; ভীষ্ম, দ্রোণ অবলম্বনে শক্তিবীর ও ধর্ম্মবীর রস, ধৃতরাষ্ট্র-বিভাবে বাৎসল্য, গান্ধারী বিভাবে ধর্মবীর-রস বৃষকেতু, পদ্মাবতী অবলম্বনে ভক্তিরস এবং শকুনি আলম্বনে হাস্যরস সৃষ্টির চেষ্টা করা হইয়াছে। প্রায় ক্ষেত্রেই রসোদ্রেকের মাত্রা সন্তোষজনক হয় নাই। কোন কোন ক্ষেত্রে রস আভাসিত হইয়াছে কোন কোন ক্ষেত্রে অল্পাধিক ব্যক্ত হইয়াছে।

হাস্যরস সৃষ্টির উদ্দেশ্যে—নাটকে একটি মাত্র চরিত্রই পরিকল্পিত হইয়াছে—সে "শকুনি"। ঘটোৎকচের উদ্দেশ্য যাহাই হউক, ঘটোৎকচ তাহার রাক্ষস ভাষার ভঙ্গিমা দ্বারা হাস্য-রসের সৃষ্টি করিয়াছে। শকুনি যে হাসি সৃষ্টি করিয়াছে তাহা আকার বা চেষ্টার বিকৃতি-জনিত হাসি নয়; এই হাসি বাক-বিকৃতি জনিত হাসির অন্তর্গত—লঘু বক্তব্যকে গুরু-গম্ভীর ভাষার আড়ম্বরে প্রকাশ করিবার, লঘু আচরণকে গুরু-গম্ভীর-ভাবের দ্বারা আচ্ছাদিত করার চেষ্টা হইতে যে হাসির উদ্রেক হয়, ইহা সেই হাসি॥ এই হাস্য-রস সৃষ্টির চেষ্টা সব ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় হয় নাই—বিশেষতঃ এ কথা বলা যায়—গুরুতর পরিস্থিতিতে শকুনির বাক্‌চাপল্য ও স্থূল রসিকতা, রসদোষেরই নিদর্শন বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

উপসংহার 'প্রস্তাবনা'য় নাট্যকার প্রশ্ন তুলিয়াছেন—"দৈব কিংবা পুরুষকার—বিশ্বরাজ্য কোন্ রাজার? কাহার বিরাট, কাহার স্বরাট। কাহার

প্রকাশ—সঙ্গোপন"' "নিবেদনে"—পরিকল্পনা ব্যক্ত করিয়াছেন—"এক দৈব-নিগ্রহীত পূর্ণ শক্তিধর মহাপুরুষের জীবন কাহিনী"—এবং নাটকে ঐ প্রশ্নেরই উত্তর—দিয়াছেন উক্ত পরিকল্পনার সাহায্যে॥ পুরুষকারের অবতার কর্ণ ঘোষণা করিয়াছেন—"নিয়তির কার্য্য, কোন কালে হয় নাই মানবের কল্পনা-চালিত" অর্থাৎ এই বিশ্বরাজ্য দৈবেরই অধীন। অবিশ্বাসী কর্ণ শেষ পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়াছেন—"ভগবান হয় ভগবান। এবং......'ভগবান ইচ্ছা যদি করে'—'নরদেহ ধারণ করিতে পারেন—নর-নারায়ণ রূপ পরিগ্রহ করিতে পারেন।

এই উত্তর দিতে গিয়া নাট্যকার কর্ণের জীবনে 'প্রাণ-বুদ্ধি ধর্ম্ম-অধিকারের যে জটিল ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া দেখাইয়াছেন—আধ্যাত্মিক ও জৈবিক সংস্কারের যে দ্বন্দ্ব উপস্থাপিত করিয়াছেন তাহা মানবের গভীর হৃদয়াবেগেই আবেদন করে এবং সেই আবেদনেই 'নর-নারায়ণ' নাটকের শৈল্পিক সার্থকতা।

—সমাপ্ত—

শ্রীমধুসূদন

বাংলা সাহিত্যে বনফুল

'বৌদ্ধ গান ও দোহা'র কাল হইতে আজ পর্য্যন্ত—প্রায় সাড়ে দশ শতাব্দীর ব্যাপ্তি। বাংলা সাহিত্যের বয়সও এই সাড়ে দশ শতাব্দী—এক হাজার পঞ্চাশ বছরের কিছু বেশী। এই কাল ব্যাপ্তিকে মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করা হইয়া থাকে :—দশম হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত—(আদি+মধ্যযুগ) 'প্রাচীন যুগ' এবং পরবর্ত্তী দেড়শত বৎসর—'আধুনিক যুগ' নামে পরিচিত। এই যুগ-বিভাগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝা যায়—এই বিভাগ শুধু কাল ব্যবধানের দূরত্ব বা অতীতত্ব হিসাব করিয়া অথবা জাতীয় জীবনের বিশেষ বিশেষ ঐতিহাসিক বাঁক বা সন্ধি-কালকে ভিত্তি 'করিয়াই' করা হয় নাই; ইহার মূলে আপাতদৃষ্টিতে বিশেষ একটি ঐতিহাসিক সন্ধি-যুগকে দেখা গেলেও এই যুগ-বিভাগের আসল ভিত্তি দুই যুগের সাহিত্যের রীতি, রূপ ও রসের প্রকৃতি-গত পার্থক্যটুকু। 'বৌদ্ধ গান ও দোহা'র কাল হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত, সমাজ-বিবর্ত্তন স্তব্ধ হইয়া ছিল, সমাজের দেহে মনে কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই এ কথা সত্য নয় বটে, কিন্তু এ কথাও স্বীকার্য্য—এই পর্য্যন্ত, সাহিত্যের রূপ রসের প্রকৃতি প্রাচীনত্বের গণ্ডী অতিক্রম করিতে পারে নাই। বৌদ্ধ গান ও দোহা হইতে অন্নদামঙ্গল, কালিকামঙ্গল অবধি সাহিত্য-শিল্পের প্রকাশ-রীতি কেন শুধু সুর ও ছন্দের ধ্বনিতরঙ্গ আশ্রয় করিয়া ব্যক্ত হইয়াছিল এবং বিষয়বস্তু মুখ্যতঃ ধর্ম্মমূলক হইয়াছিল এ প্রশ্নের বিস্তারিত আলাচনায় প্রবেশ করিবার অবকাশ এখানে নাই। এখানে শুধু এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে—দশম হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে অবশ্যম্ভাবী পরিবর্ত্তন যথারীতিই ঘটিয়াছে কিন্তু যাহাকে বলে "বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন" তেমন কিছু ঘটিতে পারে নাই।

হিন্দু-বৌদ্ধ শাসনাধিকারে যে রাজ-অর্থ-নৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংস্থা ছিল, মুসলমান অধিকারে তাহাতে কোন মৌলিক পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। মুসলমান শাসকরা (পাঠান-মোগল) শিল্পে-সাহিত্যে দর্শনে-বিজ্ঞানে কোন অংশেই উন্নত না থাকায়, বরং অধিকতর অনুন্নত থাকায়, বাংলার সামাজিক জীবনের সহজ গতিকে তাহারা অনেক পরিমাণে ব্যাহতই করিয়াছিল। অন্ততঃ এ কথা অবশ্যই স্বীকার্য্য—যে হিন্দু-সংস্কৃতিতে নূতন কিছু যোগ করার যোগ্যতা তাহাদের ছিলনা। এই কারণেই, পলাশীর প্রান্তরে সিরাজদ্দৌলার পরাজয়কে—ইংরেজ শক্তির বিজয়কে, অনেক ঐতিহাসিক "নবযুগের সূচনা" বলিয়া অভিনন্দন জানাইয়াছেন। সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক শ্রদ্ধেয় যদুনাথ সরকার মহাশয় লিখিয়াছেন—In 1957 we crossed the frontier and entered into a great new world······it was the begining slow and unperceived of a glorious dawn······On July 23, 1757 the middle ages of India ended and her modern age began. ১৭৫৭ খ্রীঃ ভারতের মধ্যযুগের অবসান—আধুনিক যুগের প্রারম্ভ। ইংরেজ-শক্তির বিজয়লাভকে এই ভাবে অভিনন্দন করায় আমাদের অনেকেরই মন কেমন কেমন না করিয়া পারে না, কিন্তু ঐতিহাসিক সরকার মহাশয় যে অর্থে ইহাকে "glorious dawn"-এর সূচনা বা "great new world"-এ প্রবেশ বলিয়াছেন, তাহাতে আপত্তি করা চলে না। জ্ঞান-বিজ্ঞানে শিল্পে-সাহিত্যে সমুন্নত ইংরেজ জাতির সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ঘটা—তথা ইউরোপের জ্ঞান-বিজ্ঞান সমৃদ্ধ সভ্যতার সহিত সংযোগ লাভ করিবার সুযোগ লাভ করা, জীবনী-শক্তিহীন জাতির পক্ষে অবশ্যই সৌভাগ্যের কথা। যদিও এ কথা খুবই সত্য যে ইংরেজ-শাসকরা আমাদের কম শক্তহাতে শাসন করেন নাই বা কম জোরে শোষণ করেন নাই ; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও তেমনি সত্য—যে "ইংরেজি শিক্ষা সোনার কাঠির মতো আমাদের জীবনকে স্পর্শ করিয়াছে" (রবীন্দ্রনাথ)—এবং "আমাদের ভিতরকার বাস্তবকেই" জাগাইয়াছে।

সত্যের অপলাপ না করিলে এ কথা বলিতেই হইবে—ইংরেজ জাতির জীবনের আঘাতে আমাদের জীবন জাগিয়া উঠিয়াছে এবং "দূর দেশের দক্ষিণে হাওয়ায় দেশান্তরে সাহিত্য কুঞ্জে ফুলের উৎসব" যেমন করিয়া জাগায়, ঠিক তেমন করিয়াই ইংরেজ সাহিত্যের দক্ষিণে হাওয়া আমাদের সাহিত্যকুঞ্জে ফুলের উৎসব জাগাইয়াছে—উন্নততর সভ্যতার আলোক-আকর্ষণে আমাদের সভ্যতা পাঁপড়ি মেলিয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে।

কয়েকটি ঐতিহাসিক তাৎপর্য্যপূর্ণ ঘটনার উল্লেখ কলিলেই বুঝা যাইবে ইংরেজ-অধিকার কি ভাবে আমাদের জাতীয় সংস্কৃতিকে নূতন পর্য্যায়ে উন্নীত করিয়াছে এবং জাতির আত্মবিকাশের তথা আত্মপ্রতিষ্ঠার পথ সুগম করিয়া দিয়াছে। নিম্নলিখিত ঘটনাগুলি নয়া বাংলার গোড়া পত্তন করিয়াছে—অসঙ্কোচে এ কথা বলা যায়। প্রথম ঘটনা—১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দের শেষে "The particular Baptist Society for propagating the Gospel amongst the Heathens"—নামক সমিতির প্রতিষ্ঠা। এই সমিতির উদ্দেশ্য—"Conversion of the Heathen"—সিদ্ধ করিতে **টমাস** এবং **উইলিয়াম কেরী** বাংলায় আসেন এবং ক্রমে শ্রীরামপুর মিশন—ঘাঁটি স্থাপন করেন। অনুপ্রবেশের সুবিধার জন্য বাংলা ভাষা-শিক্ষা চাইই চাই। সুতরাং সকলের আগে চাই—**মুদ্রাযন্ত্র এবং বাংলা অক্ষর**। খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্য লইয়া টমাস ও কেরী মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন এবং অজ্ঞাতসারেই বাঙালী জাতির মহোপকার করিয়া বসেন—বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অগ্রগতির পথ হইতে দুর্লঙ্ঘ্য একটি বাধা সরাইয়া দেন। এই সঙ্গেই স্মরণীয়—**১৭৯৮ খৃষ্টাব্দের** প্রতিষ্ঠিত **বাংলা হরফ তৈয়ারীর কারখানা** এবং আমাদের পঞ্চানন কর্মকার মহাশয়।

মুদ্রাযন্ত্রের জীবনী-শক্তি যোগায় অক্ষর-কারখানা সুতরাং কারখানাটির ঐতিহাসিত গুরুত্ব সহজেই অনুমেয়। আর একটা কথাও উল্লেখযোগ্য এবং কথাটি এই-যে মুদ্রাযন্ত্রই মানুষের প্রকাশকে—ভাষাময় রচনাকে—দেশ-কাল-

পাত্রের বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া দিয়া থাকে। প্রকাশের পর্য্যায়গুলির দিকে ফিরিয়া তাকাইলে দেখা যায়=প্রথমে **'বলা'র** স্তর, দ্বিতীয়—**"লেখা"র** স্তর, তৃতীয়—**'মুদ্রণে'র** স্তর। সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে এই তিনটি স্তরের সম্পর্ক আছে তাহা সহজেই বুঝা যায়। **কথিত প্রকাশের** পর্য্যায়ে শ্রুতি ও স্মৃতি আশ্রয় করিয়া প্রকাশকে বাঁচিয়া থাকিতে হয়, সুতরাং দেশ-কাল-পাত্রের মধ্যে সে প্রকাশ সীমাবদ্ধ। **লিখিত প্রকাশের** স্তরে, দেশ-কাল-পাত্রের সীমাবদ্ধতা কিছুটা দূর হয় বটে কিন্তু পূর্ণ মুক্তি সম্ভব হয় না। পূর্ণ মুক্তি আসে—**মুদ্রিত প্রকাশের** স্তরে। প্রকাশকে তখন আর সামাজিক অনুষ্ঠান-উৎসবের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয় না এবং তাহা হয় না বলিয়াই সাহিত্যের রূপে-রসে বৈচিত্র্য দেখা দিয়া থাকে। এই কারণেই মুদ্রাযন্ত্রের প্রতিষ্ঠা একটি যুগান্তকারী ঐতিহাসিক ব্যাপার। জ্ঞান-বিজ্ঞানকে, শাস্ত্র-সাহিত্যকে ঘরে ঘরে পৌঁছাইয়া দেওয়ার সামর্থ্য যাহার আছে, তাহার আবির্ভাবে যে জাতির মানস-মুক্তি ঘটিবে ইহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে।

দ্বিতীয় ঘটনা—গভর্ণর জেনারেল লর্ড ওয়েলেস্‌লী কর্ত্তৃক, ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে **"ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠা"**। পাদ্রীদের বাংলা শিখিবার প্রেরণা আসিয়াছিল—ধর্মপ্রচারের আবেগ হইতে আর এই কলেজটির প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল—ভারতবর্ষকে ভালভাবে শাসন-শোষণের নাগপাশে বাঁধিবার জন্য ভারতীয় ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনে। উদ্দেশ্য উভয়ক্ষেত্রেই আমাদের পক্ষে ক্ষতিকারক, সন্দেহ নাই। কিন্তু যে উদ্দেশ্যেই যাহা করা হউক, আমাদের লাভের ঘরে অঙ্ক জমিতে লাগিল। বাংলা ভাষাই যে শুধু ব্যাকরণের সূত্রে সংগ্রথিত সংগঠিত হইল তাহা নহে, বাংলা সাহিত্যে নূতন রূপ-রসের ফসল ফলিতে আরম্ভ করিল। এই কলেজের পণ্ডিত-পাদ্রীদের হাতেই বাংলা গদ্য-সাহিত্যের ভিত্তি রচিত হইয়াছিল। রামরাম বসুর রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র (১৮০১), মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের বত্রিশ সিংহাসন (১৮০২) ও প্রবোধচন্দ্রিকা (১৮৩৩), গোলোকনাথ শর্মার হিতোপদেশ (১৮০২) তারিনীচরণ মিত্রের—

ওরিয়েণ্টাল ফেবুলিষ্ট (১৮০৩), চণ্ডীচরণ মুন্সীর—তোতা ইতিহাস (১৮০৫), রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের—মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং (১৮০৫), রামকিশোর তর্কচূড়ামণির হিতোপদেশ (১৮০৮), হরপ্রসাদ রায়ের পুরুষ-পরীক্ষা (১৮১৫), কাশীনাথ তর্কপঞ্চাননের পদার্থ কৌমুদী এবং উইলিয়াম কেরীর গ্রন্থাবলী :—(১) নিউ টেষ্টামেণ্ট (১৮০১ (২) **বাংলা ব্যাকরণ** (১৮০১) (৩) কথোপকথন (১৮০১) (৪) ওল্‌ড টেষ্টামেণ্ট—মোশার ব্যবস্থা (১৮০২ (৫) **কৃত্তিবাসের রামায়ণ** (১৮১২) (৬) **কাশীদাসের মহাভারত** (১৮০২) (৭) ওল্‌ড টেষ্টামেণ্ট—দাউদের গীত (১৮০৩ (৮) —ঐ—ভবিষ্যদ্বাক্য (১৮০৭) (৯) ঐ—যিশরালের বিবরণ (১৮০৯) (১০) ইতিহাস মালা (১১) বাংলা-ইংরাজী অভিধান (১৮১৫-২৫)—এই সকল রচনার সাহিত্যিক মূল্য কিছু থাক আর না থাক—ঐতিহাসিক মূল্য খুবই বেশী। ইহারাই নব-যুগের পথ প্রস্তুত করিয়াছিল। প্রাচীন প্রকাশ-রীতির এবং বিষয়বস্তুর গণ্ডী অতিক্রম করিয়া ইহাদের এই মুক্তিপথে যাত্রা, বাংলা সাহিত্যকে নবদিগন্তের স্বর্ণদ্বারে পৌছাইয়া দিয়াছিল। **তৃতীয় ঐতিহাসিক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা—১৮১৭ খৃঃ হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা।** ইংরাজী সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের রত্নভাণ্ডারের দ্বার উন্মোচন করিয়া দিয়া এই কলেজ বাঙালীর মনে-প্রাণে—সমাজ-জীবনে এক বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়াছিল। ইংরেজী সাহিত্য-শিল্প দর্শন-বিজ্ঞান, নূতন আকাশের মুক্তি এবং এক নূতন আলোকরশ্মি লইয়া বাঙালীর কাছে উপস্থিত হইল—মস্তিষ্কে উদ্দীপিত করিল নূতন নূতন মননের আবেগ, হৃদয়ে সঞ্চারিত করিল জগৎ ও জীবনকে নূতন আবেগে উপলব্ধি করার ঐকান্তিক আস্পৃহা। প্রকৃতপক্ষে হিন্দু কলেজই বাঙালীকে নবভাবে নব ভাবনায় দীক্ষা দিয়াছিল। 'আধুনিক বাংলা' বলিতে যে বাংলাকে বুঝায় তাহাকে সৃষ্টি করিয়াছিল। এ কথা বলিলে অন্যায় করা হইবে না যে হিন্দু কলেজই আধুনিক বাংলার হৃদয়-মন গঠন করিয়াছিল।

আর একটি ঐতিহাসিক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা—**বাংলা সাময়িকপত্র প্রকাশ**। গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের 'বাঙ্গালা গেজেট'—সমাচার দর্পণের আগে কি পরে তাহা যত তর্কের বিষয়ই হউক, এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে, সাময়িক-পত্রই নবযুগের সাহিত্যের প্রধান বাহন হইয়াছিল—(এখনও প্রধান বাহন)। মুদ্রাযন্ত্রের অনিবার্য্য শুভ ফলের মধ্যে—সাময়িক পত্র এবং সংবাদপত্র অন্যতম। শিক্ষিত বাঙালীর নবোন্মেষিত ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য-বোধ সংবাদপত্র এবং সাময়িক পত্রের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশের পথ খুঁজিবে—ইহাই স্বাভাবিক। ভুলিলে চলিবে না—বাংলা সাহিত্যের অধিকাংশ রচনাই প্রথম সাময়িক পত্রে, পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে এবং এখনও তাহাই হয়। এই সমস্ত ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারের সমষ্টিগত ফল—**বাংলার নব জাগরণ—জ্ঞানে-ভাবে-কর্মে নূতন করিয়া বাঙালীর আত্মোপলব্ধির সাধনা**। ঊনবিংশ শতাব্দী শেষ হইতে না হইতেই দেখা যায়, বিদ্যাসাগর, অক্ষয় দত্ত, মধুসূদন, রঙ্গলাল, বিহারীলাল, দীনবন্ধু, ভূদেব, রাজনারায়ণ বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, গিরিশচন্দ্র অক্ষয় বড়াল, রবীন্দ্রনাথ ক্ষীরোদপ্রসাদ এবং আরো অনেকের সাহিত্য-সাধনার ফলে বাংলা-সাহিত্যের ভাণ্ডার কাব্য-মহাকাব্য-গল্প-উপন্যাস-নাটক-প্রবন্ধে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। বিগত নয় শতাব্দীর সাধনার সহিত তুলনা করিলে এই সমৃদ্ধি অবশ্যই বিস্ময়জনক বলিয়া মনে হইবে। বিংশ শতাব্দীর দানের পরিমাণ, শতাব্দীর অর্দ্ধেক যাইতে না যাইতেই যে মাত্রায় পৌঁছিয়াছে, তাহা যে কোন জাতির পক্ষেই সৌভাগ্য-সূচক বলা যাইতে পারে। কাব্য-নাটক গল্প-উপন্যাস-প্রবন্ধের সংখ্যা ও গুণগত উৎকর্ষ লইয়া, বাঙালীর আর তেমন লজ্জা বা দৈন্য প্রকাশ করিবার কারণ নাই। বাংলা-সাহিত্যে 'শক্তির আয়োজন' তেমন সন্তোষজনক হয় নাই বটে, কিন্তু "ভোজের আয়োজন" হইয়াছে—যথেষ্টই। এই আয়োজনে, কাব্য-নাটকের পরিমাণ যা-চাই মাত্রায় পাওয়া না গেলেও, গল্প-উপন্যাসের প্রাচুর্য যে প্রায় সমুদ্রের বিশালতার কাছাকাছি গিয়াছে এ কথা স্বীকার

করিতেই হইবে। স্বীকার করিতেই হইবে—নয় শত বৎসরে আমরা যাহা পাই নাই, দেড়শত বৎসরে তাহার শত-সহস্রগুণ পাইয়াছি। কিন্তু এই পাওয়া কি আকস্মিক? অকারণ? যত বিস্ময়করই এই জ্ঞান-কল্পনা-কর্মের বিভূতি মনে হউক ইহা কিন্তু কোন আকস্মিক বা দৈব-ইচ্ছার ফল নহে। ইহার পিছনে সমগ্র পৃথিবীর জ্ঞান-কল্পনা-কর্মের সাধনা প্রেরণারূপে কাজ করিয়াছে। প্রতীচ্যের এবং আমাদের নিজেদের বৈজ্ঞানিক সাধনার, দার্শনিক সাধনার শিল্প-সাধনার এবং জীবন-চর্চার পরিপ্রেক্ষিতে দাঁড় করাইয়া দেখিলেই ইহার কারণটি স্পষ্ট বুঝা যাইবে। শুধু বাঙালীর জীবনেই নয়, বিজ্ঞান-দর্শনেও এই দেড়শত বৎসর যুগান্তর সৃষ্টি করিয়াছে। এই দেড়শত বৎসর বিজ্ঞান এত দ্রুত এবং এত দিক দিয়া অগ্রসর হইয়াছে যে, তাহার সার্বভৌম প্রতিষ্ঠার ফলে মানব-সভ্যতা যেন এক লাফে অনেক শত বৎসরের ব্যবধান ডিঙাইয়া গিয়াছে। এই সময়েই পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ণ জ্যোতির্বিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান ভূ-বিজ্ঞান, নৃ-বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান প্রভৃতির বিস্ময়কর অগ্রগতি ঘটিয়াছে। প্রকৃতির এবং জীব জগতের রহস্যের গভীরতম প্রদেশে বৈজ্ঞানিকের যন্ত্রচক্ষুর আলোক প্রবেশ করিয়াছে। এই সময়েই বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের-বলে-বলীয়ান হইয়া বস্তুবাদী দর্শন দিগ্বিজয়ীর প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে এবং বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির ফলেই বাস্তব এবং মানস সংস্কৃতিতে অভূতপূর্ব পরিবর্ত্তন দেখা দিয়াছে। যন্ত্রের সাহায্যে উৎপাদন কার্য্য নিষ্পন্ন হওয়ায় উৎপন্নদ্রব্যের পরিমাণ, উৎকর্ষ এবং বৈচিত্র্য বহুগুণ বাড়িয়া গিয়াছে। তেমনি অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে শ্রেণী-সংগ্রামের তীব্রতাও বাড়িয়া গিয়াছে। রাশিয়াতেও চীনে সাম্যবাদী সমাজ ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদের বা সাম্যবাদের দ্বন্দ্বে প্রত্যেক সমাজই অস্থির ও অশান্ত—অবশ্য কেহ বেশী আর কেহ কম, এই যাহা পার্থক্য। বস্তুবাদী-দর্শন জগৎ এবং জীবনে বিধাতার নিয়ন্ত্রণ স্বীকার করে না বলিয়াই সমাজ-ব্যবস্থাকেও 'বিধাতার বিধান' অতএব অপরিবর্ত্তনীয় বলিয়া মনে করে না—মনে করে সমাজ

ব্যক্তির সমবায়েই গঠিত এবং প্রত্যেক ব্যক্তিরই সামাজিক কার্য্য পরিচালনায় এবং কুসমাজের ধনসম্পদে সমান অধিকার আছে। বিজ্ঞান মানুষকে জগৎ ও জীবন দেখার নূতন দৃষ্টি দিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, পরোক্ষভাবে নূতন সমাজ শ্রেণীবিহীন শোষণমুক্ত সমাজ-প্রতিষ্ঠার প্রেরণাও যোগাইয়াছে। সে মানুষের অমৃতের সন্তান হওয়ার মর্য্যাদা কাড়িয়া লইয়াছে বটে, কিন্তু বিনিময়ে, মানুষকে, সামাজিক জীব হিসাবে পূর্ণ মর্য্যাদায় বাঁচার অধিকার দাবী করিতে প্রেরণা দিয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়েই—দেখা যায়, সমাজ-বিজ্ঞান বৈজ্ঞানিক সংস্কার লইয়া ব্যক্তি ও সমাজের পারস্পরিক সম্পর্ক, ব্যক্তির অধিকার, সমাজের ক্রমবিবর্ত্তনে এবং শ্রেণী বিভাগে উৎপাদন-বণ্টন ব্যবস্থার স্থান, শ্রেণীদ্বন্দ্বের উৎপত্তি ও পরিণতি, পুঁজিবাদী সমাজ-ব্যবস্থার উৎপত্তি শ্রীবৃদ্ধি এবং বিলয় প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে গভীর আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছে। মানব-সমাজকে এবং প্রত্যেকটি ব্যক্তিকে সর্বপ্রকার শাসনের ও শোষণের কবল হইতে মুক্ত করার আবেগ, উনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর প্রগতিশীল সমাজ-দর্শনের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই আবেগকে সংক্ষেপে—সমাজতান্ত্রিক বা সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আবেগ বলা যাইতে পারে। দেখা যায় বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বস্তুবাদও অধিকতর প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে এবং সর্বক্ষেত্রেই বাস্তবতার চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়াছে। দর্শনের ক্ষেত্রে এই বাস্তব-নিষ্ঠাকে আমরা বলিতে পারি—**দার্শনিক বাস্তববাদিতা** (Philosophical Realism) অধ্যাত্মবাদের সহিত বস্তুবাদের বিরোধ শাশ্বতিক। উনবিংশ শতাব্দী হইতে এই দ্বন্দ্ব তীব্র আকার ধারণ করিয়াছে। অধ্যাত্মবাদ কোণঠাসা হইলেও সংগ্রাম এখনও চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছায় নাই,—বস্তুবাদ অবিসংবাদিত আনুগত্য আজও লাভ করে নাই। অশিক্ষিত জনসাধারণ এখনও অন্ধ বিশ্বাসে এবং কুসংস্কারের পঙ্কেই ডুবিয়া আছে। যাহা হউক, দর্শনের ক্ষেত্রে বাস্তবাদিতা বলিতে কার্য্যতঃ বস্তুবাদী দর্শনকে স্বীকার করাই বুঝায় এবং সেই স্বীকৃতি অন্যতম আধুনিক মনোভাব।

এই বাস্তববাদিতার সাধারণ রূপ দেখা যায়—অতিপ্রাকৃতকে (superna-tural) বিশ্বাস না করায় অর্থাৎ জগৎ এবং জীবনকে প্রাকৃতিক সামগ্রী রূপে স্বীকার করায়। সুপারন্যাচারলিজম”—এর বিপরীত মতবাদকে, যদি “ন্যাচারালিজম” বলা যায়—বলা হইয়াও থাকে—তাহা হইলে বলিতেই হইবে দার্শনিক বাস্তববাদিতার সহিত প্রাকৃতবাদিতা (Naturalisn)অবিচ্ছেদ্য যোগেই যুক্ত। এই বাস্তববাদিতার বিশেষ একটি রূপ প্রকাশ পাইয়াছে—মানুষের জৈবিক সত্তাকে বড়ো করিয়া দেখার মধ্যে। এই প্রবণতাকে সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে—জীবতাত্ত্বিক বাস্তববাদিতা (বাওলজিকাল রিয়ালিজম ?) মনোবিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মনস্তত্ত্বের ক্ষেত্রেও বাস্তববাদিতার প্রসার ঘটিতে থাকে। মনস্তত্ত্বের ক্ষেত্রে বাস্তববাদিতার (Psychological Realism) প্রবণতা প্রকাশ পায়—মনের জগতেও কার্য্য-কারণ নিয়মের রাজত্ব স্বীকার করায় এবং মানসিক ক্রিয়ায় সংজ্ঞান-অসজ্ঞান-নির্জ্ঞান প্রক্রিয়ার অস্তিত্ব স্বীকার করায়। জীবতাত্ত্বিক যেমন ব্যক্তির মৌলিক বাসনার-রহস্য ব্যক্ত করিতে ব্যগ্র, মনস্তাত্ত্বিক তেমনি ব্যক্তি-মনের রহস্য ব্যক্ত করিতে প্রবণান্বিত। মনঃসমীক্ষণ শাস্ত্রের আলোকে ইহাদের দৃষ্টি নিয়ন্ত্রিত। মানসিক ক্রিয়ার জটিলতা প্রকাশ করার দিকেই ইহাদের ঝোক বেশী। সমাজতত্ত্বের ক্ষেত্রে যে বাস্তববাদিতা তাহাকে আমরা বলিতে পারি—সোসিয়োলজিক্যাল রিয়েলিজম। এ সম্বন্ধে আগেই আলোচনা করা হইয়াছে। সংক্ষেপে এখানে বলা যায় সমাজ-তাত্ত্বিক বাস্তববাদী বিশেষভাবে মানুষের সামাজিক জীবনকে শাসন-শোষণমুক্ত অবস্থায় উন্নীত করার স্বপ্ন দেখে—সাধনা করে বা প্রেরণা যোগায়। ব্যক্তি জীবনের সুখ-দুঃখকে ইহারা সমাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে স্থাপনা করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করে। শোষণ শাসনের বিরুদ্ধে অত্যাচার-অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা এবং মুক্ত জীবনের পক্ষে, শোষণমুক্ত সমাজব্যবস্থার পক্ষে সংগ্রাম করা ইহাদের বৈশিষ্ট্য। উনবিংশ-বিংশশতাব্দীর আধুনিকতা মূলতঃ এই সকল প্রবণতার মধ্যেই নিহিত। মোটামুটিভাবে বলা যাইতে

পারে—উল্লিখিত বাস্তববাদের মূল খাতেই প্রকৃত আধুনিকতার ধারা প্রবাহিত হইয়াছে। প্রাচীনের সহিত আধুনিকের পার্থক্য দেখাইতে হইলে—জীবন-দর্শনের তথা নানা মনোভাবের পার্থক্য নির্দ্দেশ করিয়াই দেখাইতে হইবে। পূর্ব্বের আলোচনা অনুসারে, প্রকৃত আধুনিক বলা যায় তাঁহাকেই যিনি বিজ্ঞান-সমর্থিত দার্শনিক বাস্তববাদে এবং তদানুষঙ্গিক মনস্তাত্ত্বিক, নৈতিক ও সমাজনৈতিক বাস্তববাদে পূর্ণ-মাত্রায় বিশ্বাসী। তবে দার্শনিক বাস্তববাদে বিশ্বাস না করিয়াও অর্থাৎ অধ্যাত্মবাদী দর্শনে বিশ্বাসী হইয়াও কেহ কেহ আধুনিকতার অন্যান্য প্রবণতা প্রকাশ করিতে পারেন : যেমন জীবন লীলাকে স্বরূপে ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করিতে পারেন—নিরাসক্ত চিত্তে প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির জটিল দ্বন্দ্বকে রূপ দিতে পারেন—অন্যায়ের বিরুদ্ধে, সমাজের ও ব্যক্তির স্বাধীনতার পক্ষে—ব্যক্তিত্বের পূর্ণবিকাশের সুযোগের জন্য সংগ্রাম করিতে পারেন অর্থাৎ জ্ঞাতসারে অজ্ঞাতসারে আধুনিকতার সাধারণ প্রবণতা প্রকাশ করিতে পারেন। তাই বলিয়া তাঁহাদের পূর্ণ আধুনিক বলা যাইতে পারে না।

শাশ্বত আধুনিকের লক্ষণ নিরূপণ করিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ যে কথা বলিয়াছেন এখানে তাহা উদ্ধৃত করা যাইতে পারে; তিনি লিখিয়াছেন—"আমাকে যদি জিজ্ঞাসা কর বিশুদ্ধ আধুনিকতাটা কী, তা হলে আমি বলব বিশ্বকে ব্যক্তিগত আসক্তভাবে না দেখে বিশ্বকে নির্ব্বিকার তদগত ভাবে দেখা। এই দেখাটাই উজ্জ্বল, বিশুদ্ধ; এই মোহমুক্ত দেখাতেই খাঁটি আনন্দ। আধুনিক বিজ্ঞান যে নিরাসক্ত চিত্তে বাস্তবকে বিশ্লেষণ করে, আধুনিক কাব্য সেই নিরাসক্ত চিত্তে বিশ্বকে সমগ্র দৃষ্টিতে দেখবে এইটেই শাশ্বতভাবে আধুনিক"। নিরাসক্ত চিত্তে বিশ্বকে সমগ্র দৃষ্টিতে দেখা আধুনিকতার শাশ্বত লক্ষণ হইতে পারে কিন্তু নিরাসক্ত চিত্ত কথাটির অর্থ খুব সুনির্দ্দিষ্ট নহে বলিয়া ভুল বুঝিবার যথেষ্ট অবকাশ আছে। সমগ্রদৃষ্টিতে দেখার মধ্যে দার্শনিক সংস্কার প্রবেশ করিতে বাধ্য। এই দার্শনিক সংস্কার যদি বৈজ্ঞানিকসিদ্ধান্ত-ভিত্তিক বস্তুবাদী দার্শনিক সংস্কার হয় তাহা হইলে—আমাদের দেওয়া আধুনিকতার লক্ষণের

সহিত কোন বিরোধ থাকিবে না। তাহা না হইলে নিরাসক্ত চিত্তে দেখাকে আধুনিকতার সামান্য লক্ষণ বলিয়াই গণ্য করিতে হইবে। কিন্তু বিশেষভাবে আধুনিক বলা যায় তাঁহাকেই যাহার মধ্যে আধুনিকতার বিশিষ্ট রূপটি সর্বতোভাবে অভিব্যক্ত—**যিনি পরাদর্শনে, সমাজ-দর্শনে, নীতি-দর্শনে, সবদর্শনেই আধুনিক—যিনি জ্ঞানে আধুনিক—অনুভবে আধুনিক এবং এষণাতে অধুনিক**। বলাবাহুল্য এই জাতীয় অধুনিক আধুনিকের পরাদর্শ। এই পরা-আদর্শে কেহ পৌছিয়াছেন কি না সে প্রশ্ন ভিন্ন বটে কিন্তু এই পরা-আদর্শের সহিত মিলাইয়া মিলাইয়াই আধুনিকতার মাত্রা তারতম্য বিচার করিতে হইবে; বিচারের অন্যকোন পথ নাই। অবশ্য সব আধুনিকই যে সমানভাবে সমস্ত প্রবণতা ব্যক্ত করিবেন এমন কোন কথা নাই। তাই প্রবণতার প্রাধান্য অনুসারে, আধুনিকদের আমরা নিম্নলিখিত শ্রেণীতে ভাগ করিতে পারি; তবে সর্বদাই মনে রাখিতে হইবে—এই শ্রেণী বিভাগ মোটামুটি বিভাগ মাত্র।

(ক) একশ্রেণীর আধুনিকের দৃষ্টি এবং সৃষ্টি জীব-বিজ্ঞান অনুশাসিত। ইহারা মৌলিক বাসনা কামনার বৃত্তের মধ্যেই মানুষকে আবদ্ধ করিয়া, বাসনার উলঙ্গ রূপটিকে প্রকাশ করিতে চাহেন। (খ) আর এক শ্রেণীর আধুনিকের দৃষ্টি ও সৃষ্টি মনঃসমীক্ষণ-শাসিত। মানসিক ক্রিয়ার জটিলতা—সংজ্ঞান-আসংজ্ঞান-নিজ্ঞান মনের রহস্যময় ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া রূপ দেওয়ার দিকেই ইহাদের ঝোঁক। ইহারা এক কথায়—মনস্তত্ত্ব-রসিক। (গ) আর এক শ্রেণীর আধুনিকের—দৃষ্টি সমাজ-নৈতিক সমস্যার ও উহার সমাধানের দিকে প্রধানতঃ নিবদ্ধ। ইহা খুবই মোটামুটি বিভাগ। ঝোঁকের প্রাধান্যই এই বিভাগের ভিত্তি।একাধিক ঝোঁক একজনের মধ্যে থাকিতে পারে এবং থাকেও। সুতরাং এই শ্রেণী চিহ্ন প্রযোগ করিবার আগে বিশেষ সতর্কতা আবশ্যক। অন্যথা উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে পড়িবে আশঙ্কা আছে এবং সে আশঙ্কা খুবই বেশী।

যাহা হউক প্রতীচ্যের এই সব আধুনিকতার প্রবণতা—(দার্শনিক

মনস্তাত্ত্বিক—, নীতিতাত্ত্বিক—, সমাজতাত্ত্বিক বাস্তববাদিতা—, প্রতীচ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে নাই। ঐ কূলের সব ঢেউই এই কূলে আসিয়া আঘাত দিয়াছে। উহারা যাহা সাধনা করিয়া লাভ করিয়াছে আমরা তাহা দান হিসাবে অনায়াসেই পাইয়াছি। উহাদের জীবনের সহিত সমান তাল রাখিয়া চলিতে না পারিলেও, উহাদের মননের অনুমনন করিতে, অথবা রীতি ও রুচির অনুকরণ করিতে আমাদের বাধে নাই। পিছনে পিছনে চলিলেও আমরা খুব পিছাইয়া থাকি নাই। উহাদের উনবিংশ বিংশ শতাব্দীর আধুনিকতা এবং আমাদের উনবিংশ বিংশ শতাব্দীর আধুনিকতার—মাত্রার দিক দিয়া সমান নহে, তবু উভয়ের মধ্যে স্পষ্ট একটা বিম্ব—প্রতিবিম্ব ভাব লক্ষ্য করা যায়।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে আজ পর্য্যন্ত, আধুনিকত্বের ক্রম বিকাশের ধারা পর্য্যালোচনা করিতে গেলে দেখা যাইবে—নানামুখী প্রবণতার অস্ফুট প্রকাশ হইতে সুপরিস্ফুট প্রকাশ পর্য্যন্ত আধুনিকতার সব রূপই কম বেশী আমাদের সাহিত্যে স্থান পাইয়াছে।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকে আমরা মোটামুটিভাবে নিম্নলিখিত পর্বে ভাগ করিয়া লইতে পারি :—

প্রথম পর্ব—১৮০০ হইতে ১৮৫৮ পর্য্যন্ত। ইহাকে "প্রস্তুতি পর্ব" বলা যায়। এই সময়ে, বাংলা ভাষা সংগঠিত হয়, বাংলা গদ্য-সাহিত্যের গোড়া-পত্তন হয়—প্রকাশ রীতিতে এবং প্রকাশ্য বিষয়েও নূতনের আবির্ভাব ঘটে—রামমোহন—দেবেন্দ্রনাথ, ঈশ্বরগুপ্ত, বিদ্যাসাগর মদনমোহন তর্কালঙ্কার, ভবানী চরণ প্রমুখ ব্যক্তিত্ব আশ্রয় করিয়া জাতির নূতন জীবন-স্পৃহা, সংকীর্ণতামুক্ত উদার জীবনের আকাঙ্ক্ষা অস্ফুটাকারে ব্যক্ত হয়।

দ্বিতীয় পর্ব—[১৮৫৮ (১৮৬৫) ১৮৭৩] বিদ্যাসাগর রঙ্গলাল—মধুসূদন বিহারীলাল—ভূদেব—দীনবন্ধু—বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতির যুগ। ১৮৬৫ খ্রীঃ বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাবে পর্বটির পশ্চিম দিগন্ত নূতন রশ্মির আলোকে উদ্‌ভাসিত

হইয়া উঠে—তৃতীয় পর্বের স্থচনা হয়। নূতন জীবনাবেগের তীব্র অনুভূতিতে, ইহাদের প্রত্যেকেরই শিরা উপশিরা, উষ্ণ রক্তের দ্রুত প্রবাহে চঞ্চল, দেহ-মনে রোমাঞ্চিত আবেশ-বিহ্বলতা, চোখে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন।

* **তৃতীয় পর্ব**—[১৮৭৩—(১৮৮০)—১৮৯৩]—বঙ্কিমচন্দ্র (কেন্দ্রপুরুষ) রমেশচন্দ্র, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, অক্ষয় বড়াল, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, গিরিশচন্দ্র—রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির যুগ। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের কিছুকাল পূর্ব হইতেই—রবীন্দ্রনাথের নূতন জ্যোতি সাহিত্যাকাশে নব প্রভা সঞ্চার করিয়া আসিয়াছে। নাট্যকার গিরিশচন্দ্রের উপস্থিতিও এই সময়ের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। জাতিকে সর্বতোভাবে মুক্ত করিবার জন্য—ইহারা যে সাধনা করিয়াছেন ব্যক্তির প্রাণ-মন-আত্মার মুক্তির জন্য যে আন্তরিক আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার আধুনিকত্ব বা প্রগতিশীলত্ব অবশ্য-স্বীকার্য্য।

চতুর্থ পর্ব—[১৮৯৩-১৯২০] রবীন্দ্রনাথ, গিরিশচন্দ্র, ক্ষীরোদপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্র লাল, প্রভাতকুমার, চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র, করুণানিধান, যতীন্দ্রমোহন কুমুদরঞ্জন, কালিদাস রায়, মোহিতলাল প্রভৃতির কাল। **পঞ্চম পর্ব**:—১৯২০ হইতে ১৯৪০ পর্য্যন্ত: **রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের যুগ বটে**, কিন্তু অতি আধুনিকতার কলকল্লোলে এই পর্ব মুখরিত। এই আধুনিক গোষ্ঠীর কালি কলমে সেই অতি-আধুনিকতার নূতন রঙ ও রেখার বৈচিত্র্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। **কাব্যে** রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, মোহিতলাল, নজরুল, যতীন্দ্র সেনগুপ্ত, জীবনানন্দ দাশ, জসিমুদ্দিন, অমিয় চক্রবর্ত্তী, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, মনীশ ঘটক, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সজনীকান্ত দাস, প্রমথনাথ বিশী, হুমায়ুণ কবীর, অজিত দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে প্রভৃতি, **গল্পে উপন্যাস**—রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, প্রভাতকুমার, নরেশ সেনগুপ্ত, মনীন্দ্র বসু, বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতি মুখোপাধ্যার, শৈলজানন্দ, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় * **বনফুল**, মনোজ বসু, মাণিক বন্দ্যো-পাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, অন্নদাশঙ্কর, প্রবোধ সান্যাল বুদ্ধদেব বসু, প্রভৃতি; **নাটকে**—রবীন্দ্রনাথ, বরদা দাশগুপ্ত, অপরেশ মুখোপাধ্যায়,

যোগেশ চৌধুরী, নিশিকান্ত বসু, ক্ষীরোদ প্রসাদ, অমৃত বসু, ভূপেন বন্দ্যোপাধ্যায়, শচীন সেনগুপ্ত, সতীশ ঘটক, জলধর চট্টোপাধ্যায়, মন্মথ রায়, বিধায়ক ভট্টাচার্য্য, **বনফুল**, মনোজ বসু, প্রভৃতির—রচনায় এই পর্ব সুসমৃদ্ধ

ষষ্ঠ পর্ব—১৯৪০ হইতে আজ পর্যন্ত অতি-আধুনিকতার দ্বিতীয় পর্ব। এই পর্বে পূর্ববর্তী পূর্ব্বের অনেকেই আছেন—আরো অনেকে আছেন, নূতন নূতন কবি কথা-সাহিত্যিক, নাট্যকার। **কাব্যে** জ্যোতিরিন্দ্র নাথ মৈত্র, দিনেশ দাস, সমর সেন, কামাক্ষী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, জগদীশ ভট্টাচার্য্য, মনীন্দ্র রায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, অশোক বিজয় রাহা, সুকান্ত, গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী, নীরেন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শিবদাস চক্রবর্ত্তী, জগন্নাথ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি **গল্পে-উপন্যাসে**—গোপাল হালদার, সুবোধ ঘোষ, সুশীল জানা, নরেন মিত্র, নারায়ণ গাঙ্গুলী, নবেন্দু ঘোষ, বিমল কর, সতীনাথ ভাদুড়ী, সন্তোষ ঘোষ, কুমারেশ বসু, সাবিত্রী রায়, সুবোধ মজুমদার প্রভৃতি এবং **নাটকে**—মহেন্দ্রগুপ্ত, অয়স্কান্ত বক্সী, প্রমথনাথ বিশী, বিজন ভট্টাচার্য্য, দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায়, তুলসীদাস লাহিড়ী, শশিভূষণ দাশগুপ্ত, প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র, ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণ গাঙ্গুলী, শীতাংশু মৈত্র প্রভৃতি।

বলা বাহুল্য—প্রত্যেক পর্ব্বে প্রত্যেক বিভাগেই আরো বহু নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। বিস্তার ভয়ে যাঁহাদের নাম উল্লিখিত হয় নাই, তাঁহাদের রচনার মূল্য যে উল্লিখিতনামাদের রচনার মূল্য হইতে সবদিক দিয়াই কম তাহা যেন কেহ মনে না করেন। আর একটা কথাও স্মরণ করাইয়া দেওয়া দরকার। আধুনিক যুগের লেখকমাত্রেই সর্বতোভাবে আধুনিক—এ কথা মনে করিলেও ভুল করা হইবে। আধুনিকতার সাধারণ লক্ষণ অনেকের মধ্যেই পাওয়া যাইবে বটে, কিন্তু বিশেষ লক্ষণটি—অর্থাৎ দার্শনিক বাস্তবাদিতা—জীবতাত্ত্বিক-মনস্তাত্ত্বিক বাস্তববাদিতা এবং সমাজতাত্ত্বিক বাস্তববাদিতা প্রভৃতির মধ্যে আধুনিকতার যে বিশেষ লক্ষণ রহিয়াছে—তাহা কম লেখকের মধ্যেই পূর্ণ মাত্রায় পাওয়া যাইবে। আমরা দেখিতে পাই—অনেকেই অধ্যাত্মবাদের গণ্ডী পার হইতে পারেন নাই। তবে জীবনের রূপকে যথাসম্ভব

অনাসক্তভাবে আঁকিতে গিয়া আধুনিক প্রবণতার একাধিক প্রবণতা প্রকাশ করিয়াছেন। কেহ কেহ দার্শনিক বাস্তববাদিতা খুব সচেতন ভাবে গ্রহণ করিতে না পারিলেও—অজ্ঞাতসারেই জীবতাত্ত্বিক ও মনস্তাত্ত্বিক বাস্তববাদের খানিকটা মোটামুটিভাবে গ্রহণ করিয়াছেন, কেহ কেহ সমাজ সমস্যা ও শোষণ সমস্যা সম্বন্ধে সচেতন হইয়াছেন বটে, কিন্তু সমাজতান্ত্রিক সাম্যবাদী সমাজ ব্যবস্থার রূপটিকে স্পষ্টভাবে ধ্যানের ধনে পরিণত করিতে পারেন নাই। সুতরাং নামে আধুনিকের সংখ্যা যত বেশী, কার্য্যে আধুনিকের সংখ্যা ততো বেশী হইবে না।

* * * * *

"**বনফুল**"—পর্ব-বিভাগ অনুসারে—পঞ্চম পর্বেব (ষষ্ঠ পর্বেরও) সাহিত্যিক। ১৯১৮ হইতে আজ পর্য্যন্ত বনফুল তাঁহার সৌরভ বিতরণ করিয়া আসিতেছেন। বাংলা কথা সাহিত্যের প্রাঙ্গন বনফুলের বর্ণে-গন্ধে আমোদিত। কবিতা-গল্প উপন্যাস-নাটকে বনফুলের যেন শতদল বিকাশ—পাঁপড়িতে পাঁপড়িতে বর্ণ-গন্ধের বিচিত্র বাহার। কবিতা ও নাটকে তাঁহার দান যাহাই হউক, গল্প-উপন্যাসে বনফুল একাই একশো। সমগ্র রচনার মধ্যে, ভাবনা-কল্পনা-অনুভব শক্তির বিভূতি লইয়া যে "বনফুল" আপনাকে ব্যক্ত করিয়াছেন তাহার স্বরূপ এক নজরে ধরিবার মতো নহে।

"বনফুল" বনফুল হইতে পারেন, কিন্তু খুব গহন বনের ফুল নহেন—বুনো ফুল নহেন। পরিচয়ে প্রকাশ—"১৩০৬ বঙ্গাব্দে পূর্ণিয়া জেলার মনিহারি গ্রামে জন্ম। আদিবাস হুগলি জেলার শেয়াখালায়। শিক্ষা মনিহারি ও সাহেবগঞ্জ ইস্কুলে। পরে হাজারিবাগ থেকে আই-এস-সি পাস করে কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে ডাক্তারি পড়েন; ফাইনাল পরীক্ষা দেবার ঠিক আগে পাটনায় মেডিক্যাল কলেজ খোলে এবং বিহারের প্রবাসী ছাত্রদের সেখানে যোগদান করতে বাধ্য করা হয়। ১৯২৭ অব্দে সেখান থেকে এম, বি, বি, এস

পাশ করেন। কলিকাতায় কিছুকাল ডাক্তার চারুব্রত রায়ের সহকারীরূপে ল্যাবরেটারির কাজ করেন। পরে মুর্শিদাবাদ জেলার আজিমগঞ্জ হাসপাতালে মেডিকাল অফিসার হন। এখন ভাগলপুরে থাকেন" (বনফুলের শ্রেষ্ঠ গল্প) উদ্ধৃত পরিচায়িকাংশ হইতে জানা যাইতেছে—বনফুল অতি দুর্গম বন প্রদেশের ফুল নহেন এবং বুনো ফুলও নহেন। শিক্ষাদীক্ষার অভাব তাহার ঘটে নাই। যুগের সেরা শিক্ষা—ইংরেজী শিক্ষা—বিশেষতঃ বৈজ্ঞানিক শিক্ষাই তিনি পাইয়াছেন। আর যে বৃত্তিটি তিনি গ্রহণ করিয়াছেন তাহাও এক হিসাবে বৈজ্ঞানিকেরই বৃত্তি—"ডাক্তারি"।

অবশ্য, বৈজ্ঞানিক শিক্ষা পাওয়া বা বৈজ্ঞানিকের বৃত্তি গ্রহণ করা—বড়ো কথা নহে। বড়ো কথা হইলে, এতদিনে অতিপ্রাকৃতে-বিশ্বাসমূলক আচার-বিচার কুসংস্কার অনেক পরিমাণে কমিয়া যাইত। সুতরাং বড়ো কথা—**বৈজ্ঞানিক সংস্কারটি** পাওয়া—জগতকে ও জীবন-লীলাকে বিজ্ঞান-স্থাপিত সিদ্ধান্তের আলোকে দেখা। যতটুকু বুঝা যায়—বনফুলের মধ্যে বিজ্ঞানের-দেওয়া শিক্ষা পাকা সংস্কারে পরিণত হইয়াছে এবং তাঁহার দার্শনিক দৃষ্টিকোণে অতিপ্রাকৃতের মর্য্যাদা তেমন নাই। "নেচারালিজম্‌" যে অর্থে "সুপার নেচারালিজম"এর বিপরীত সেই অর্থে বনফুল মোটামুটি প্রাকৃতবাদী (naturalist)। অর্থাৎ অতিপ্রাকৃত কোন দৈবশক্তিতে তিনি ততো বিশ্বাসী নহে। তাহাই তিনি বিশ্বাস করেন যাহা যুক্তি-সিদ্ধ—যাহা অভিজ্ঞতা লব্ধ। তবে তাঁহার রচনায় অতিপ্রাকৃত-জগতে-বিশ্বাসের উপদান না মিশিয়াছে এমন নহে, কিন্তু সেগুলি আসিয়াছে—প্রাকৃতকে প্রতিষ্ঠা করিবার উপায় হিসাবেই—রচনার আঙ্গিক হিসাবেই—মানুষের আচরণে অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাসের ও সংস্কারের প্রভাব দেখাইবার প্রয়োজনেই। বনফুল অদৃশ্য লোকের কাহিনী বলিয়াছেন দৃশ্যলোকের মানস-সত্যকে সংকেতে ব্যক্ত করিবার জন্যই। অপ্রাকৃত প্রায় কাহিনীগুলির উদ্দেশ্যও একই। যেমন :—'অধরা' গল্পের অধরার চোখের জল—বরফের মত ঠাণ্ডা…বৃষ্টির জল মাত্র। 'প্রজাপতি' গল্পে

দ্বিতীয়বার বিবাহ সম্মতির পরেই আশার কণ্ঠস্বর এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রজাপতির উড়ে যাওয়া, মনস্তাত্ত্বিক সংকেত মাত্র। "মালা বদল" গল্পের "অপরূপ-রূপসী" গানের সুরের রূপকমাত্র। "একই ব্যক্তি" গল্পে অদৃশ্য লোকের সাহায্যে বনফুল একই ব্যক্তির মুখ ও মনের অনৈক্যটি দেখাইতে চাহিয়াছেন। আমার মনে হয়—"ছাত্র" গল্পটিতেই বনফুলের প্রাকৃতবাদিতার বড় প্রমাণ পাওয়া যায়। মানুষের আচরণ তো শুধু তাহার সংজ্ঞান সত্তার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয় না আসংজ্ঞান-নির্জ্ঞানের অংশও সেখানে আছে। বহু দিনের সংস্কার মানসিক প্রবণতারূপে ভিতরে থাকিয়া মানুষকে এমন সব কাজ করায় যাহার সহিত মানুষের সংজ্ঞান সত্তার কোন যোগই নাই।

বনফুল থার্ড মাষ্টারকে স্বপ্নে দেখিয়া উত্তপ্ত বালির চড়া ভাঙিয়া তিনক্রোশ দূরবর্ত্তী গঙ্গায় তর্পণ করিতে ছুটেন বটে কিন্তু 'নিজের অযৌক্তিক আচরণে নিজেই বিস্মিত' হন। ফ্রয়েড চার্ব্বাক যিনি পড়িয়াছেন—বিজ্ঞানের বই যাঁহার খুব প্রিয় এবং প্রায়ই পড়েন—তাহার কাছে তর্পণ অবশ্যই 'অযৌক্তিক আচরণ' হইবে। এই রচনাগুলিতে রহস্যবাদের ছোঁয়াচ আছে বটে, কিন্তু এ রহস্য অতিপ্রাকৃতের অস্তিত্বের রহস্য নয়—মনের রহস্য—মানুষের জটিল আচরণের রহস্য। এই কারণেই বনফুলকে প্রচলিত অর্থে রহস্যবাদী বা অতিপ্রাকৃতবাদী বলা ঠিক হইবে না। অবশ্য 'অদৃশ্যলোকে' গল্প-গ্রন্থের দুই একটি গল্পে—যেমন "নন্দীক্ষ্যাপা", "স্বপ্ন", "হিসাব"—অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাসের ছোঁয়াচ না লাগিয়াছে এমন নহে। তবে এই জাতীয় গল্প লেখায় বনফুলের "সাহিত্য ধর্মের জন্মান্তর" বা 'শিল্পীর নবজন্ম' সূচিত হইয়াছে—এ কথা বলা যায় না। বনফুলের নিজের ঘোষণা মনে রাখা দরকার—মনে রাখা দরকার তিনি ফ্রয়েড চার্ব্বাক পড়া লোক। তাঁহার নিজেরই স্বীকৃতি—বিজ্ঞানের বই আমার খুব প্রিয়—প্রায়ই পড়ি। কবি—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জগদীশ ভট্টাচার্য্য মহাশয় 'বনফুলের শ্রেষ্ঠ গল্পের ভূমিকায় এ সম্পর্কে যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা উল্লেখযোগ্য।—"জীবন সম্পর্কে যেমন তাঁর কোনো অতীন্দ্রিয় মোহ নেই;

তেমনি কোনো বিশেষ আদর্শের প্রতিও তাঁর অকারণ অনুরক্তি নেই। দার্শনিক পরিভাষায় যাকে তটস্থ দৃষ্টি বলে, তাঁর দৃষ্টি সেই দৃষ্টি। জীবন সত্যের নিরীক্ষায় কোনো পূর্বধার্য তত্ত্বের অনুশাসন স্বীকার না করে সর্ব্ব সংস্কারমুক্ত দৃষ্টির সম্মুখে বহু পরীক্ষা ও বহু পর্য্যবেক্ষণের সাহায্যে জীবনকে জানার যে আবেগ, তাঁর ব্যক্তি মানসে সেই আবেগই প্রত্যক্ষভাবে ক্রিয়াশীল।"

যাহা হউক, বনফুল চার্ব্বাক-পন্থী দর্শন পড়িয়াছেন এবং খুব সম্ভব বেশী করিয়া পড়িয়াছেন ফ্রয়েডকে অর্থাৎ মনোবিজ্ঞান। এক কথায়, বনফুল মনস্তত্ত্ব-প্রসক্ত, মনস্তত্ত্বরসিক। এই প্রসক্তি তাঁহার শিল্পি-সত্তাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছে। কত কি প্রভাব বিস্তার করিয়াছে তাহা সম্যক জানিতে হইলে, প্রত্যেকটি গল্প-উপন্যাসের রীতি এবং বস্তু বিশ্লেষণ করিয়া দেখা দরকার। এখানে সে অবকাশ নাই। দিগ্‌দর্শন হিসাবে—'সে ও আমি' 'বৈতরণী তীরে' 'অগ্নি' প্রভৃতি মনঃসমীক্ষণ-প্ররোচিত-'রীতি'র উপন্যাসগুলির দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। মনঃসমীক্ষণ শাস্ত্রের প্রভাব, বনফুলকে আশ্রয় করিয়া আমাদের সাহিত্যে ভালভাবে অনুপ্রবেশ করিয়াছে—এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে। পূর্ব্বে আমরা যে মনস্তাত্ত্বিক বাস্তববাদিতার কথা বলিয়াছি, বনফুলের মধ্যে আধুনিকতার সেই প্রবণতারই একটা বিশেষরূপ লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু তাই বলিয়া একথাও ভুলিয়া গেলে চলিবে না—বনফুলের উপস্থাপনা-রীতি অনেকটা সংকেত-ধর্মী অর্থাৎ যাহাকে যথার্থ 'রিয়েলিষ্ট' বলে বনফুল তাহা নহেন। জীবন-সত্যকেই তিনি রসরূপ দিয়াছেন বটে, কিন্তু যে রূপ-কল্পনা বা অঙ্গরচনা তিনি করিয়াছেন তাহাতে বাস্তবিকতা অপেক্ষা সাংকেতিকতা বা ভাবতান্ত্রিকতাই বেশী প্রশ্রয় পাইয়াছে। তাহার রচনা পড়িয়া একথা মনে না হইয়া পারে না—কোথাও বনফুল মনস্তত্ত্বের ছাঁচে ফেলিয়া জীবন দেখিয়াছেন, কোথাও জীবনের রূপে মনস্তত্ত্বের মিল দেখিয়াছেন। এই কারণেই—'সাইকোলজিক্যাল রিয়েলিজম' প্রবণতা থাকা সত্ত্বেও বনফুল পুরোদস্তর

'রিয়েলিষ্ট' হইতে পারেন নাই। পারেন নাই—অবশ্য স্বীকার্য্য, কিন্তু কেন পারেন নাই—বিচার্য্য বিষয় বটে। না-হইতে-পারার কারণ—মনে হয়—বনফুলের **স্বভাবের** মধ্যে—'রসিক' স্বভাবের মধ্যে—নিহিত আছে। মনস্তত্ত্ব-প্রসক্তি একটা কারণ বটে, কিন্তু কারণের সবটা নয়। যে যে কারণের সংযোগে বনফুল 'হাস্য-রসিক' (হিউমারিষ্ট) হইয়াছেন তাহার সব কয়টি নির্দ্ধারণ করিতে না গিয়া, সংক্ষেপে এখানে বলা যাইতে পারে—বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞতা, চার্ব্বাক-পন্থী দর্শনের দৃষ্টি এবং ফ্রয়েডপন্থী মনোবিজ্ঞানের সমীক্ষণ-শক্তি, মিলিতভাবে, বনফুলের মনোভঙ্গীটিকে (attitude) হিউমারিষ্টের মনোভঙ্গীতে পরিণত করিয়াছে। বনফুলের শিল্পি-সত্তার কেন্দ্রে আছেন এক **হিউমারিষ্ট**—"**রসিক-পুরুষ**"—জগৎ ও জীবনকে স্বরূপে দেখিবার অনাসক্ত অথচ সন্ধানী দৃষ্টি তাঁহার চোখে, জৈবিক ও সামাজিক প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির শক্তি-ক্ষেত্র রূপে জীবনের লীলাকে পর্যবেক্ষণ করায় তাহার আনন্দ, মনোবিজ্ঞানীর সমীক্ষণ-শক্তি লইয়া মানসিক ক্রিয়াকলাপের রহস্য খুঁজিয়া খুঁজিয়া বাহির করায় তাঁহার আমোদ। একদিকে বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞতা, অন্যদিকে অনাসক্ত কৌতূহলী দৃষ্টি আর সঙ্গে চতুর্দিকে জীবনাদর্শের বিকৃতি ও অস্বীকৃতি—সকলে মিলিয়া বনফুলকে যেন এক 'laughing philosopher'-এ পরিণত করিয়াছে। এই রসিকের চোখে উগ্রশক্তিসম্পন্ন ত্রিশির আতস কাচ (প্রিজম্)। খোলা চোখে দেখিতে যাহা শাদা, এই কাচের সম্মুখে পড়িয়া তাহা সাতরঙে বিশ্লিষ্ট হইয়া গিয়াছে। জীবন-রসিক বনফুল এই কাচের ভিতর দিয়া জীবনের রূপ ও ভাব নিরীক্ষণ করিয়াছেন ফলে তাহার দৃষ্টিতে, শাদা হাসিকে ঘিরিয়া কান্নার এবং কালো কান্নার চারিপাশে হাসির বর্ণালী ফুটিয়া উঠিয়াছে। হাসি-কান্নার শাদা-কালো বর্ণের সংমিশ্রণ করিয়া, বর্ণবিচিত্র রসশবল জীবনের রূপ আঁকিবার শক্তি, এই মনঃসমীক্ষণের উৎস হইতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছে। করুণের মধ্যে হাস্যকর এবং হাস্যকরের মধ্যে করুণ আবিষ্কার করিবার শক্তি উচ্চাঙ্গের রসিকের মধ্যেই দেখা যায়। বনফুলও সেই শক্তির অধিকারী। মনস্তত্ত্বের পাকা জ্ঞান এবং

পর্যবেক্ষণ-শক্তি—দুয়ে মিলিয়াই বনফুলের এই অধিকারকে পাকা করিয়াছে। বনফুল স্বভাবে—রসিক বলিয়াই এমনটি ঘটিয়াছে।

তবে, মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের আলোকে দেখিলে দেখা যাইবে—রসিকতার জন্মভূমি অবচেতন মনের অবদমিত প্রদেশ। উইট বা হিউমারের সহিত অবচেতন মনের নিকট সম্পর্ক আছে (জিজ্ঞাসু পাঠক—ফ্রয়েড রচিত "wit and its Relation to the unconscious"-গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া উপকৃত হইবেন)। বনফুল যদি রসিক হইয়া থাকেন, নিশ্চয়ই তাহার অবচেতন মনে অবদমন ঘটিয়াছে বলিয়াই হইয়াছেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—একদিকে বনফুলের দার্শনিক বিজ্ঞতা এবং চতুর্দিকে জীবনাদর্শের বিকৃতি বা অস্বীকৃতি বনফুলকে হিউমারিষ্ট করিয়া তুলিয়াছে। যে বলিষ্ঠ জীবনাদর্শকে তিনি প্রতিষ্ঠিত দেখিতে চাহেন—কায়মনোবাক্যের যে পূর্ণ সামঞ্জস্য তিনি কামনা করেন সেই সব বাসনা পরিপূরণ করিতে না পারিয়াই, বোধ হয়, বনফুল 'হিউমারিষ্ট'। প্রত্যেক অবদমনের সহিত, বেশী কম ব্যথা ও জ্বালা মিশিয়া থাকে। জীবনের নিরুপায় অথচ হাস্যকর আচরণ দেখিয়া বনফুল যেমন ব্যথিত হইয়াছেন, তেমনি ভণ্ডামি ন্যাকামি দেখিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছেন। তাহার এক হাতে মার্জ্জনী, এক হাতে সম্মার্জ্জনী॥ যেমন সরল পাপীকে বা বোকাকে স্নেহ করিতে তাঁহর কুণ্ঠা নাই, তেমনি ভণ্ড ন্যাকাকে ব্যঙ্গের আঘাতে জর্জ্জরিত করিতেও তিনি বিগতকুণ্ঠ। অনাসক্তি-যোগ হইতে রসিক মাঝে মাঝে ভ্রষ্ট না হইয়াছেন এমন নহে। উদার সমবেদনার গণ্ডী মাঝে মাঝে অতিক্রম করিয়াছেন এবং শ্লেষ-ব্যঙ্গের স্তরে নামিয়া আসিয়া আঘাত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

বনফুল স্বভাবে রসিক হইলেও লঘু রসিক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত নহেন। সেই জাতীয় রসিক তিনি—যাঁহারা জীবনের বিচিত্র রস-রূপটি সহজেই প্রত্যক্ষ করিতে পারেন—বস্তুরূপকে রসরূপে মিলাইয়া লইবার সাধনায় যাহারা সিদ্ধি-লাভ করিয়াছেন। বাস্তবিক বিষয়বস্তু বা প্লেটের অভাব কাহাকে বলে তাহা

বনফুল জানেন না। ভস্মকে স্বর্ণমুষ্টিতে পরিণত করিবার যাদু যেন তাঁহার করায়ত্ত। ধূলিকে ফু দিয়া চিনি করিতে তাহার মতো আর কে পারিয়াছেন? জীবনের 'ভূয়োদর্শন', 'বিন্দু-বিসর্গ' কিছুক্ষণের অভিজ্ঞতা—সব কিছুকেই যিনি রসরূপ দিতে পারেন, তাহাকে সহজ রসিক বলা গেলেও সামান্য রসিক বলা যায় না। 'গল্পে', 'আরও গল্পে' ও 'বাহুল্যে'—বনফুলের এই যাদুকরী নিদর্শন ছড়ানো রহিয়াছে। সত্য বটে, এই রসিকতা করিবার ঝোঁক বনফুলের স্বভাবের অঙ্গ কিন্তু তাই বলিয়া শিল্পী বনফুল রসিকতার সংকীর্ণ গণ্ডীতেই নিজেকে আবদ্ধ রাখেন নাই। জীবনের রূপকে যেমন রসিক-চিত্তের রস-রূপের আদর্শে আঁকিবার চেষ্টা করিয়াছেন—বিষয়কে আত্মসাৎ করিয়াছেন; তেমনি আবার জীবনের রূপের কাছে, জীবনের আদর্শের কাছে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। শুধু রসিকের দৃষ্টিতে নয়, বিষয়ানুরাগী শিল্পীর দৃষ্টিতে জীবনের রূপ আঁকিবার চেষ্টা করিয়াছেন অর্থাৎ আত্মাকে যথাসম্ভব বিষয়সাৎ করিয়া দিয়াছেন। তাই জীবনের বিকৃতি, অসমাঞ্জস্য প্রভৃতি পরিহাস্য বিষয় লইয়া সদয় বা নির্দ্দয় রসিকতা করিবার প্রবণতার পাশেই জীবনের আবর্ত্ত সঙ্কুল গুরু-গম্ভীর ও দ্বন্দ্ব-সংক্ষুব্ধ রূপটিকে উপস্থাপিত করিবার চেষ্টাও দেখা দিয়াছে। 'তৃণখণ্ডে'র মতো জীবন কালের স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে, সেই স্রোতে কত আবর্ত্ত, কত বাঁকা স্রোতের এলোমেলো সর্পিল গতি! "রাত্রি"র জীবনের মতো গভীর অন্ধকার জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে জমাট বাঁধিয়া আছে। "সেও আমি"র বুঝাপড়া করিতে গিয়া জীবনের হয়রানি, "বৈতরণী তীরে"র যবনিকার উপরে তৃষ্ণাতুর জীবনের আত্মপ্রতিষ্ঠার-সংগ্রাম, 'দ্বৈরথে'র দ্বন্দ্ব, 'মানদণ্ডে'র উঠানামা, 'অগ্নি'র শিখা এমনি কত 'স্থাবর' 'জঙ্গম' জীবনের রূপ, কত 'স্বপ্নসম্ভব' অনেক কিছু বনফুলের কবিকল্পনায় স্থান করিয়া লইয়াছে। জীবনকে কমেডি-কারসুলভ রসিকতার দৃষ্টিতে দেখিয়াই বনফুল ক্ষান্ত হন নাই, ট্র্যাজেডি লেখকের গাম্ভীর্য্য বেদনা লইয়াও তিনি জীবনের গভীর রহস্য ও বেদনাবিধুর রূপ অঙ্কন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তবে মনস্তত্ত্বরসিকের ব্যক্তিত্বের স্পর্শ যে সর্ব্বত্রই আছে রীতি

ও চরিত্র সৃষ্টি লক্ষ্য করিলেই বুঝা যাইবে। পূর্ব্বেই এ সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে বনফুলে মনস্তাত্ত্বিক বাস্তববাদিতার প্রবণতা প্রকাশ পাইয়াছে বটে, কিন্তু মনস্তত্ত্ব-প্রবণতার ফলেই, উপস্থনারীতিতে বাস্তবিকতা অপেক্ষা সাংকেতিকতাই বেশী মাত্রায় ব্যক্ত হইয়াছে। "সে ও আমি" 'বৈতরণী তীরে' 'অগ্নি' প্রভৃতি উপন্যাসের রচনা রীতি লক্ষ্য করিলেই এই সত্য উপলব্ধি করা যাইবে। অবশ্য 'সেও আমি' বা 'বৈতরণী তীরে' উপন্যাসে যে বিষয়বস্তু উপস্থাপ্য হইয়াছে তাহাতে সাংকেতিক রীতিই শরণ্য হইবে, ইহাই স্বাভাবিক। আসংজ্ঞানকে (নির্জ্ঞানকেও) 'সে' ব্যক্তির ভূমিকায় দাঁড় করাইতে গেলে এইরূপ রূপক জাতীয় প্রকাশরীতি অনিবার্য্য। তারপর বৈতরণী তীরেও যাহারা সমবেত হইয়াছে তাহাদের আনাগোনার জন্য লেখকের স্মৃতিপট দিবাস্বপ্ন এবং সিনেমেটোগ্রাফিক রীতি আবশ্যক। 'অগ্নি' উপাসক অংশুমানও 'দিবাস্বপ্ন' যোগে বিগত অগ্নি সাধকদের সহিত বারবার মিলিত হইয়াছেন এবং অংশুমানের নিভন্ত অগ্নিতে তাঁহারা তেজ সঞ্চার করিয়াছেন। দিবাস্বপ্ন বাস্তব ব্যাপার হইলেও বিশেষ অবস্থা বা মাত্রার সীমা ছাড়াইয়া গেলে, অবাস্তবিক না হইয়া পারে না। মনস্তত্ত্বের নানা ব্যাপার—যেমন স্বপ্ন, দিবাস্বপ্ন, ভাবানুষঙ্গ ভ্রান্তি, বিভ্রান্তি প্রভৃতি বনফুলের রচনা রীতিতে বিশেষ স্থান, অধিকার করিয়া আছে। **ফলে শিল্পী বনফুল খুবই রীতি-সচেতন স্রষ্টা।** অদ্ভুত পরিস্থিতি অদ্ভুত চরিত্র এবং অদ্ভুত রীতি রচনার দিকে তাঁহার বিশেষ প্রবণতা রহিয়াছে। মনস্তত্ত্ব রসিকতার উৎস হইতেই যে এই প্রবণতার জন্ম হইয়াছে—এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে। বনফুলের রচনার বাস্তবতা মাঝে মাঝে অনেকটা **সুররিয়েলিজমের রিয়েলিজম** এর স্তরে পৌছিয়া গিয়াছে। গল্প যেন গদ্য কবিতা হইয়া উঠিয়াছে। ('কবচ' গল্পটি দ্রষ্টব্য) গল্পে-উপন্যাসে 'সাবজেকটিভিটি'র রস-রূপ সঞ্চার করিবার তথা নানা রূপরীতি প্রবর্তন করিবার জন্য বনফুল স্বতন্ত্র মর্য্যাদায় চিরকাল প্রতিষ্ঠিত ও স্মরণীয় থাকিবেন॥

বনফুলের রচনার তালিকা

[ক] **কবিতা** (ব্যঙ্গকবিতা)

বনফুলের কবিতা (১৩৩৬)

অঙ্গারপর্ণী (ইং ১৯৪০)

করকমলেষু (বনফুলের কবিতার পরিবর্ত্তিত আকার) (১৩৫৬)

কবিতা (গম্ভীর কবিতা)

আহবণীয় (ইং ১৯৩০)

চতুর্দ্দশী (১৩৪৭)

[খ] **উপন্যাস**

১। তৃণখণ্ড (১৩৪২)
২। বৈতরণী তীরে (১৩৪৩)
৩। দ্বৈরথ (১৩৪৪)
৪। কিছুক্ষণ (১৩৪৪)
৫। নির্মোক (১৩৪৭)
৬। মৃগয়া (১৩৪৭)
৭। রাত্রি (১৩৪৮)
৮। সে ও আমি (১৩৫০)
৯। স্বপ্ন-সম্ভব (১৩৫০)
১০। জঙ্গম [৩ খণ্ড] (১৩৫০-৫২)
১১। সপ্তর্ষি (১৩৫২)
১২। অগ্নি (১৩৫৩)
১৩। ডানা (১ম খণ্ড) (১৩৫৩)
" (২য় খণ্ড) (১৩৫৭)
" (৩য় খণ্ড) (১৩৬২)

১৪। মানদণ্ড (১৩৫৫)

১৫। নবদিগন্ত (১৩৫৬)

১৬। স্থাবর (১৩৫৮)

১৭। কোষ্টিপাথর (১৩৫৮)

১৮। পিতামহ (১৩৬১)

১৯। পঞ্চপর্ব (১৩৬১)

২০। লক্ষ্মীর আগমন (১৩৬১)

[বিদেশী বই হইতে 'এডাপ্‌টেশন্‌]

২১। নঞতৎপুরুষ (১৩৫৩)

[ডষ্টয়ভ্‌স্কির Eternal Husband হইতে]

২২। ভীমপলশ্রী

Ben Travers-এর Cuckoo in the Nest হইতে

২৩। নিরঞ্জনা (১৩৬২)

[আনাতোল ফ্রান্সের 'থেইস' হইতে]

[গ] ছোটগল্প

১। বনফুলের গল্প

২। বনফুলের আরও গল্প (১৯৩৮)

৩। ভূয়োদর্শন (১৯৪২)

৪। বিন্দুবিসর্গ (১৩৫২)

৫। অদৃশ্যলোকে (১৯৪৬ ?)

৬। আরও কয়েকটি (১৩৫৪)

৭। বনফুলের শ্রেষ্ঠ গল্প (চয়নিকা) (১৩৫৫)

৮। কিশোর-কিশোরী (ছোটদের গল্প) [১৩৫৮]

৯। তন্বী (১৩৫৯)

১০। নবমঞ্জরী (১৩৬১)

১১। বনফুলের সম্পূর্ণ গল্প সংগ্রহ (১৩৬২)

১২। বাহুল্য [?]

[ঘ] প্রবন্ধ

উত্তর (১৩৬০)

শিক্ষার ভিত্তি (১৩৬২)

[ঙ] নাটক

মন্ত্রমুগ্ধ (চিত্রনাট্য) (১৯৩৮)

শ্রীমধুসূদন (১৩৪৬)

বিদ্যাসাগর (১৩৫৮)

রূপান্তর (১৩৫২)

দশভাণ [১৩৫১]

মধ্যবিত্ত (?)

বন্ধনমোচন [১৩৫৫]

কঞ্চি [১৩৫৩] (দ্বিতীয় সংস্করণের কাল)

"সিনেমার গল্প" [১৩৫১-৫২] দ্বৈরথ গল্পের নাট্যচিত্র—
"সিনেমা ড্রামা" জাতীয়।

* [তালিকা প্রস্তুত করিতে শ্রদ্ধেয় 'বনফুল' আমাকে আশাতীত সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহার সাহায্য না পাইলে এইরূপ একটি পরিপাটি তালিকা প্রস্তুত করিতে পারিতাম না।]

নাট্যকার বনফুল

'বনফুল' বলিতে, প্রথমেই আমাদের মনে **কথা-সাহিত্যিক** বনফুলের মূর্তিটি জাগিয়া উঠে—বনফুলের **মনস্তত্ত্বরসিক-হাস্যরসিক-জীবনরসিক** ব্যক্তিমানসটি ভাসিয়া উঠে। 'কবি-বনফুল'কে বা 'নাট্যকার-বনফুল'কে এমন করিয়া 'কথা-সাহিত্যিক' আচ্ছন্ন করিয়া আছেন যে, কথা-সাহিত্যিকের পাশ দিয়া উঁকি মারিয়া যেন কবিকে বা নাট্যকারকে দেখিতে হয়। অথচ কবি বনফুলের বা নাট্যকার বনফুলের স্বকীয় মহিমাও কম নয়। কথা-সাহিত্যিক বনফুলের মতো, তাহাদেরও স্বকীয়ত্ব আছে। কাব্যের ও নাটকের বনফুলী সৌরভ যথেষ্টই আছে। তবে সেখানেও সেই একই জীবন-দেবতা। বনফুল যেখানে প্রকৃতিস্থ—স্বরূপে অবস্থিত সেখানে তিনি পূর্বোক্ত রসিক-রূপেই প্রকাশিত অর্থাৎ যেখানে তিনি **আপনাকে** প্রকাশ করিয়াছেন সেখানে তাহার মনস্তত্ত্ব-রসিক বা হাস্য-রসিক সত্তাই বেশী করিয়া প্রকাশিত হইয়াছে, আর যেখানে তিনি অপর কোন সিদ্ধবস্তুকে রূপ দিয়াছেন সেখানে "রসিক" বিষয়-রসের অধীনতা স্বীকার করিয়াছে। নাটকের ক্ষেত্রে দেখা যায়—খাঁটি মৌলিক রচনার ক্ষেত্রে বনফুল **মন্ত্রমুগ্ধ** নামক প্রহসন (১০-৩-৩৮ নিবেদন-কাল) **"কঞ্চি"** নামক একখানি প্রহসন-ঘেঁষা কমেডি, **বন্ধনমোচন** (কমেডি), **মধ্যবিত্ত** (কমেডি) এবং **"দশভাণ"** নামক দশটি একাঙ্কিকা (০-৬-৪৪ উৎসর্গকাল) লিখিয়াছেন। **"সিনেমার গল্প"**র সাড়ে পনেরো আনা—বা প্রায় ষোল আনাই, নাটকাকারে রচিত হওয়া সত্ত্বেও গ্রন্থখানিকে নাট্য-গ্রন্থের তালিকায় স্থান দেওয়া যায় না। ইহার 'উপক্রমণিকা' ও 'উপসংহার' যত সামান্যই হউক, গ্রন্থখানিকে উপন্যাসই বলিতে হইবে—অবশ্য অতি নূতন এক নাট্য-রীতিক উপন্যাসের শ্রেণী কল্পনা না করিয়া তাহা করা যাইবে না। **"রূপান্তর"**কেও মৌলিক রচনা বলা চলে না। নাট্যকার বনফুলের উল্লেখযোগ্য গুরুগম্ভীর দান—দুইখানি চরিত নাটক—শ্রীমধুসূদন (১৯৩৯) ও বিদ্যাসাগর

(১৮ই পৌষ ১৩৪৮ উৎসর্গকাল)। চরিত নাটকের প্রবর্ত্তক না হইলেও অনতি-অতীত স্মরণীয় সামাজিক ব্যক্তির জীবন-চরিত অবলম্বনে নাটক রচনার চেষ্টা বনফুলই প্রথম করিয়াছেন। শুধু এই হিসাবেই তাঁহাকে চরিত-নাটকের প্রবর্ত্তক বলা যাইতে পারে।

নাটকের সামান্য পরিচয়

মন্ত্রমুগ্ধ (১৯৩৮)। "এই প্রহসনটি 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশিত··· একটি কুকুর এই নাটকের একটি প্রধান ভূমিকায় আছে; প্রধান ভূমিকায় মনুষ্যেতর প্রাণীর আবির্ভাব বাঙলা নাটকে এই বোধ হয় প্রথম।" (নিবেদন) প্রহসন হইলেও নাটকখানি পঞ্চাঙ্ক চিত্রনাট্য—(৩৩ দৃশ্যে বিভক্ত)। মোহনলাল-চুমকির নূতন প্রণয় এবং হারাধন-শুভঙ্করীর পুরাতন প্রণয়ের দুইটি কাহিনীকে গিঁট দিয়া নাট্যকার নাট্যবৃত্ত রচনা করিয়াছেন। বৃত্তটি এই :—মোহনলাল চুমকীর সহপাঠী—শীর্ণকান্তি গোঁফদাড়ি-কামানো চক্ষু কোটর গত ভাববিহ্বল—পৌরুষহীন আধুনিক যুবক—চুমকীর সঙ্গে বিবাহবিষয়ে একটা মীমাংসা করিতে ব্যগ্র—মীমাংসা না করিয়া থাকিতে পারিতেছে না। চুমকি এম·এ পাশ না করিয়া এবং নিজের পায়ে না দাঁড়াইয়া বিবাহ করিতে অনিচ্ছুক। মোহনলাল তেমনি অধীর। লেকের নির্জ্জন অংশে সন্ধ্যার পরে আলাপ-প্রলাপ করিবার সখ আছে কিন্তু আত্মরক্ষার শক্তি কাহারও নাই। ঘটনাও একটি ঘটে। গুণ্ডা আসিয়া অধিক বাক্য ব্যয় না করিয়া মোহনের গালে একটা চড় মারে এবং চুমকির কাণের দুল ছিনাইয়া লয়। ভূশায়ী মোহনলাল আস্ফালন করে প্রচুর—কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই।

এদিকে ঝান্টু মল্লিকের সমস্যা কম নয়। 'রিজিয়া' নাটকে বক্তিয়ারের পার্ট করিতে পারে হারাধন। বিনোদ 'ফেল' করিতেছে। হারাধনই বক্তিয়ার সাজিয়া রিজিয়ার সম্মুখে বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইতে পারে বটে কিন্তু হারাধনের

সমস্যা আরো ঘোরালো। বাঁজা বউ লইয়া মহা ফ্যাঁসাদ। হারাধন একাধারে তাহার স্বামী ও সন্তান। স্ত্রী তাহাকে খাওয়াইয়া দাওয়াইয়া, নাওয়াইয়া পুঁছাইয়া জামা পরাইয়া খোকাটি বানাইয়া রাখিতে চায়। অসহ্য আদরে হারাধন জর্জ্জরিত। স্বামীকে কুকুর বানাইয়া শিকল দিয়া বাঁধিয়া রাখিতে পারিলে সে খানিকটা নিশ্চিন্ত হইতে পারে—এমন বাতিকের মাত্রা। হারাধন এই ফ্যাসাদ থেকে মুক্তি চায়। তাই ঝান্টু মল্লিক হারাধনের কাছে স্ত্রীকে জব্দ করিবার প্রস্তাব করিলে হারাধনও রাজি হয়।

সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া ঝান্টু হারাধন-পত্নী শুভঙ্করীর কাছে যায়—ব্যোম মহাদেও, শঙ্কর ভোলানাথ…ছাড়া মুখে কথা নাই। মানুষকে কুকুর করা কুকুরকে মানুষ করার মন্ত্রে সন্ন্যাসী সিদ্ধ। শুভঙ্করী স্বামীর পশুভাব দূর করিবার জন্ত স্বামীকে দশ দিনের জন্য কুকুর করিতে রাজি হয়। এক দিকে বন্ধ দুয়ারের বাহিরে শুভঙ্করীর মন্ত্রপাঠ চলে, অন্যদিকে একটি কুকুর ঢুকাইয়া দিয়া হারাধন প্রস্থান করে। শুভঙ্করী দরজা খুলিয়া—কুকুরবেশী স্বামীকে দেখিতে পায় এবং সোহাগ করিতে থাকে।

এদিকে শুভঙ্করী আছে কুকুর-স্বামীর সোহাগে ব্যস্ত, অন্য দিকে ঝান্টুদের এক পোড়ো বাড়িতে আছে হারাধন—সর্ব্বদা দাঁড়ি আর চুল পরিয়া—আর আছে সেই পোড়োবাড়ীটারই নিকটবর্ত্তী মেয়ে হোষ্টেলে—চুমকী, হোষ্টেলে মোহনলালের আনাগোনা—তাহার মুখে গুণ্ডাকে শায়েস্তা করিবার আস্ফালন আচরণে ন্যাকামি-বোকামি। সর্ব্বোপরি আছে—দাঁড়ি-গোঁফ পরা হারাধনকে পোড়োবাড়িতে ঐ ভাবে থাকিতে দেখিয়া—হোষ্টেলের মেয়েদের মধ্যে আতঙ্ক। হারাধনের গান শুনিয়া তাহারা ভয় পায়—চুমকীর দর্শনপ্রার্থী মোহনলাল পর্য্যন্ত। হারাধনের 'পার্ট' অভ্যাস করাকে তাহারা ভেংচি কাটা মনে করে। ভীরু মোহনলাল গুণ্ডাকে শায়েস্তা করিয়া, চুমকীর কাছে পুরুষকার প্রতিষ্ঠা করিতে চায়।

ওদিকে কুকুর-স্বামী চর্ব্ব্য-চুষ্য-লেহ্য-পেয় খায়, গদিতে শোয়, অবিরাম স্ত্রীর

সেবা ও সোহাগ পায়। কিন্তু কুকুরের এত সহিবে কেন? জীবন সঙ্কট উপস্থিত হয়। ডাক্তার আসে, ওষুধ আসে, পথ্য আসে—আঙ্গুর বেদানা, স্বামীর অবস্থা দেখিয়া শুভঙ্করীর কান্নাও আসে এবং প্রতিবেশী নয়নতারা আসে—ভাল মানুষ পাগল হইয়া গিয়াছে দেখিতে। অন্যদিকে হারাধনের অবস্থাও কাহিল। বাহিরে দাড়ি-গোঁফের ঝামেলা, ভিতরে মন-কেমন-করা। আবার মোহনলালও মরিয়া। গুণ্ডা না ধরিয়া কথা নাই। চাবি তৈয়ারী করাইয়া হারাধনের ঘরে ঢোকে, হারাধনকে না পাইয়া গোঁপদাড়ি লইয়া পালাইতে যায়, পালাইতে গিয়া শেষ পর্য্যন্ত পুলিশের হাতে ধরা পড়ে এবং হারাধনের পরিবর্ত্তে থানায় আবদ্ধ হয়।

চুমকীর ভগিনীপতি বিরাজবাবু—পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর—ভিতরের খবর জানিতে পারিয়া মোহনলালকে বাড়ীতে পাকড়াও করিয়া লইয়া আসেন এবং মোহনলালকে চুমকীর হেপাজতে পাকাপাকিভাবেই সঁপিয়া দেন। হারাধনকে ধরিতে গিয়া সিগারেটের ধূমো দেখা যায়—হারাধনকে দেখা যায় না। তাঁহাকে দেখা যায়—তাহার নিজের বাড়ীতে—বিশেষ এক নাটকীয় মুহূর্ত্তে। ঝানু জানে না যে হারাধন বাড়ীতে গিয়াছে। সে লোকমুখে শোনে—হারাধনের বউ পাগল হইয়া গিয়াছে। ঝানু সন্ন্যাসীর বেশে দেখিতে যায় এবং মহা সমস্যার সম্মুখীন হয়। কুকুর মানুষ করিতে না পারিলে ছাড়াছাড়ি নাই—শুভঙ্করী কুরুক্ষেত্র না করিয়া ছাড়িবে না। সন্ন্যাসীর কোন চালচলনেই সে ভোলে না। কুকুরকে মানুষ করিতেই হইবে। কিন্তু ঝানু-সন্ন্যাসী জলজ্যান্ত কুকুরকে মানুষ করিবে কি করিয়া? ঘোর সমস্যা। সমস্যার সমাধান করে—হারাধন নিজে—"শয়ন ঘরের কপাট খুলিয়া কাপড়ের কষি গুঁজিতে গুঁজিতে প্রবেশ করিয়া। ঝানুও দমিবার পাত্র নহে। ঝানু হারাধনকে চিনিতেই চাহে না ঝানুসন্ন্যাসী ঝানু-অভিনেতার মতোই সন্ন্যাসিত্ব বজায় রাখিয়া নাটকীয়ভাবে প্রস্থান করে। হারাধনের বউকে জব্দ করিতে গিয়া 'ঝানুও কম জব্দ হয় না।'

পরিস্থিতি, কার্য্য, চরিত্র এবং সংলাপ সবকিছুর সংযোগে হাস্যরস যথেষ্ট মাত্রায় নিষ্পন্ন হইয়াছে। বিশেষতঃ ভীরু মোহনলালের বীরত্বের আস্ফালন—ন্যাকামি ও বোকামি এবং শুভঙ্করীর কুকুর-সোহাগ, ঝাম্রুর সন্ন্যাসীর অভিনয় খুবই হাস্যোদ্দীপক। মোহনলালের উপরে ব্যঙ্গের কটাক্ষপাত সামান্য থাকিলেও, রঙ্গ-কৌতুকই প্রহসনখানির প্রধান লক্ষ্য।

২। **কঞ্চি**। তিনাঙ্ক কমেডি নাটিকা। অঙ্কে কোন দৃশ্য-বিভাগ নাই। নাটিকার বিষয়বস্তু—এক কথায়—অসবর্ণ-বিবাহ বা "একজন শিক্ষিতা সাবালিকার সুস্থ, স্বাধীন সমাজ-সঙ্গত ইচ্ছা"র পক্ষ সমর্থন। দ্বন্দ্ব-পরিকল্পনা এইরূপ:—গোবর্দ্ধন চাটুয্যের কন্যা "কঞ্চি"—ভাল নাম 'সুলতা'—ব্রাহ্মণ কন্যা হওয়া সত্ত্বেও অধ্যাপক ক্ষিতীশ দাশগুপ্তকে বিবাহ করিতে সঙ্কল্পিত। ক্ষিতীশ এম, এ পি. এইচ. ডি.। সেও মনোমত পাত্রী হিসাবে সুশিক্ষিতা ম্যাজিস্ট্রেস কঞ্চিকেই পছন্দ করিয়াছে। কিন্তু কন্যার পিতা গোবর্দ্ধন চাটুয্যে এবং ছেলের বাপ পুরন্দর দাশগুপ্ত উভয়েই এ বিবাহের ঘোর বিরোধী। গোবর্দ্ধনের স্পষ্ট কথা—"কোন সময়েই আমার মেয়ে আমার মতের বিরুদ্ধে বিয়ে করতে পারবে না"···"আমার আইন মানতে হবে তাকে—**আমি তার বাবা**।" পুরন্দরেরও সুস্পষ্ট সঙ্কল্প ও শাসানি "এ বিয়ে আমি কিছুতেই হ'তে দেবো না। আমি তোমাকে ত্যজ্যপুত্র করব, তোমার চাকরী খাবো, যতদিন না তোমার মত বদলায় ততদিন তোমায় জেলে বন্ধ করে রাখব"। কিন্তু বাঁশের চেয়ে কঞ্চি শক্ত। গোবর্দ্ধন ও পুরন্দর, বিবাহ ঠেকাইবার জন্য সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিয়াও পরাজিত হন। গোবর্দ্ধন মেয়েকে ঘরে তালাবদ্ধ করিয়া রাখেন বটে, কিন্তু সেই ঘরেই যে টেলিফোন আছে তাহা খেয়াল করেন না। কঞ্চি পুলিশ ডাকিয়া—পুলিশের সাহায্যে ক্ষিতীশের কাছে পৌঁছিয় যায়। ক্ষিতীশের বাবা পুরন্দর, নায়েব শ্রীকান্ত মাইতির সাহায্যে, ক্ষিতীশকে আংটি চুরির অপরাধে গ্রেপ্তার করাইতে চেষ্টা করেন। কিন্তু নূতন ম্যাজিস্ট্রেট—সুলতার সহপাঠী। শেষ পর্য্যন্ত তিনিই বিবাহের কর্তা সাজেন—

সব বাধা মিলাইয়া যায়। পুরন্দর পরাজিত হইয়াও, বেশ একটু উল্লসিত হন।

প্রথম অঙ্কে—ক্ষিতীশের ডাক্তার-বন্ধু যতীন, যজ্ঞেশ্বর মুনসেফ্ এবং মেয়ে স্কুলের সেক্রেটারী জনার্দ্দন চক্রবর্ত্তী তিনটি উল্লেখযোগ্য পারিপার্শ্বিক চরিত্র। ডাক্তার যতীনের মুখে বনফুলই যেন কথা বলিয়াছেন। তিনি—শিক্ষিতা অশিক্ষিতা মেয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য দেখেন না—টিয়াপাখী টিয়াপাখীই। বাঁধাবুলি কপচাতে শিখলেও টিয়াপাখী, না শিখলেও টিয়াপাখী"। শিক্ষিত অশিক্ষিত পুরুষের মধ্যেও যতীন এক বিষয়ে ছাড়া কোনো পার্থক্য দেখেন না। অশিক্ষিত—'রামাকে একটা কড়া কথা বললে সে তৎক্ষণাৎ তার পাঁচ-টাকার মাইনের চাকুরি ছেড়ে দিতে পারে—তোমার ঐ প্রফেসারের মুখে লাথি মারলেও তিনি তা পারেন কি না সন্দেহ।" শিক্ষিত—"আমরা বড় বড় বই পড়ছি, বড় বড় বুলি আওড়াতে পারি—আর কিছু পারি না। আমরা স্বাধীনতার বক্তৃতা করি নটায়, সায়েবদের গিয়ে সেলাম করি সাড়ে ন'টায়।" যতীন বিশ্ববন্ধু 'কুমড়োগাছ' যজ্ঞেশ্বর মুনসেফদেরও বিশ্ববন্ধুত্ব বে-আবরু করিয়াছেন—যেখানে এতটুকু স্বার্থের গন্ধ আছে সেখানেই যজ্ঞেশ্বর বন্ধুত্ব করেন। জনার্দ্দন চক্রবর্ত্তী চরিত্রটি মেয়েস্কুলের সেক্রেটারী—তবে অন্য অর্থে—অর্থাৎ আভিধানিক অর্থে চরিত্রহীন চরিত্র। রাত্রে ছাড়া প্রধান শিক্ষয়িত্রীর সহিত দেখা সাক্ষাৎ কথাবার্ত্তা বলার সময় হয় না। 'দাইয়ের মারফৎ প্রণয় নিবেদন' করিতেও লজ্জা হয় না।

দ্বিতীয় অঙ্কে—পাড়ার ঠাকুরদা, বিপত্নীক—যিনি কঙ্কিকে বিবাহ করিতে মনে মনে অনেকদূর আগাইয়াও গিয়াছেন এবং 'একটা মীমাংসায় আসতে' ব্যগ্র, মিস দত্ত প্রভৃতি হাস্যোদ্দীপক চরিত্র হিসাবে উল্লেখযোগ্য।

৩। **শ্রীমধুসূদন** (১৯৩৯) একুশটি দৃশ্যে বিভক্ত। কোন অঙ্ক বিভাগ নাই। মাঝে মাঝে **বিরতি** আছে। ষষ্ঠ দৃশ্যের পরে 'প্রথম বিরতি', নবম দৃশ্যের পর—'দ্বিতীয় বিরতি', একাদশের পর 'তৃতীয় বিরতি', দ্বাদশ দৃশ্যের

পর—'চতুর্থ. বিরতি' ষোড়শ দৃশ্যের পর "পঞ্চম বিরতি'। সপ্তদশ দৃশ্যের পর 'ষষ্ঠ বিরতি—একবিংশতির পরে—'যবনিকা। মহাকবি মধুসূদন দত্তের জীবনের নব আলেখ্য—মধুসূদনের উদ্দাম জীবনাবেগ, মধুর ব্যক্তিত্ব স্মরণীয় কীর্ত্তি খ্যাতি এবং সব থাকা সত্ত্বেও অশান্ত জীবনের হাহাকার ও শোচনীয় পরিণতি—এই নাট্যের উপস্থাপ্য বিষয়। (বিশেষ আলোচনা :—দ্রষ্টব্য)

৪। **বিদ্যাসাগর** (১৯৪১)॥ পঞ্চাঙ্ক চরিত-নাটক। "প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিচিত্র কর্মবহুল জীবনের আলেখ্য একটি নাটকে অঙ্কিত করা শক্ত"—বলিয়া নাট্যকার "তাঁহার জীবনের **একটি কার্য্যকে** মূলস্বরূপ গ্রহণ করিয়া **বিদ্যাসাগর ব্যক্তিটিকে** ফুটাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন। নাট্যকার স্বীকার করিয়াছেন—"ঐতিহাসিক ঘটনাগুলির পারম্পর্য্য রক্ষা করি নাই, একাধিক স্থানে কল্পনার আশ্রয় লইয়াছি এবং বিদ্যাসাগর ব্যতীত অন্যান্য বিখ্যাত চরিত্রগুলির ব্যক্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে ইতিহাসসম্মত করিতে পারি নাই।" যে "একটি কার্য্য"কে নাট্যকার মূলস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন—তাহা বিধবা-বিবাহ এবং যে বিদ্যাসাগর ব্যক্তিটিকে ফুটাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন—সে কোমলপ্রাণ-বিদ্যাসাগর, বজ্রদৃঢ়-বিদ্যাসাগর, অটল-সঙ্কল্প বিদ্যাসাগর—যুক্তিবাদী বিদ্যাসাগর—স্ত্রী-শিক্ষাব্রতী বিদ্যাসাগর। চরিত-নাটকে "কার্য্য-ঐক্য" অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য নাট্যকার যে চেষ্টা করিয়াছেন তাহা প্রশংসার্হ। এই কার্য্যকে কেন্দ্র করিয়া বিদ্যাসাগরের মহীরুহকল্প ব্যক্তিত্বটির পরিচয় নাটকে সন্তোষজনক মাত্রায় ব্যক্ত হইয়াছে। রস-রূপের যে আদর্শ এখানে ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা—ট্রাজি-কমেডির আদর্শ। বিদ্যাসাগরের সাধনা—বিধবা জীবনের দুঃখ দূর করার সাধনা, ষোল আনা সফল হয় নাই বটে—কিন্তু একেবারে নিষ্ফল হয় নাই। বিদ্যাসাগর যে মুহূর্ত্তে হতাশ হইয়া ভাঙিয়া পড়িয়াছেন, সেই মুহূর্ত্তেই আশার আলো দেখিয়াছেন এক পুনর্বিবাহিত সুখী বিধবার মধ্যে। দিগন্তবিস্তার মরুভূমির মাঝখানে···একটি সবুজ শিষ দেখিয়া আবার আশায় উদ্দীপিত হইয়াছেন।

(৫) **দশভাণ**॥ (১০-৮-৪৪—উৎসর্গপত্রের কাল)

(ক) **শিক-কাবাব**। মাংস-লোলুপ পুরুষ সমাজের লেলিহান জিহ্বা হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য ভদ্রঘরের একটি আত্মমর্য্যাদাসম্পন্ন বালিকা কিভাবে সংগ্রাম করিয়াছে এবং শেষ পর্য্যন্ত আত্মহত্যা করিয়া আত্মমর্য্যাদা বাঁচাইবার শেষ চেষ্টা করিয়াছে তাহারই করুণ-কাহিনী, জমিদারের বাগান বাড়ীর একটি কক্ষে—মদ-মাংসের টেবিলের সম্মুখে, উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। করিম বাবুর্চি শিক-কাবাব তৈয়ার করিয়া টেবিলে হাজির করিয়াছে আর পান্নালাল সৌদামিনীকে জীবন্ত শিক-কাবাব করিয়া পর্দ্দার আড়ালে হাজির রাখিয়াছে। মাংসলোলুপ জীবনধনের, কাঁচা মাংস চিবাইবার ফলে ঠোঁটের দুইপাশ দিয়া যে রক্ত ঝরিয়াছে, তাহাতে জীবন্ত—মাংস-লোলুপের পৈশাচিক নিষ্ঠুর মূর্ত্তিও প্রতিফলিত হইয়াছে—জমিদারেরও ঠোঁটের দুইপাশ দিয়া সৌদামিনীর রক্ত গড়াইয়া পড়িয়াছে। শিক-কাবাব সার্থক একখানি ট্র্যাজেডি-রসাত্মক একাঙ্কিকা নাটিকা।

(খ) **লেহন**। ব্যঙ্গরসাত্মক একাঙ্কিকা। বিহারের উগ্রপ্রাদেশিকতার পটভূমিতে, বাঙালী যুবকদের চাকরী সমস্যা লইয়া ইহা রচিত। "যুবক সমিতি" নামক বাঙালী ক্লাবের এক সান্ধ্য মজলিসে (তাসের)—চাকরী সাধনায় সিদ্ধি লাভের মোক্ষম উপায়টুকু, হরেনের সিদ্ধি-খাওয়া নেশার-চোখে প্রতিফলিত করা হইয়াছে। ভগ্নীপতি সবডিভিশনাল অফিসার বা জ্যাঠা মুনসেফ্ থাকিলে "ইণ্টারভিউ" পাইতে কষ্ট হয় না সত্য, কিন্তু চাকরী পাইতে হইলে অবশ্যই চাই—কুকুরেরও অধিক **লেহন-শক্তি**। 'চপ্লাকান্ত্' বাবুর পা চাটিবার পরে হরেন কুকুরের মুখোস পরিয়া যে গান গাহিয়াছে তাহাতেই চাকরের সিদ্ধি-লক্ষণ পরিষ্কার ব্যক্ত হইয়াছে।

(গ) **জল**। জল একটি মিশ্র পদার্থ। দুইভাগ হাইড্রোজেন এবং একভাগ অকসিজেন, তড়িৎশিখার যাদুস্পর্শে জল পদার্থে রূপান্তরিত হয়। (H_2O)—এই বৈজ্ঞানিক সূত্রটিকে রূপক আকারে এই নাটিকা সুন্দরভাবে

ব্যক্ত করিয়াছে। তবে রূপের আরোপে, আর্য্য-অনার্য্যের—হিন্দু-মুসলমানেরও—সাম্প্রদায়িক অভিমান, সেই অভিমানে লম্ফঝম্ফ করা, দাঙ্গা বাধানো নারী-ধর্ষণাদি পাপাচারণ করা—যাহার সহিত একসঙ্গে থাকিতেই হইবে তাহার সাহচর্য্যে অসহিষ্ণু হইয়া দাঙ্গাহাঙ্গামা করা এবং অন্য শক্তিমানের কাছে 'জল' হইয়া যাওয়া—এই সব উপাদান মিশিয়া রহিয়াছে। হাইড্রোজেন অক্সিজেনের দ্বন্দ্বে হিন্দু-মুসলমানের দ্বন্দ্বই যেন প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। (বিজ্ঞান রসিক বনফুলের সামান্য পরিচয় এখানে পাওয়া যায়।)

(ঘ) **অবাস্তব**॥ ভূতে বিশ্বাস না থাকিলেও "ভূতুড়ে বাড়ী" এবং লোকজনের আশঙ্কা—এবং ভূতের অস্তিত্বের ও উপদ্রবের কাহিনী কেমন করিয়া একটা লোকের মধ্যে দিবাস্বপ্নের ঘোর বা ভ্রান্তি সৃষ্টি করিতে পারে—ফলে তাহারই উৎকল্পনা মূর্ত্তি ধরিয়া তাহার সম্মুখে আসা-যাওয়া করিতে পারে এবং তাহাকে অপ্রকৃতিস্থ করিয়া আত্মঘাতী করিয়া তুলিতে পারে, তাহাই এই একাঙ্কিকায় প্রদর্শিত হইয়াছে। বিখ্যাত লেখক অশোক দত্ত এই ভাবেই, নিজের পিস্তলের গুলিতে নিজেই মরিয়াছেন। ভূদেববাবুর ভূতুড়ে কাণ্ডের কাহিনী শুনিয়া তিনি বলিয়াছেন বটে—আপনি অবশ্য যা বললেন তার থেকে কিছুই প্রমাণ হয় না। এ বাড়ীতে উপর্য্যপরি কয়েকটা মৃত্যু ঘটেছে তা ঠিক, কিন্তু প্রত্যেক মৃত্যুরই তো একটা না একটা সঙ্গত কারণও রয়েছে।···এসবের দ্বারা এটা প্রমাণ হয় না যে এটা ভূতুড়ে বাড়ি।" কিন্তু সংস্কার বলবান—কল্পনায় মূর্ত্তি হইয়া উঠিতে চায়। হইয়াছেও তাহাই। যে কাফ্রি চাকরটিকে এবং মিস চৌধুরীকে মিস্টার চৌধুরী গুলি করিয়া মারিয়াছিলেন, তাহারাই আসা-যাওয়া আরম্ভ করিয়াছে। ভয়ে-উত্তেজনায় অস্থির ও বিভ্রান্ত অশোক দত্ত ভূত মারিতে গিয়া নিজেকেই মারিয়া বসিয়াছেন। এইভাবেই 'অবাস্তব' বাস্তব জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করে। (এখানে, মনস্তত্বরসিক বনফুল ভৌতিক কাণ্ডের মনস্তাত্বিক ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করিয়াছেন।)

(ঙ) **নব-সংস্করণ**। একাঙ্কিকা প্রহসন। সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট-অব-পুলিশ

মিটার রক্ষিতের একমাত্র কন্যা অপর্ণা, জঙ্গলপুরের জমিদারের বড় ছেলের সঙ্গে একেবারে ঠিকঠাক এমন বিয়ে উপেক্ষা করিয়া পালাইয়াছে। রক্ষিত রীতিমত আগুন। কলেজের যে সব ছেলে অপর্ণার কাছে প্রেমপত্র লিখিয়াছিল তাহাদের তিনি এ্যারেষ্ট করিয়াছেন। বন্ধু অধ্যাপক নিবারণ শিক্ষিতা মহিলাদের স্বাধীনতার পক্ষ লইয়া তর্ক করিয়া রক্ষিতের আগুন নিভাইতে পারেন না—বরং ভৎর্সনা শোনেন—"O you teachers and professors you are a hopeless lot of hypocrites! রক্ষিত একের পর এক ছেলেদের ডাকেন এবং ধমকাইয়া ভূত ছাড়াইয়া দেন। কিন্তু ফল হয় না। মেয়ের হদিশ পাওয়া যায় না। সেই মুহূর্তেই অপর্ণা এবং অপর্ণার পিছু পিছু অধ্যাপক মঙ্গলময় দাস প্রবেশ করে। অপর্ণাকে অধ্যাপক দাসই বিবাহ করিয়াছেন—অবশ্য লুকাইয়া —কারণ তিনি জাতিতে "সদ্‌গোপ"। অধ্যাপক ছাত্রীর প্রেম ও গোপন বিবাহ নব-সংস্করণই বটে।

(চ) **বানপ্রস্থ**। প্রাণশ্রেষ্ঠ্য উপাখ্যানেরই একটি নূতন সংস্করণ। ক্ষুধায় টান না ধরা পর্য্যন্তই রঙ্গ-রসিকতা কবিতা-রস নৃত্য-গীতরস ভাল লাগে কিন্তু টান যখন প্রাণ লইয়া টানাটানি করে তখন সুন্দরী ললনার সুমিষ্ট সংগীতকে "কাব্বলামি" মনে হয়। সংসার বিরক্ত বৃদ্ধ বরদাবাবুর নূতন ধরণের বানপ্রস্থ অবলম্বনে নাট্যকার ঐ তত্ত্বটিকেই ব্যক্ত করিয়াছেন। 'রঙ্গলাল' নামক জমিদার তনয়ের ইংরেজি-বাংলা-ফার্সি কবিতার আবৃত্তি, শিরোমণির মুক্তিতত্ত্ব আলোচনা, পরমাসুন্দরী নীহারের সুমিষ্ট গান—একাঙ্কিকাটিকে নানা ভাবে উপভোগ্য করিয়া তুলিয়াছে।

(ছ) **কবয়ঃ** Clifford Bax প্রণীত The poetasters of Ispahan অবলম্বনে রচিত] আধুনিক গদ্য ও দুর্বোধ্য কবিতার ব্যঙ্গ। যে কবিতা যত দুর্বোধ্য সে কবিতা তত গভীর—এই যাহারা মনে করেন তাঁহাদের উদ্দেশ্যেই এই রঙ্গ-ব্যঙ্গ। মোদক-আপিত-মালী অর্থাৎ যাঁহারা অশিক্ষিত, গদ্যে-পদ্যে একটা কিছু বলিতে পারাকেই যাহারা কবিতা বলিয়া মনে করে

তাহারাও খোঁচা খাইতে কম খান নাই। তবে অতি আধুনিক ধ্রুবেশ গুডের—কবিতাকেই—

"জ্যামাইকা দ্বীপের বন্দরে আছে যত শামুকী
নিকোলাসো পিতৃস্বসার রিপ্রেশন উঠুক কিম্বা নামুকই
ভলভিউলাসের ফটোমিটার নীটশের যত ফুক্কুড়ি
সব তুচ্ছ তোমার কাছে চন্দ্রমুখী চন্দ্রমুখী—"

বনফুলী হুলের বেশী খোঁচা খাইতে হইয়াছে॥

(জ) **আকাশ নীল**॥ "মাথায় ছিট আছে ; তার উপর দারুণ মাতাল সর্ব্বদাই মদ খেয়ে থাকে। সব্বাই ভয় করে······আত্মীয় স্বজনেরা পর্য্যন্ত ছেড়ে পালিয়েছে, ও একাই থাকে।"—এহেন পাগলা জমিদার জনার্দ্দন রায়ের বাগানে বল খুঁজিতে প্রবেশ করিয়াছে 'অমল'—যে বলে "আমি কাউকে ভয় করি না"॥ অমল ভিতরে অমল—কখনও মিথ্যা কথা বলে না বলিয়া কাহাকেও ভয় করে না॥ সে পাগলা জমিদারের সম্মুখে—যমের মুখেই—পড়ে। জমিদার 'আকাশ লাল না বলাইয়া ছাড়িবেন না—অথচ অমলের এক উক্তি—আকাশ নীল॥ জনার্দ্দন হাণ্টার দিয়া মারিতে মারিতে অমলকে বেহুশ করিয়া ফেলেন কিন্তু আকাশকে লাল করিতে পারেন না॥ অমলকে 'বেহুশ' দেখিয়া জমিদার হাণ্টার ফেলিয়া দিয়া মূঢ়ের মতো চাহিয়া থাকেন—খুব সম্ভব জীবনে প্রথম তাহার চোখে আকাশের নীলিমা প্রকাশিত হয়॥ 'খুব সম্ভব' বলিলাম এইজন্য যে তাৎপর্য্যটি খুব পরিস্ফুট হইতে পারে নাই।

(ঝ) **অন্তরীক্ষে**॥ অন্তরীক্ষে গ্রীক পুরাণের পরিমণ্ডলে, হিটলারী যুদ্ধোন্মাদনার পরিস্থিতিতে—বিশ্ব কবি-সম্মেলন—পরিকল্পনার সাহায্যে **রবীন্দ্রনাথের সার্ব্বজনীন উদার দৃষ্টির প্রশস্তি** রচনা॥ পৃথিবীর কবিদের মধ্যে সার্ব্বজনীন উদার দৃষ্টি একজনেরই আছে এবং তিনি রবীন্দ্রনাথ—ইহাই প্রতিপাদ্য বিষয়॥ "অন্তরীক্ষে"র রস সকলের জন্য নহে॥ বিশিষ্টদের বিদ্যারলাম্বিত জিহ্বাতেই এই রস আস্বাদিত হইবে।

(এ) **১৩ই শ্রাবণ ১৩৪৮** ॥ বিদ্যাসাগরের মৃত্যু বার্ষিকী অবলম্বনে —বিদ্যাসাগরের করুণা-কাতর বিদ্রোহী ব্যক্তিত্বকে, আধুনিক সমাজের সমালোচনার মধ্য দিয়া, বনফুলী রীতিতে ব্যক্ত করা হইয়াছে ॥ সে যুগে বিধবাদের দুঃখ দেখিয়া বিদ্যাসাগর কাতর হইয়াছিলেন—এখন "যৌবনেব শেষ সীমায় উপনীত" অথবা কুমারীদের দুঃখ দেখিয়া কাতর। স্ত্রী-স্বাধীনতার বিকৃতিকে ধিক্কার দিয়া তিনি বলেন—ইস্কুলের সেক্রেটারি বা হাসপাতালের ডাক্তারের মন যুগিয়ে চলাটা কম অপমানের মনে হয় বুঝি তোমাদের কাছে ?" স্বাধীনতা যদি মুখে প্রসন্নতা না ফুটাইতে পারে তবে কিসের স্বাধীনতা ? বাইরের হাসি খুশির তলে বিষাদের ছাপ ঢাকিয়া বেড়ানোতে জীবনের করুণ দ্বন্দ্বই প্রকাশ পায় ॥ পুরুষরাও অপদার্থ এবং তাহার দায়িত্বও মেয়েদের কম নহে ॥

(৬) **মধ্যবিত্ত** [ট্রাজি-কমেডিজাতীয় তিনাঙ্ক নাটক—[দৃশ্যবিভাগ নাই] মধ্যবিত্ত সংসারে চাপের শেষ নাই—জ্বালারও অন্ত নাই। আয় বা বিত্ত সামান্যই, কিন্তু ব্যয়ের বাবদ ও বরাদ্দ নেহাৎ কম নয়। সংসারে উপার্জ্জনক্ষম ব্যক্তি একজন ; সেই একের স্কন্ধে স্ত্রী-পুত্র-কন্যার ভরণপোষণের ভার ছাড়াও অধিকন্তু থাকে অনাথ আশ্রিত, বেকার আত্মীয় স্বজন—বিধবা বোন ও তাহার ছেলে-মেয়ে, ছেলে মেয়েদের শিক্ষাদীক্ষার ও মেয়ের বিবাহের দায় ; সঙ্গে থাকে বাড়ীভাড়া, রোগের ঔষুধ পথ্য, সামাজিকতার ঝামেলা। অল্প একটি আয়ের সূত্রে এত বড়ো ব্যয়ের ভার ঝুলিয়া থাকে। তাই মধ্যবিত্তের কাছে প্রাণের দামের চেয়ে চাকরীর দাম অনেক বেশী। অবস্থাচক্রে সে প্রাণহীন হইয়া পড়ে। নকুল এইরূপ এক মধ্যবিত্ত পরিবারের কেন্দ্র পুরুষ। মাত্র ৬০ টাকা মহিয়ানার কেরাণী, কিন্তু পোষ্যের সংখ্যা কম নয়। নিজের এক স্ত্রী এবং দুই কন্যা ছাড়া সংসারে আছে ২২ বৎসরবয়স্ক বেকার প্রায় (রেডিওর দালাল) ভাই **সহদেব** (২) ৫০ বৎসর বয়স্ক দূর সম্পর্কের পিসা, (৩) ৫০ বৎসর বয়স্কা দিদি **দুর্গামণি** (৪) দুর্গামণির অনূঢ়া কন্যা ২০ বৎসরের **কুঙ্কুম** ;

ছ'মাসের ভাড়া বাকী। দোকানেও টাকা বাকী। তবে বাড়ীওয়ালা ভাল, তাগাদা দেন বটে, কিন্তু তাড়না করেন না।

বাড়ীওয়ালা ফকির বন্দ্যোপাধ্যায় দোতলায় থাকেন। বাড়ীওয়ালা বটে, কিন্তু তিনিও উত্তমবিত্ত নন। ফকিরবাবু অবসরপ্রাপ্ত কেরাণী। বয়স ৬০ বাড়ীটি পৈতৃক। বাড়ীর গায়ে চূণ বালি ছোঁয়াবার সাধ্য তাঁহার নাই। তাঁহার সংসারেও—(১) ৪০ বৎসর বয়স্ক মাথাখারাপ এক আত্মীয়—বি, এ পাশ শিবাজী আছে (৩) প্রথম পক্ষের অনূঢ়া কন্যা ললিতা আছে এবং (৪) দ্বিতীয় পক্ষের নিঃসন্তান পত্নী ৩০ বৎসর বয়স্কা যমুনা আছে। অধিকন্তু আছে একটি মাত্র ভাড়াটিয়া—সেও নকুল—৬ মাসের ভাড়া তাহার বাকী। তাই বলিয়া সাধ তাহার কম নাই। বড় ঘরে ভাল বরে কন্যার বিবাহ দিবার ইচ্ছা আছে—চেষ্টাও আছে। যদিও স্ত্রী যমুনার ইচ্ছা অন্যরূপ।—যমুনা ললিতাকে বিনা পয়সায় পার করিতে ইচ্ছুক। এই উদ্দেশ্যেই সে তাহারই বাল্যবন্ধু বেকার-যুবক সঙ্গীতজ্ঞ এম-এ-পাশ পরিতোষকে ললিতার সংগীত-শিক্ষক নিযুক্ত করিয়াছে। গাঁথিয়া তুলিতেও চেষ্টা করিতেছে।

অন্যদিকে নকুলের দিদি দুর্গামণিও একই উদ্দেশ্যে পরিতোষকে নিরীখ করিয়াছেন—কুঙ্কুমকে সেতার শিখাইবার জন্য—অবশ্য বিনা পয়সায়, অনুরোধ করিয়াছেন। পরিতোষও রাজি হইয়াছে। সতীশ ভাল সেতার বাজাইতে পারিলেও কুঙ্কুমের স্বগোত্র বলিয়াই নাকি পাত্তা পায় নাই। নকুল দিদির এই মেয়ে—দিয়ে—ছেলে-ধরা ব্যাপারটিকে পছন্দ করে না। কিন্তু সে নিরুপায়। এক কথা বলিলে দিদি দশ কথা শুনাইয়া দেয়—অর্জ্জুনের কাছে চলিয়া যাইবার ভয় দেখায়। পরিতোষের তাই পোয়াবারো। একতলায় দুর্গামণির আদর দোতলায় যমুনার খাতির—উপরে ললিতার, নীচেয় কুঙ্কুমের—আদর আপ্যায়নে তাহার দুইহাত ভরা। একজনের মনের-মতো হইবার জন্য কুঙ্কুম অনেকদিন ইংরেজি-পাঠ লইয়াছে। এখানে সংগীতজ্ঞ পরিতোষের মনের-মতো হইবার জন্য—সংগীতে পাঠ লইতেছে। সে লেখাপড়া না

গানবাজনাকে বিবাহের উপায় হিসাবে ছাড়া অন্য দৃষ্টিতে দেখে না ও দেখিতে রাজিও নয়।

এইরূপ এক পটভূমিকায় নাটকের আরম্ভ। নকুল মুখোপাধ্যায় মহা-সঙ্কটের সম্মুখীন। ঘরে স্ত্রী মৃণ্ময়ী প্রসব-বেদনায় কাতরা, বড় ডাক্তার ডাকিবার সামর্থ্য নাই। অটল ডাক্তারের হোমিওপ্যাথির ফোটাই সম্বল। বাহিরে চাকরীটুকুও যায় যায়। রিট্রেঞ্চমেণ্টের ধাক্কা সামলানো যাইবে কি না সন্দেহ। সাহেব Explanation—তলব করিয়াছে—সেই explanation টাইপ করিতে নকুল ব্যস্ত। দোতলার এবং একতলার বেকারদ্বয় 'ক্রসওয়ার্ড' মিলাইতে তথা মোটা টাকা বাধাইতে একাগ্রমনা। মাথা খারাপ শিবাজীও মাঝে মাঝে আসা যাওয়া করে—কখনও সৈন্যদল গড়িয়া তুলিবার তথা টোর্ণা দুর্গ জয় করিবার উদ্দীপনা লইয়া,—কখনও পালাইবার জন্য ঝুড়ি খুঁজিয়া··· পিসামশায় ফাঁক পাইলেই বনিয়াদী বংশের বোলচাল ছাড়েন। নকুল বিরক্ত হয়—দিদিকে এবং পিসামশায়কে উচিত কথা শুনাইয়াও দেয়। স্ত্রীর কাতরানি শুনিয়াও তাহার রাগ হয়। টাইপ না করিয়া উঠিবার—যো নাই, অথচ সংসারের দাবী-দাওয়া মিটাইতেই হইবে। মহা সমস্যা।

নকুলের আপিসে না গিয়া উপায় নাই। এদিকে মৃন্ময়ীকে হাসপাতালে না পাঠাইয়া বাঁচানো দায়—হাসপাতালে পাঠাইতেই হয়। নকুল আপিসে—সাহেবের মুখে, মৃণ্ময়ী হাসপাতালে—মৃত্যুমুখে। বাড়ীতে ইতিমধ্যে সতীশ—পরিতোষে সতীশ-যমুনাতে রীতিমত একহাত মুখোমুখি হইয়া যায়। পিসামশায় হাসপাতাল হইতে মৃণ্ময়ীর মৃত্যু সংবাদ লইয়া আসেন; সেইক্ষণে নকুলও তাহার চাকরী-যাওয়ার সংবাদ লইয়া প্রবেশ করে।

নকুল শোকার্ত্ত—স্ত্রীর শোকের উপর চাকরীর শোকের আঘাত। ছোট মেয়ের জ্বর। সংসার বিপর্য্যস্ত। কে জল দেয়? কে ভাত দেয়? দুর্গামণি, পিসামশায় এবং কুঙ্কুম টেলিগ্রাফ পাইয়া অর্জ্জুনের কাছে চলিয়া যায়। ললিতা ছাড়া আতজল দেওয়ার কেহ থাকে না। পরিতোষ আসে—আসে

বিয়ের নেমন্তন্ন করিতে—চন্দনার সহিত তাহার বিবাহ ঠিকঠাক। ললিতা কুন্কুম দুইজনেই হতাশ। নেমন্তন্নের চিঠি দেখিয়া ফকিরবাবুর—ভালবরের শেষ আশাটুকু মুছিয়া যায়। ইতিমধ্যে বিনয় সুখবর লইয়া প্রবেশ করে। তাহাদের আপিসে টাইপিষ্টের চাকরী খালি। নকুলকে লওয়া হইবে—সাহেবের ইচ্ছা। নকুল পুলকিত হইয়া দরখাস্ত টাইপ করিতে লাগিয়া যায়। ফকিরবাবু অগত্যা নকুলকেই ললিতাকে বিবাহ করিবার জন্য অনুরোধ করেন।

(৭) **বন্ধন মোচন** [উৎকাল্পনিক কমেডি]

'নারী-মুক্তি আন্দোলন'—বিষয়ক কমেডি-নাটক। অঙ্ক-বিভাগ নাই। "বিরতি"-দ্বারা সন্ধিগুলি বিভক্ত। সেই হিসাবে পঞ্চ-"বিরতি"-বিভক্ত কমেডি। 'উৎকাল্পনিক' বিশেষণ দেওয়ার কারণ এই যে যদিও বিষয়বস্তু অন্যতম একটি সমাজ সমস্যা, তবু পরিস্থিতি-কল্পনা, চরিত্র-সৃষ্টি এবং ঘটনা-বিন্যাস অধিক পরিমাণে উৎকল্পনা-(fancy) প্রভাবিত হইয়া পড়িয়াছে। "নারী-রক্ষা-সমিতি", সমিতির অধিনায়িকা উজ্জ্বলা নন্দী, তাহার ভ্রাতা-ভগিণী, এবং পিতা সকলেই যেন ভাবে-ভরা ফানুস। বাস্তব জীবনের পরিমণ্ডল হইতে সকলেই বহুদূরবর্তী। এই কারণেই, সমস্যা অবলম্বনে রচিত হইলেও নাটকখানি সমস্যামূলক নাটকের (problem play) গাম্ভীর্য্য পায় নাই। যাহা হউক —নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার অধিকার নিজেকেই লাভ করিতে হইবে··· কোন ফন্দিবাজ ব্যবসায়ীর (জগনলাল ঠিকাওয়ালা) অর্থানুকূল্যে-গড়া সমিতি সে অধিকার দিতে পারিবে না, কোনো পুঁজিপতির দানের উপর নির্ভর করিয়া সে অধিকার আসিবে না···এই উপস্থাপ্য বিষয় সম্বন্ধে কিছু বলিবার নাই; উজ্জ্বলার লিখিত অভিভাষণেও অনেক মূল্যবান এবং জোরালো কথা আছে··· "রাষ্ট্র সমাজ কেহই আমাদের ন্যায্য মূল্য দিবে না যদি না আমরা আত্মবলে বলীয়সী হইয়া স্পষ্ট ভাষায় নিজেদের দাবী ঘোষণা করি"······"আত্মসম্মানই মনুষ্যত্ব"···উজ্জ্বলার এ কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। উজ্জ্বলার সহপাঠী অনুক্ষণের জীবনদর্শনও উপেক্ষনীয় নয়···"শান্তিই জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কাম্য

জিনিস"···খুবই বড়ো উপলব্ধি, নিঃসন্দেহ। তারপর উজ্জ্বলার বাবা সিদ্ধার্থ নন্দীর জীবন এবং জীবন-সমালোচনাও কম চিত্তাকর্ষক নয়···

ক্লিফোর্ড ব্যাকসের ষ্টুডিও নাটকের ধরণে লেখা 'বন্ধন-মোচন'-নাটিকাতেও নারীর বন্ধনের ইতিহাস·এবং মুক্তি-পিপাসাও সুন্দর ভাবে ব্যক্ত করা হইয়াছে ···কিন্তু এত সব গুরুগম্ভীর ভাব ও ভাষা মিলিয়াও নাটকখানিকে 'serious-drama-য় পরিণত করিতে পারে নাই। মূল ভঙ্গীর মধ্যেই গলদ আছে।

(৮) রূপান্তর (১৩৫২)

আলিবাবার গল্প অবলম্বনে লিখিত কমেডি।

(এ বই পাওয়া যায় না।)

*দেখা যাইতেছে···আজ পর্য্যন্ত বনফুল যে কয়খানি নাটক-নাটিকা লিখিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে···শ্রীমধুসূদন এবং বিদ্যাসাগর এই দুইখানি চরিত নাটকই গুরুগম্ভীর (high serious) রচনা এবং অন্যগুলি···লঘু বা লঘু-গুরুমিশ্র কমেডি-জাতীয়। ট্রাজেডি অপেক্ষা কমেডির প্রতি বনফুলের এই অধিক প্রবণতা···'স্বভাবোহ-তিরিচ্যতে' এই সূত্রটিকেই প্রমাণ করিতেছে। যাহা হউক বনফুলকে "good dramatist" বলা যায়, কিন্তু 'great dramatist' বলা যায় না। দৈহিক মানসিক ও আত্মিক দ্বন্দ্বে মানব-জীবন যেখানে ক্ষতবিক্ষত ও শোচনীয়, যেখানে বিশ্ববিধানের পটভূমিতে মানুষের নিয়তি-নিয়ন্ত্রিত, দুঃখ-দুর্ভোগবিড়ম্বিত জীবনের নিস্ফল সংগ্রামের শোচনীয় করুণ রূপ জাগিয়া উঠে, সেই ট্যাজেডি-লোকে নাট্যকবি বনফুল সহজ আবেগে প্রবেশ করেন নাই। "সিরিয়াস ড্রামা" বলিতে যে-জাতীয় সমস্যা-মূলক গুরুগম্ভীর রচনা বুঝায় তাহাও নাট্যকার বনফুলের নাট্য-রচনার তালি-কায় কম পাওয়া যায়। এই তালিকায় লঘু বা লঘু-গুরুমিশ্র প্রহসনজাতীয় কমেডির সংখ্যাই বেশী। আশা করি, জীবন-রসিক বনফুল···শ্রীমধুসূদন, বিদ্যাসাগর অপেক্ষাও গুরুতর গুরুতর নাট্যরচনা দ্বারা···আমাদের নাট্য-সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিবেন।

চরিত-নাটক ও শ্রীমধুসূদন

কাহিনী-কাব্য—শ্রব্য বা দৃশ্য যে রীতিতেই রচিত হউক—দেশ-কাল আয়তনে-অভিব্যক্ত জীবনের রূপকেই রসরূপ দান করিয়া থাকে। ভরতের ভাষায় বলিলে বলা যাইতে পারে—'লোকবৃত্তানুকরণম্'—এরিষ্টটলের ভাষায়—'জীবনের অনুকরণ'—"imitation of life"। বলা বাহুল্য, জীবন বলিতে নৈর্ব্যক্তিক কোন সংজ্ঞা মাত্র বুঝায় না—বুঝায় ব্যক্তিরূপে প্রকাশিত সামাজিক ব্যক্তির জীবন অর্থাৎ যে জীবন বিশেষ কোনো সমাজের মধ্যে দশের সঙ্গে নানারূপ সম্পর্কের সূত্রে জড়িত—যে জীবন অভিযোজন-প্রয়াসে—পুরুষার্থ সাধনায় সতত রত—যে জীবন দৈহিক-মানসিক নানা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় নানা ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে সর্ব্বদাই গতি-চঞ্চল—কায়মনোবাক্যে ক্রিয়াশীল—নিজেই নিজের ভাগ্যবিধাতা। এই দিক দিয়া দেখিতে গেলে, জীবন—যেন বাহ্য ও আন্তর ঘটনার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার একটা শক্তিক্ষেত্র—ঘটনার সমষ্টি ফল এবং জীবনের উপস্থাপনা সংক্ষেপে ঘটনারই উপস্থাপনা। জীবনের রসরূপ রচনা করিতে হইলে রসকেন্দ্রিক বৃত্তের বন্ধনে ঘটনারাজি সাজাইতে হইবেই; সুতরাং বৃত্ত রচনা বলিতে প্রধানতঃ ঘটনা-সংযোজনাই বুঝায় এবং বিশেষত বুঝায় পরিস্থিতি-কল্পনার সাহায্যে একটা রসাদর্শকে ফুটাইয়া তোলা। রস-সৃষ্টি ঘটনা সাপেক্ষ বলিয়াই বৃত্ত-রচনা রসানুকূল ঘটনার সংযোজনা।

রস-নিষ্পত্তির সৌকর্য্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই এরিষ্টটল প্রমুখ শিল্প-দার্শনিকরা "কার্য্য-ঐক্য" (unity of action) অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্ম বিশেষভাবে নির্দ্দেশ দিয়াছেন এবং "one action" কথাটির তাৎপর্য্য সবিস্তারে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

তবে এ কথাও সত্য যে বহু ব্যাখ্যা করা সত্ত্বেও, সমালোচকদের মধ্যে ঐক্যের স্বরূপ বিষয়ে অবিসংবাদিত মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। এ কথাও উল্লেখ করা দরকার যে এরিষ্টটলের সময়েও, এরিষ্টটলের 'ঐক্য'—ধারণা এবং

অন্যান্য সমালোচকের এবং অনেক লেখকেরও—'ঐক্য-ধারণা' এক হইতে পারে নাই। অনেকেই যে 'নায়ক-ঐক্য'কে (unity of hero) বৃত্ত ঐক্য (unity of plot) বলিয়া মনে করিয়াছেন এবং এরিষ্টটলের মতে, ভুল করিয়াছেন—পোয়েটিকস গ্রন্থে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। "নায়ক-ঐক্যকেই যাঁহারা 'বৃত্ত ঐক্য' বলিয়া মনে করিয়াছেন তাঁহাদের ভুল ধারণার সমালোচনা প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছেন—"Unity of plot does not, as some persons think, consist in the unity of the hero. For infinitely various are the incidents in one man's life which can not be reduced to unity; and so, too, there are many actions of one man out of which we can not make one action—(poetics—VIII—33)। তাৎপর্য্য এই যে—বৃত্ত-ঐক্য ও নায়ক -ঐক্য এক বস্তু নহে। ব্যক্তির জীবনে এমন অনেক ঘটনা ঘটিয়া থাকে যাহাদের মধ্যে অন্বয় স্থাপন করা সম্ভব নহে। যে সমস্ত ঘটনা একটা বিশেষ কার্য্যের সহিত যুক্ত অর্থাৎ ভাবোদ্দীপকতার দিক দিয়া পরস্পর সম্পৃক্ত, তাহাদের সমবায়েই কার্য্য-ঐক্যের কেন্দ্র গঠন করা সম্ভব। পরস্পর অসম্পৃক্ত ঘটনার সমাবেশ করিলে 'ব্যক্তি-ঐক্য' অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে, কিন্তু—"কার্য্য-ঐক্য" অক্ষুণ্ণ রাখা যায় না—'unity of impression" রস-ঐক্য বলিতে যাহা বুঝায় তাহা সৃষ্টি করা যায় না।

তবে সকলেই যে এক দৃষ্টি লইয়া, বিষয়টি—(ঐক্যের বিষয়টি) পর্য্যা-লোচনা করিয়াছেন তাহা বলা যায় না। এরিষ্টটলের সময়েও এমন লোক ছিলেন যাঁহারা বৃত্ত-ঐক্য বলিতে "নায়ক-ঐক্য" বুঝিতেন এবং "দ্বি-সূত্র বৃত্ত" (double thread of plot)—দ্বৈত-বিষয় বৃত্তকে (double theme) ঐক্য-পরিপন্থী বলিয়া মনে করিতেন না। যাঁহারা, "নায়ক-ঐক্য" ও বৃত্তের-'ঐক্যকে এক মনে করিতেন তাঁহাদের বক্তব্যটুকু এরিষ্টটল উল্লেখ করেন নাই বটে, কিন্তু আমরা অনুমানে খানিকটা বুঝিয়া লইতে পারি।

ইহারা হয়ত বলিয়াছেন—নাট্য সাহিত্যের উদ্দেশ্য—জীবনের উপস্থাপনা—জীবনের রূপকে যথাযথ অথচ সরসভাবে উপস্থাপিত করা। জীবনের রূপ—খণ্ড এবং অখণ্ড দুই ভাবে প্রকাশ করা যাইতে পারে। যেমন জীবনের বিশেষ একটি কার্য্যকে (action) সন্ধি-বিভক্ত-রূপে প্রকাশ করা যাইতে পারে, তেমনি জীবনের বিভিন্ন কার্য্যময় সমগ্র রূপটিও উপস্থাপ্য বিষয় হইতে পারে। খণ্ড প্রকাশের ক্ষেত্রে, বিশেষ একটি কার্য্য অর্থাৎ ভাবের আস্বাদনের মধ্যেই "রস" (interest) থাকে। আর অখণ্ড অর্থাৎ সমগ্র রূপের প্রকাশ যেখানে হয়, সেখানে রস—সামাজিকের আনন্দ—ব্যক্তির চরিত্র বা কার্য্য-মহিমা দেখার বাসনা হইতে জন্মে। প্রথম ক্ষেত্রে 'ভাব' লক্ষ্য—ব্যক্তি উপায়, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে 'ব্যক্তি' লক্ষ্য—ভাব উপায়। মোট কথা, যে ব্যক্তির জীবনবিষয়ে দেশের ও দশের ঔৎসুক্য খুব তীব্র—যাঁহার জীবনের ঘটনা এবং কার্য্য কলাপের মহিমা উপলব্ধি করিবার জন্য দেশবাসী উন্মুখ—এক কথায়, যে ব্যক্তি পুরুষার্থের সাধক হিসাবে জাতির চেতনায় স্মরণীয় হইয়া আছেন সেইরূপ কোন ব্যক্তির বিভিন্ন ঘটনাকে এক বৃত্তের মধ্যে স্থান দিলে—কার্য্য-ঐক্যের হানি হয়ত হয়, কিন্তু ঔৎসুক্যের (interest) হানি হয় না।

'বৃত্ত-ঐক্য' সম্পর্কে রেণাসাঁ-যুগে যে তীব্র বাদ-বিসংবাদ হয় তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। "**রোমান্তি**"-কাব্য এবং **মহাকাব্যের** লক্ষণ নিরূপণ করিতে গিয়া, বাকবিতণ্ডার তুমুল ঝড় বহিয়া যায়। একদল বলেন—কার্য্য ঐক্য না থাকিলে রচনা কাব্য পদবাচ্যই হয় না, রোমান্তিতে কার্য্য ঐক্য, কাল ঐক্য নাই সুতরাং উহা কাব্যই নহে। অন্যদল বলেন—আনন্দ পাওয়াই বড় কথা; কার্য্য-ঐক্য কাব্যের পক্ষে অপরিহার্য্য নহে। রোমান্তি-কাব্য আনন্দ দিতে কম দেয় না—সুতরাং রোমান্তিও সার্থক কাব্য-সৃষ্টি। মহাকবি ট্যাসো দুই পক্ষের বিসংবাদ মিটাইবার জন্য—দুই প্রকার ঐক্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন :— এক :—**রাসায়নিক**=মূল উপাদানের সরল ঐক্য

Simple unity of a chemical element দুই—**উদ্ভিদ ও প্রাণিদেহের জটিল ঐক্য**=complex unity of an organism like an animal and plant. কাব্য দেহে শেষোক্ত অর্থাৎ জটিল ঐক্যই দেখা যায়। ট্যাসোর বক্তব্য এই যে অঙ্গোপাঙ্গের বিভিন্নতা সত্ত্বেও প্রাণী যেমন একক, তেমনি বিভিন্ন ঘটনার সমাবেশে কাব্য-শরীর গঠিত হইলেও উহার একত্বের হানি হয় না। এরিষ্টটলের ঐক্য-বোধের এবং ট্যাসোর এই জটিল-ঐক্যবোধের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য আছে কি না বিচার্য্য বিষয়। তবে সমস্যার সমাধান যেভাবে করা হয় তাহাতে দেখা যায় এরিষ্টটলের মতের প্রাধান্যই বজায় আছে। রেণাসাঁতে, 'হিরোয়িক পোয়েট্রি'কে [শ্রব্য কাহিনী কাব্য] মোট তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে এবং ব্যক্তি ও কার্যের সংখ্যাকেই এই শ্রেণীবিভাগের ভিত্তি করা হইয়াছে। প্রথম শ্রেণী—**এপিক** (মহাকাব্য)= 'one action of one man—উপস্থাপ্য, কার্য্য এক—ব্যক্তি এক। দ্বিতীয় শ্রেণী—**রোমান্স** many actions of many men কার্য্য বহু+ব্যক্তিও বহু। তৃতীয়শ্রেণী* (**চরিতকাব্য**) "**বাওগ্রাফিকাল পোয়েম**" = many actions of one man—[কার্য্য বহু+ব্যক্তি এক]

চরিতকাব্যের বৈশিষ্ট্য এরিস্টটলের পোয়েটিকস্‌-গ্রন্থে ঐক্য আলোচনা প্রসঙ্গে পরোক্ষভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে এবং তাহাই যেন এখানে সূত্রকারে প্রকাশ করা হইয়াছে। এই আলোচনা হইতে আমরা যে মীমাংসা পাইতেছি তাহা এই যে—কাহিনীকাব্যের গঠন তিন ধরণের হইতে পারে—প্রথম ধরণে —বিশুদ্ধ "ক্যর্য্য-ঐক্য" থাকে। দ্বিতীয় ধরণে—শুধু যে কার্য্য বাহুল্যই থাকে তাহা নহে, ব্যক্তি-বাহুল্যও থাকে। অর্থাৎ বহু ব্যক্তির কার্য্যকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। ইহা রোমান্টিক-গঠন। তৃতীয় ধরণে—ব্যক্তি ঐক্য থাকে বটে কিন্তু ব্যক্তির বিভিন্ন পর্য্যায়ের বিচিত্র রসের ঘটনাকে স্থান দেওয়া হয়। **ইহাই চরিত ধর্মী গঠন**। সংক্ষেপে এখন বলা যাইতে পারে—যে রচনায়—কার্য্য-ঐক্য লক্ষ্য সেখানে "one action of one man উপস্থাপিত

হয় আর চরিত কাব্যে—উপস্থাপিত হয়—"many actions of one man"। "one action" কথাটির তাৎপর্য্য আগেই ব্যাখ্যা করিয়া বলা হইয়াছে। এখানে বলিবার কথা শুধু এই যে—মনে রাখা দরকার—এরিষ্টটল "ঐক্য"-আলোচনা-প্রসঙ্গে ঘটনার সংখ্যার উপর নহে, ঘটনার প্রকৃতির উপরেই জোর দিয়াছেন এবং একটি কার্য্যের (action) মধ্যে যে অনেক ঘটনা (incidents) থাকিতে পারে—এ কথা বলিতে তিনি কার্পণ্য করেন নাই। তাহার মতে many actions বলিতে ঘটনার বৈচিত্র্য বুঝায় না, কার্য্যের বিজাতীয়ত্বই বুঝায়। যেখানে একাধিক সমজাতীয় অর্থাৎ রসোপযোগী একাধিক ঘটনা থাকে সেখানে কার্য্য-ঐক্যের কোনো হানি হয় না; হানি হয় সেখানেই যেখানে বিভিন্নমুখী কার্য্যের—অসমজাতীয় অর্থাৎ রসানুপযোগী ঘটনার সমাবেশ ঘটে।

তাহা হইলে, চরিতকাব্যের—চরিত নাটকেরও—মূল লক্ষণ পাওয়া যাইতেছে এই যে—"ইহাতে নানা ব্যক্তিত্ব-যুক্ত ব্যক্তিটিকে প্রধানতঃ উপস্থাপিত করিবার চেষ্টা করা হয়—ব্যক্তির স্বরূপকে বা জীবনকে, বিভিন্নমুখী এষণা বা কার্য্যের রূপের মধ্য দিয়া—পারম্পরিক অন্বয়হীন ঘটনা পরম্পরার সাহায্যে ব্যক্ত করিবার আয়োজন করা হয়। ইহাতে যে ঐক্য থাকে তাহা কার্য্য-ঐক্য নহে—নায়ক-ঐক্য (unity of hero)—ভাব বা রসের আস্বাদন এখানের মুখ্য কাম্য নহে—মুখ্য কাম্য—ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের স্বরূপ বা জীবন-সাধনা ও পরিণতি।

তবে যদিও চরিত-কাব্যে, ব্যক্তির বহুকালব্যাপী এবং বিভিন্নকার্য্যময় জীবনের রূপ উপস্থাপিত করা হয় বলিয়া রস-কেন্দ্র গঠন করা সাধারণতঃ সম্ভব হয় না, তাই বলিয়া রস-কেন্দ্র গঠন করা যে একেবারেই অসম্ভব—এ কথা কিন্তু, স্বীকার করা যায় না॥ ব্যক্তি-জীবনকে অবলম্বন করিয়াই রস সৃষ্টি হয়। যেখানে বহু কার্য্যময় জীবনের মধ্যেও ট্রাজেডির রসাদর্শ (প্যাটার্ন) ব্যক্ত করা সম্ভব হয়, নানামুখী কার্য্যের স্বাতন্ত্র্য অক্ষুন্ন রাখিয়াও—অসমজাতীয় ঘটনার সমাবেশ করিয়াও; বিশেষ একটি ভাব-কেন্দ্রের সহিত উহাদের অন্বয় স্থাপন

করা সম্ভব হয়—মোট কথা সমগ্র জীবনটিকে একটি সন্ধি বিভক্ত বৃত্তের রূপে প্রকাশিত করা হয়, সেখানে অতি বিশুদ্ধ কার্য্য-ঐক্য না থাকিলেও—জটিলতর একটা ঐক্য-কেন্দ্রর অস্তিত্ব অবশ্যই পাওয়া যাইতে পারে। এইরূপে যেখানে ব্যক্তি-জীবনের বহু কার্য্যকে, একটি ভাবের সহিত অন্বিত করিয়া রসরূপে পর্য্যবসিত করার চেষ্টা করা হয় সেখানে চরিত-নাটক সাধারণ রস-নাটকেরই প্রকৃতি লাভ করিতে পারে॥ এই কথা সত্য বলিয়া মানিলে, চরিত-কাব্যের মধ্যে দুইটি মেরু কল্পনা করা যায়:—এক মেরুতে—'ব্যক্তি-ঐক্যের' কেন্দ্রে-গ্রথিত পরস্পর অসম্পৃক্ত বহু কার্য্যের অন্বয়হীন রূপটি, অন্য মেরুতে পাওয়া যায়—'ভাব-ঐক্যে'র কেন্দ্রে-সংগ্রথিত বহু কার্য্যের অন্বয়যুক্ত (শিথিলবদ্ধ অন্বয়) রূপটি॥ প্রথমটি যেন কোনো জীবন-চরিতেরই প্রত্যেকটি অধ্যায়ের নাট্যরূপ—উক্তি প্রত্যুক্তিবদ্ধ রূপ—খণ্ড খণ্ড রসের সংযোগে ব্যক্তিটির সমগ্র বৃত্তের উপস্থাপনা॥ দ্বিতীয়টিতে—চরিত থাকে এবং বেশী করিয়া থাকে জীবন এবং নানাবিধ ঘটনার মধ্যে ভাব-ঐক্যের কেন্দ্র গঠন করিবার—ব্যক্তির গতি পরি-ণতির সহিত নানামুখী কার্যের যোগস্থাপন করিবার চেষ্টা থাকে বলিয়া নায়ক-ঐক্যের পাশেই ভাব বা রসের একটা ঐক্য-কেন্দ্র গড়িয়া উঠে—চরিত-নাটক রসমুখ্য নাটকের সমগোত্রীয় হইয়া দাঁড়ায়॥ ধর্মের দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে, এই জাতীয়—'many actions of one man"—উপস্থাপক রচনাকেই চরিত আখ্যা দেওয়া উচিত এবং যে-নাটকে এইরূপ চরিত-ধর্মী গঠন পাওয়া যাইবে, সে নাটককে, উহা পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক হইলেও, চরিত ধর্মী পৌরাণিক' বা 'চরিতধর্মী ঐতিহাসিক বলিয়া গণ্য করা উচিত॥ কিন্তু চরিত-ধর্মের এই বৈশিষ্ট্য না থাকিলেও,—অর্থাৎ 'বহু কার্য্যে'র স্থলে একটি 'কার্য্য'কে যেখানে রূপ দেওয়া হয়—স্মরণীয় ব্যক্তির বিশেষ একটি সাধনাকে উপস্থাপিত করা হয়, সেখানেও, আমরা 'চরিত' কথাটি প্রয়োগ করিয়া থাকি॥ "বনফুল-রচিত "বিদ্যাসাগর" নাটকখানি দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে॥ ইহাতে বিদ্যাসাগরের বহু কার্য্যময় জীবনের একটি "কার্য্য"কে

বিধবাবিবাহ'কে মূলসূত্র স্বরূপ গ্রহণ করিয়া বিদ্যাসাগর ব্যক্তিটিকে ফুটাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে॥ এখানে কার্য্য এক বলিয়া আমরা বলিতে পারি—"one action of one man" এখানে উপস্থাপিত হইয়াছে এবং "কার্য্য-ঐক্য" বিশিষ্ট নাটকের লক্ষণটিই প্রকাশ পাইয়াছে॥ কিন্তু যে হেতু এই কার্য্য বিদ্যাসাগর নামক স্মরণীয় ব্যক্তির জীবনের কার্য্য, এই নাটককে সাধারণ সামাজিক নাটক বলিয়া মনে করা সঙ্গত কার্য্য হইবে না॥ বিদ্যা-সাগরের স্থানে অন্য কোন অখ্যাত ব্যক্তিকে নায়ক করিয়া এইরূপ একটি কার্য্যকে রূপ দিলে অবশ্যই আমরা নাটকখানিকে 'সামাজিক' শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত করিতাম। অতএব দেখা যাইতেছে যে, যদিও ধর্মতঃ চরিত নাটক—"এক ব্যক্তির বহু কার্য্যের উপস্থাপনা," তবু কার্য্যতঃ অপৌরাণিকও অনৈতিহাসিক—অথচ—স্মরণীয় ব্যক্তির একটি কার্য্যের উপস্থাপনাও হইতে পারে॥ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—এইরূপ ক্ষেত্রে **নায়ক-ঐক্য** অপেক্ষা **"কার্য্য-ঐক্য"**-র বৈশিষ্ট্যই বেশী ফুটিয়া উঠে এবং রসমুখ্য বা চরিত্র-মুখ্য নাটকের লক্ষণই বেশী পাওয়া যায়॥

আর একটি কথা বলিয়া এই প্রসঙ্গের উপসংহার করিতেছি। কথাটির আভাষ আগেই দেওয়া হইয়াছে—বলা হইয়াছে—যে নাটকে চরিতধর্মী গঠন পাওয়া যায়, সাধারণ পরিচয়ে উহা পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক বা সামাজিক হইলেও, বিশেষ পরিচয় দিতে উহাদের "চরিতধর্মী পৌরাণিক", "চরিতধর্মী ঐতিহাসিক" এবং "চরিতধর্মী সামাজিক" আখ্যা দেওয়া উচিত। পৌরাণিক কোন ব্যক্তির আংশিক বা সামগ্রিক জীবনকে সেখানে রূপ দেওয়া হইয়াছে ঐতিহাসিক ব্যক্তির বহুকালব্যাপী এবং বহুকার্য্যময় জীবনকে যেখানে রূপ দেওয়া হইয়াছে, অথবা কোন সামাজিক ব্যক্তির এইরূপ জীবন-কাহিনীকে যেখানে রূপ দেওয়া হইয়াছে, সেখানে গঠনটি অবশ্যই চরিতধর্মী হইয়াছে সুতরাং চরিত-নাটক বলিতে ব্যাপক অর্থে—পৌরাণিক চরিত-নাটক ঐতিহাসিক চরিত-নাটক এবং সামাজিক চরিত-নাটক—সব রকম চরিত-ধর্মী নাটকই বুঝায়। মোট কথা চরিত নাটকের মধ্যে "পৌরাণিক"

"ঐতিহাসিক" "সামাজিক" প্রভৃতি শ্রেণী বিভাগ করা সম্ভব। যে নাটকে ভীষ্মের সমগ্র জীবনকে রূপ দেওয়া হইয়াছে ("ভীষ্ম"—ক্ষীরোদপ্রসাদ), তাহাকে আমরা অবশ্যই পৌরাণিক চরিত নাটক বলিব; আবার যদি কোন নাটকে ঔরংজীবের পঞ্চাশ বৎসরব্যাপী শাসনকালের কার্য্যকে রূপ দেওয়া হয় তাহাকে অবশ্যই ঐতিহাসিক চরিত-নাটক বলিতে হইবে—আবার যদি কোন নাটকে পথের পাঁচালী"র অপূর জীবনের কাহিনী পাঠশালা হইতে আরম্ভ করা হয়—বহু বৎসরের ঘটনা নাট্যরূপে উপস্থাপিত করিয়া শেষ করা হয়, তাহা হইলে সেই নাটককে অবশ্যই আমরা চরিত-নাটকই বলিব। সামাজিক চরিত নাটক ছাড়া আর কিছুই বলা যাইবে না॥ এই প্রসঙ্গেই বলিয়া রাখা যাইতে পারে যে সামাজিক চরিত-নাটকের মধ্যে দুই ভাগ কল্পনা করা হইতেছে। স্মরণীয় ব্যক্তির চরিত যাহাতে উপস্থাপিত, তাহাই **যথার্থ চরিত** নাটক এবং যাহাতে অখ্যাত ব্যক্তির জীবনের ঘটনাকে চরিতাকারে রূপ দেওয়া হয় তাহা **চরিতধর্মী** সামাজিক নাটক॥

"**শ্রীমধুসূদন**" একখানি চরিত নাটক॥ উনবিংশ শতাব্দীর বিখ্যাত মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন ইহার উপস্থাপ্য বিষয়। মধুসূদনের জীবনের বিশেষ কোনো একটি কার্য্যকে (action) রূপ দেওয়া এই নাটকের উদ্দেশ্য নহে; ইহার উদ্দেশ্য—মধুসূদনের বহু কার্য্যময় জীবনের বিভিন্ন ঘটনাকে —জীবনের প্রায় সবটুকু—১৮৪৩ খ্রীঃ হইতে ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ৩০ বৎসর ব্যাপী জীবনকথাকে রূপ দেওয়া॥ ইহাতে ১৮২৪ খ্রীঃ হইতে ১৮৪২ অবধি —এই ১৮ বৎসরের ঘটনা প্রত্যক্ষভাবে উপস্থাপিত হয় নাই বটে, বলা যাইতে পারে—বাদ পড়িয়াছে, কিন্তু বাকী—সব প্রধান ঘটনাই যথা সম্ভব সবিস্তারে উপস্থাপিত হইয়াছে—কবির জীবনের উল্লেখযোগ্য সমস্ত তথ্যই নাটকে স্থান পাইয়াছে। মোট কথা—নাটকে, many actions of one man' উপস্থাপিত হইয়াছে॥ খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ—বিশপ কলেজে অধ্যয়ন—আশাভঙ্গের মনস্তাপ লইয়া মাদ্রাজ গমন—অধ্যাপনা ও রচনা দ্বারা জীবিকার্জ্জন—রেবেকা'র,—পরে

হেনরিয়েটার পাণিগ্রহণ—পিতার মৃত্যুর পরে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন—কোর্টে চাকরী গ্রহণ—কাব্য রচনা—ব্যারিষ্টার হইবার জন্য ইংলণ্ডে গমন—ইউরোপে অবস্থান—স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন—আইন ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ—আবার চাকরী গ্রহণ—শোচনীয় পরিণতি—ক্রমান্বয়ে সব কার্য্যই বিশেষ বিশেষ ঘটনা-সহ নাটকে স্থান দেওয়া হইয়াছে॥ বলা বাহুল্য উল্লিখিত কার্য্যগুলি সব সমজাতীয় নহে,—শাস্ত্রানুসারে বলিতে হইবে—many actions সুতরাং শ্রীমধুসূদন নাটকখানি শুধু নামতই চরিত-নাটক নহে, ধর্মত চরিত-নাটক। তবে মধুসূদনের জীবনের ঘটনারাজি ক্রমান্বয়ে উপস্থাপিত হইলেও, নাটকখানি যে জীবন-চরিতের মামুলি নাট্যরূপে পর্য্যবসিত হয় নাই—এ কথাও স্বীকার করিতে হইবে॥ নাট্যকার মধুসূদনের জীবনের মধ্যে ট্র্যাজেডির একটি রস-কেন্দ্র আবিষ্কারের অর্থাৎ মধুসূদনকে ট্র্যাজেডির নায়ক করিয়া তুলিবার জন্য সচেতন ভাবে, চেষ্টা করিয়াছেন॥ তিনি অসমজাতীয় নানামুখী কার্য্যের সমাবেশ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু মধুসূদনের জীবনের মধ্যে ট্র্যাজেডি-নায়কোচিত গতি ও পরিণতি দেখাইবার দিকেও লক্ষ্য রাখিয়াছেন। নানামুখী কার্য্যকে একটি ভাব-কেন্দ্রের সহিত যুক্ত করিয়া রূপ দেওয়ার এই চেষ্টা, আপাত অনৈক্যের মধ্যেও একটি "ঐক্যের" ধ্রুব-কেন্দ্র গড়িয়া তুলিয়াছে। শিল্পী এই ধ্রুব-কেন্দ্র স্থাপনা করিয়া যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন বটে, কিন্তু কেন্দ্রটির প্রতি অতন্দ্র দৃষ্টি নিবদ্ধ না থাকায় মাঝে মাঝে কেন্দ্র দুর্ব্বল হইয়া গিয়াছে এবং রস-বিচ্ছেদ ঘটিবার উপক্রম হইয়াছে। যথাস্থানে এ বিষয়ে আলোচনা করা যাইবে। এখানে শুধু এই কথাটাই বলিতে চাই যে নাট্যকার বনফুল চরিত-নাটকের মধ্যে—নায়ক-ঐক্যের পাশেই একটি রস-কেন্দ্র গড়িয়া তুলিতে সক্ষম হইয়াছেন—বিভিন্ন পর্ব্বের ঘটনাকে মধুসূদনের ট্র্যাজেডির উপকরণ হিসাবে প্রয়োগ করিয়া, ভিন্নজাতীয় ঘটনার মধ্যে, কেন্দ্রাভিমুখিতা তথা অন্বয় সৃষ্টি করিয়াছেন॥ চরিত কাব্যের মধ্যে পূর্ব্বে যে আমরা দুইটি মেরু কল্পনা করিয়াছি, তদনুসারে শ্রীমধুসূদনের স্থান দ্বিতীয় মেরুতে অর্থাৎ "শ্রীমধুসূদন"—ব্যক্তি

ঐক্যে'র কেন্দ্রে-গ্রথিত পরস্পরসম্পৃক্ত কার্য্যের অন্বয়হীন ঘটনা পরম্পরা মাত্রই নহে, ইহা—ভাব-ঐক্যের কেন্দ্রে সংগ্রথিত বহু কার্য্যের অন্বয়যুক্ত—(অবশ্য ততগাঢ়বদ্ধ নহে)—রূপ॥ ফলে 'শ্রীমধুসূদন'কে শুধু চরিত-নাটক বলিলে যথেষ্ট বলা হইবে না; **শ্রীমধুসূদনকে ট্র্যাজেডি রসাত্মক চরিত-নাটক বলাই যুক্তিযুক্ত॥**

বাস্তবিক, মধুসূদনের জীবনই যেন পঞ্চাঙ্ক একখানি ট্র্যাজেডি। নানা দৃশ্যে বিভক্ত হইলেও, নিরন্তর নানা রস থাকিলেও, সমগ্রের মধ্য দিয়া একটি মূল ভাব—একটি অঙ্গী রসই যেন অভিব্যক্ত হইয়াছে। চিরজীবনের তৃষ্ণায় সমস্ত জীবনটাই তৃষ্ণায় ছটফট করিয়া মরা—জীবনকে আকণ্ঠ পান করিতে গিয়া জীবনের বদলে শুধু জ্বালাকেই আকণ্ঠ পান করা—দুই হাতে জীবন ভোগ করিতে গিয়া দুই হাতে হতাশা আর দুর্ভোগ কুড়ানো—সুখের রৌদ্র ঝিকমিক করিতে-না-করিতে বেদনার ও অশান্তির কালো মেঘে সমস্ত আকাশ অন্ধকারে ঢাকিয়া যাওয়া—মস্তিষ্কের ও হৃদয়ের সুদুর্লভ সম্পদ থাকা সত্ত্বেও জর্জ্জরিত দেহ-মনে অকালে মরণকে আলিঙ্গন করিয়া জীবনের দায় এড়ানো—কীর্ত্তি-খ্যাতির উজ্জ্বল উত্তাপ সত্ত্বেও, আভ্যন্তরীন উত্তাপের অভাবে শীতল মৃত্যু (Cold death) বরণ করা—এই ট্র্যাজেডিরই যেন লৌকিক দৃষ্টান্ত মধুসূদনের জীবন॥ নাট্যকার বনফুল এই ট্র্যাজেডির ভাব-বীজকেই মধুসূদনের জীবনের-ঘটনা অবলম্বনে ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন॥ মধুসূদনের আর্ত্তনাদ শোনা যায়—"সারা জীবন ধ'রে কোন মরীচিকার পেছনে ছুটলাম এতদিন—"কাব্য? যশ? টাকা?" এ সমস্তই তাঁহার চোখে—'মরীচিকা' মাত্র। এই সব কিছু চাওয়ার পিছনে ছিল—**সুখে থাকার বাসনা**—জীবনকে ভোগ করিবার ঐকান্তিক আবেগ—to enjoy life। সেই বাসনাই অপূর্ণ রহিয়া গিয়াছে—সব কামনাই বিপর্য্যস্ত হইয়া গিয়াছে॥ কাব্য-যশ-টাকার পিছনে ছুটিয়া ছুটিয়া ক্লান্তপ্রাণ মধুসূদন—সুখ-শান্তি-হারা মধুসূদন—হতাশ আর্ত্তনাদে জীবনের শূন্যতার বেদনা ব্যক্ত করিয়াছেন—'**আমি সুখে থাকতে চেয়ে-**

ছিলাম, কিন্তু এ জীবনে তা আর হল না—কেমন যেন গোলমাল হয়ে গেল।" সুখের সব সামগ্রী থাকা সত্ত্বেও, সব কিছু গোলমাল হইয়া যাওয়া—ইহাই তো মধুসূদনের জীবনের অতিসংলক্ষ্য ট্র্যাজেডি॥ তবে এই ট্র্যাজেডির মূল জীবনের গভীরতম প্রদেশে—বাসনার গভীর স্তরে প্রোথিত; জীবনের মর্মকোষে ইহার বীজ নিহিত। জীবনকে সুখ শান্তি-সম্ভোগে সার্থককাম করিবার চেষ্টা—**আত্মপ্রতিষ্ঠার** কামনা প্রত্যেক জীবের মধ্যেই আছে॥ জীবের ইহা মৌলিক কামনা॥ জীবনী-শক্তি বলিতে, এই কামনারই সবল অভিব্যক্তি বুঝায়॥ অন্যভাবে বলা যায়, এই কামনার বেগ-বৈশিষ্ট্য জীবনী-শক্তির প্রকৃতি—'অহং'-এর এষণার-প্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে॥ যে অহং-সত্তায় এই বাসনার বেগ অতি দুর্ব্বল, সেই "অহং" যেমন নিরীহ, তেমনি যে ক্ষেত্রে বাসনা অতি বেগবান—সে "অহং" অস্থির ও অশান্ত। জীবনী শক্তির দৈন্য থাকিলে জীবন যেমন নির্জ্জিত তথা দুঃখ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইতে পারে—শোচনীয় পরিণতির আবর্ত্তে ঘুর পাক খাইতে খাইতে তলাইয়া যাইতে পারে, তেমনি এই শক্তির অতিরেকের ফলে জীবন ভারসাম্য হারাইয়া উৎকেন্দ্রিক উৎক্ষেপে কক্ষচ্যুত হইয়া যাইতে পারে—অধিকমাত্রায় আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে গিয়া আত্মহনন করিয়া বসিতে পারে॥ **সব অত্যন্তই গর্হিত॥** মধুসূদনের ট্র্যাজেডির মূলে আছে এই জীবনী-শক্তিরই (elan vital) আত্যন্তিক অতিরেক॥ **মধুসূদনের ব্যক্তি-সত্তার কেন্দ্রে এই অতিরেক** (excess of life)॥ ইহা একদিকে—জীবন সম্ভোগের অতিকামনা রূপে অন্যদিকে বাধা-বন্ধ-অসহিষ্ণুতার রূপে, অনমনীয় ইচ্ছাশক্তি রূপে—অবাধ স্বাধীনতা-কামনার রূপে প্রকাশ পাইয়াছে॥ জীবন সম্ভোগের অতিকামনা, উচ্চাকাঙ্ক্ষার অনির্ব্বাণ উদ্দীপনায় মধুসূদনকে উদ্‌ভ্রান্ত ও উর্দ্ধাকাশচারী করিয়া তুলিয়াছে—তাঁহার চোখে জাগাইয়া রাখিয়াছে কীর্ত্তি-খ্যাতি-শান্তি-সুখ প্রতিষ্ঠার এক মায়াঘন স্বপ্নাবেশ॥ এক অনির্দ্দেশ্য সুদূরের মোহিনী মায়ার হাত ছানিতে মধুসূদন যেন সম্মোহিত॥ মহাকবি হওয়ার দুর্ব্বার

আকাঙ্ক্ষা—আকাঙ্ক্ষা কেন—দৃঢ় প্রত্যয় তাঁহার সম্বন্ধে॥ তাহারই প্রেরণায় মধুসূদন— "sigh for Albion's distant shore—the land of Shakespeare and Milton" কিন্তু তাহাতেই কি আকাঙ্ক্ষার পরিনিবৃত্তি? এ এক অনির্ব্বাণ মহাজ্বালা॥ দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতে না পারিলে তাঁহার শান্তি নাই—"আমি দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতে চাই"— (১২১ প্রঃ) —মধুসূদন নিজেই বলিয়াছেন—"আমার জীবনের আকাঙ্ক্ষা অনেক বেশী—I can not rest half way—I must soar up and up till I am tired and even then I shall soar" জীবনের অতি-আবেগে মধুসদন যেন সেইরূপ এক নভোচারী বিহঙ্গ যে আকাশের কিনারা না খুঁজিয়া নীড়ে ফিরিয়া আসিবে না—শ্রান্তি ক্লান্তিতে শিরা উপশিরা অবশ হইয়া পড়িলেও যে পক্ষ সঞ্চালনে বিরত হইবে না॥ এত দুর্নিবার তাহার উচ্চাকাঙ্ক্ষা!

মধুসূদন যদি শুধুই স্বপ্নবিভোর—অলস বাসনাবিলাসী হইতেন তাহা হইলে হয়ত এত করুণ পরিণতি তাঁহার জীবনে ঘটিত না। জীবনের অতিমাত্রা তাঁহার মনে যেমন স্বপ্ন জাগাইয়াছে—উচ্চাশায় তাঁহাকে উদ্দীপিত করিয়াছে, তেমনি তাঁহার স্নায়ুতে সঞ্চার করিয়াছে অকম্পিত দৃঢ়তা—ইচ্ছা-শক্তিতে (will) ইস্পাত-কঠিন অনমনীয়তা এবং ব্যক্তিত্বের মধ্যে স্পর্শকাতরতা ও বাধা-অসহিষ্ণুতা॥ বাধা না মানার মন্ত্রণা রহিয়াছে তাঁহার স্বভাবে—তাহার রক্তে॥ তাঁহার স্পষ্ট ঘোষণা—"I won't be ruled over. I shall break through bonds. It is in my nature—it is in my blood" (৩৭ পৃঃ)॥ তাই তো মধুসূদন জাত-বিদ্রোহী॥ এক revolutionary"—"rebel" তাঁহার মধ্যে মাথা উঁচু করিয়াই আছে॥ সেই বিদ্রোহী পিতার "coercion" যেমন মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিতে পারে নাই তেমনি সমস্ত অবমাননা ও বাধার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া বলে—"I won't be treated shabbily"॥ জীবন-সম্ভোগের-অতিকামনাকে যদি বলা যায় 'অগ্নি'—এই

স্বভাবটিকে বলা যাইতে পারে 'বায়ু'॥ এই বায়ুর অনুকূল্যেই অগ্নির পক্ষে দাউ দাউ করিয়া জ্বলা সম্ভব হইয়াছে।

মধুসূদনের ব্যক্তি-প্রকৃতির মধ্যেই তাঁহার জীবনের ট্র্যাজেডির সম্ভাবনা নিহিত। নিয়তি বলিয়া কোন শক্তিকে যদি এখানে স্বীকার করিতে হয়, স্বীকার করিতে হইবে—মধুসূদনের প্রকৃতিই সেই নিয়তি—তাঁহার character-ই 'destiny' তাঁহার "পশ্চাতের-আমি"ই তাঁহার 'সম্মুখের-আমি' কে ঠেলিয়া লইয়া চলিয়াছে। নিজের চরিত্র সমালোচনা করিতে গিয়া তিনি যে বলিয়াছেন—তিনি—"reckless, tactless, thoghtless, and everythingless" তাহা হয়তঃ সর্ব্বাংশে সত্য নয়। অন্ততঃ everythingless যে তাঁহাকে বলা যায় না এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহার চরিত্রের মেরুদণ্ড স্বরূপ যে একটি প্রবৃত্তি প্রবল বাসনা-ব্যগ্র অস্মিতা-স্ফীত এবং স্পর্শকাতর ব্যক্তিত্ব আছে এ বিষয়েও কোনো সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ এই জাতীয় চরিত্র, তাঁহাদের স্বভাবেই, ট্র্যাজেডির বীজ বহন করে। ইহাদের জীবনে উত্তাপেরও গতির চাহিদা এত বেশী যে সংযমের এবং নিয়ম শৃঙ্খলার গণ্ডীর মধ্যে থাকিয়া জীবন-যাপন করার ধৈর্য্য ইহাদের থাকে না। উত্তাপ আহরণ করিতে গিয়া সমগ্র বিশ্বকে মুখের মধ্যে পুরিতে চায় এবং অপর জীবনকে—শেষ পর্য্যন্ত নিজেকেও, একেবারে অঙ্গারে পরিণত করে। গতির আবেগেই, পারিপার্শ্বিক জীবনের সহিত সংঘর্ষ বাধাইয়া দেয় এবং সেই দ্বন্দ্ব সংঘাতে অপরকে এবং নিজেকেও চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ফেলে। জীবন সম্ভোগের প্রবল আবেগে জীবনকেই ইহারা শেষ করিয়া ফেলে—কল্পিত সুখ-শান্তির মরীচিকার পিছনে ছুটিয়া শুষ্কতালু হইয়া অকালে শুকাইয়া মরে। এই জাতীয় লোকের ট্র্যাজেডিতে, পরিবেশ অপেক্ষা নিজেদের দায়িত্বই সমধিক। মধুসূদনের ট্র্যাজেডিতেও তাঁহার নিজের দায়িত্বই বেশী।

Nature and Nurture—সহজাত প্রকৃতি এবং শিশুকালীন শিক্ষা-দীক্ষা মিলিয়া প্রকৃতির গোড়াপত্তন হয়। মধুসূদনের প্রকৃতিও এই নিয়মেই

গঠিত হইয়াছে। সহজাত স্নায়বিক গঠন এবং পারিবারিক শিক্ষা দীক্ষার নিয়ন্ত্রণ মিলিয়াই মধুসূদনের অসাধারণ প্রকৃতির গোড়াপত্তন করিয়াছে এবং তাহারই দ্বারা মধুসূদনের ভাবী কার্য্যকলাপ নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। এ কথা সত্য—ইংরেজের আধিপত্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে,—ইংরেজ জাতির এবং ইংরেজি জ্ঞান-বিজ্ঞান-সাহিত্যের ব্যাপক প্রতিষ্ঠার উপরে বাঙালীর বিস্ময়মিশ্র শ্রদ্ধা বাড়িতে থাকে—তাহাদের সম্মুখে নূতন এক আকাশের অবকাশ উন্মুক্ত হয় এবং সেই আকাশের আলোক-রশ্মি আসিয়া অনেকের চোখেই ধাঁধা লাগায়; বহু উদ্‌গতপক্ষ বিহঙ্গমের পক্ষবিধূনন ও কূজন শোনা যায়। কিন্তু সেই আলো মধুসূদনের চোখে এমন এক সুখ-শান্তি-মুক্তির মোহ বিস্তার করে যে, তিনি নীড়ের মায়া ত্যাগ করিয়া সেই আলোর পিছনে পতঙ্গের মতো অন্ধ আবেগে ছুটিয়া যান। ইংরেজীতে কাব্য লিখিয়া তিনি পৃথিবীর কবি হইবেন,—পৃথিবীর কবির সহধর্ম্মিনী হইতে পারে এমন শিক্ষিতা রুচিমতী কন্যাকে বিবাহ করিবেন, অক্ষয়কীর্ত্তি, অফুরন্ত অর্থ-প্রতিপত্তি সুখ শান্তিতে জীবন কাণায় কাণায় পূর্ণ হইয়া উঠিবে—এইভাবে জীবনকে তিনি নিঙড়াইয়া ভোগ করিবেন—ইহাই তাঁহার জীবনের স্বপ্ন হইয়া উঠে। যে অহং পুরুষের (ego) চোখে এই স্বপ্ন জাগে, তাহার প্রকৃতি—পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—অসাধারণ। রক্তে তাঁহার স্বৈরাচারের মন্ত্রণা। অত্যধিক স্নেহের প্রশ্রয়ে তাহা আরো পুষ্ট হয়। প্রবৃত্তির তরঙ্গে তরঙ্গে দোল খাইতেই মধুসূদন অভ্যস্ত। নিবৃত্তি বা সংযম শৃঙ্খলার সহিত পরিচয় একরূপ হয় না বলিলেই হয়। অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করিয়া করিয়া মনের এমন অবস্থা হয়—চিত্ত এত স্পর্শকাতর হয়, যে সামান্যতম বাধা পাইতেই তাঁহার অহংবোধ আহত হইয়া পড়ে—ক্ষুব্ধ হইয়া উঠে। এইরূপ যাঁহার প্রকৃতি তাঁহার উচ্চাকাঙ্ক্ষা কিছুতেই মানস-বিলাসমাত্রে পর্য্যবসিত হইতে পারে না; মধুসূদনেরও হয় নাই। মধুসূদনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ভীরুস্বভাব বিলাসীর সাধের স্বপ্ন হইয়া থাকে নাই, আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে সে দৃঢ় সঙ্কল্প লইয়া অগ্রসর হইয়াছে।

মধুসূদন জীবনের একটা ছক—আদর্শ পরিকল্পনা—যেন আগেই আঁকিয়া লইয়াছেন। মহাকবি হইতে হইলে ইংলণ্ডে অবশ্যই যাইতে হইবে—সুতরাং খ্রীষ্টান না হইলে চলিবে না; এদিকে রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা দেবকীকে পাইতে হইলেও খ্রীষ্টান হইতে হইবে। অতএব; মহাকবি হওয়ার আকাঙ্ক্ষা এবং দেবকীকে বিবাহ করার আকাঙ্ক্ষা—এই দুই আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিবার প্রাথমিক আয়োজন খ্রীষ্টান হওয়া। খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের মূল কারণ এখানেই। পিতার 'coercion' তাঁহার জীবনে প্রথম বাধা এবং সেই বাধা তাঁহার অভিমানকে ক্ষুব্ধ করেও বটে, কিন্তু উহা তাঁহার গৃহত্যাগের এবং ধর্মান্তরগ্রহণের নিমিত্তকারণ মাত্র। পিতা বাধা না দিলে ধর্মান্তর গ্রহণে একটু বিলম্ব হইত—এই যাহা পার্থক্য।

কিন্তু জীবন-সম্ভোগের যে যে আশা লইয়া মধুসূদন খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেন তাহা একে একে মরীচিকার মতো মিলাইয়া যাইতে থাকে। পাদ্রীরা প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন না—তাঁহাকে ইংলণ্ডে লইয়া যান না। আর "দেবকী"কেও রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন তাঁহার হস্তে সম্প্রদান করেন না। ইংলণ্ড এবং দেবকী—দুই প্রিয় কামনাই অপূর্ণ থাকে—দুইটি আশাই ভঙ্গ হইয়া যায়। একূল ওকূল দুই কূল হারাইয়া, মধুসূদন আশাভঙ্গের মনস্তাপ লইয়া মাঝ দরিযায় ভাসিতে থাকেন। জীবনের ট্র্যাজেডি আরম্ভ হয়—শান্তি ও স্বস্তি বিদায় গ্রহণ করে। তিনি তো "dead log of wood" নহেন। পিতা মাতার স্মৃতি—বিশেষতঃ মাতার কাতর দৃষ্টি তাহাকে অনুক্ষণ পীড়া দেয়। তাঁহার—"শান্তি নেই—রাত্রে ঘুম হয় না"। প্রীতি ও স্মৃতি কি এত সহজেই মরে? বিসর্জ্জনের বাজনা শুনিয়া তাঁহার চোখ জলে ভরিয়া উঠে। সুখ-শান্তির আশায় ঝাঁপ দিয়াছেন, কিন্তু 'ঘরেও নহে পারেও নহে'...অবস্থা, যাঁহার উদ্দেশ্যে ঝাঁপ দিয়াছেন সেই সুখ-শান্তিই হারাইয়া বসিয়াছেন! কূলহারার কূলে পৌছিবার নিষ্ফল সংগ্রামের ট্র্যাজেডিই মধুসূদনের জীবনের আসল ট্র্যাজেডি।

শান্তি নাই। স্বস্তিও তাঁহার ভাগ্যে নাই। ঐরূপ অহং-স্ফীত ভোগ-প্রবণ ব্যক্তির স্বস্তি কোথায়? অসহিষ্ণু প্রতিবাদের আঘাতে বারবার স্বস্তির আবহাওয়া ক্ষুব্ধ করিয়া তুলেন। বিশপ কলেজে তিনি তাহাই করেন। বিদ্রোহী মধুসূদন—স্পর্শকাতর ও আত্মাভিমানী মধুসূদন পাদ্রীদের পক্ষপাত ও অবমাননাকে মাথা পাতিয়া সহ্য করিতে পারেন না। সক্রিয় প্রতিবাদ করিয়া স্বস্তিটুকুর সহিত বাদ সাধেন। কৃষ্ণমোহনের মুখের উপরেও বেয়াড়া কথা বলিতে তাঁহার বাধে না—দেবকীর-পিতাকেও ছাড়িয়া কথা বলেন না। আবার প্রায়শ্চিত্তের খিড়কি দরজা দিয়া হিন্দু সমাজে ফিরিয়া আসিয়া স্বস্তিলাভ করিবেন, সে ধাতুতেও তিনি গঠিত নহেন। তাই বিশপ কলেজে পড়া বন্ধ হইলে, অগত্যা তাঁহাকে দেশত্যাগ করিয়া, জীবিকার্জ্জনের জন্য মাদ্রাজ যাইতে হয়। মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া রাজার দুলালকে জীবিকার্জ্জন করিতে হইয়াছে। জীবনে যিনি টাকা পয়সা গুনিয়া বকশিস দেন নাই—হাতে যাহা উঠিয়াছে তাহাই দিয়াছেন—সেই "রাজনারায়ণের ছেলে"কে অবিরাম পাওনাদারদের কড়া তাগাদা সহ্য করিতে হইয়াছে—নিত্য অভাবের কুণ্ড বুকে জ্বালাইয়া জীবনযাপন করিতে হইয়াছে। মাদ্রাজ হইতে দেশে ফিরিয়া মধুসূদন এই অভাবের তাড়নার হাত তথা যন্ত্রণা (suffering) এড়াইতে পারেন নাই। চাকরী করিয়া এবং বই লিখিয়া টাকা পাওয়া সত্ত্বেও, অর্থাভাব তাঁহার নিত্যসঙ্গী হইয়াই রহিয়াছে। যিনি "দাউ দাউ ক'রে জলতে" চাহেন—"রাশি রাশি টাকা মুঠো মুঠো খরচ করতে" চাহেন—যিনি simply hate to live in close atmosphere, ঐরূপ অবস্থায় যাঁহার দম আটকাইয়া যায়—সেই বৈশ্বানর সম্ভোগী কি এক আধ চামচে ঘি পাইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন? মধুসূদনের পক্ষে এই অর্থাভাব যে কত বেদনাদায়ক, মধুর হিন্দুকলেজের সহপাঠী ছাড়া আর কেহই তেমন উপলব্ধি করিতে পারিবেন না।—"a five hundred rupees per month are too inadequate for a poet of my calibre"—পরিহাস-বিজল্পিত নহে—অন্তরের কথা। তাই দেখা

পরিণতিকে রূপায়িত করা। বলা যাইতে পারে, চরিত নাট্যকার বনফুলের লক্ষ্য সম্পূর্ণ একাগ্র নহে। এক অগ্র মধুসূদনের ব্যক্তিত্ব প্রকাশের দিকে—জীবনের ও যুগের তথ্য পরিবেষণের দিকে প্রবণায়িত অন্য অগ্র—ট্র্যাজেডি-পরিণাম দেখাইবার দিকে নিয়োজিত। অতএব সূত্র করা যাইতে পারে, এই দুই প্রবণতার নির্বিরোধ সামঞ্জস্য যে পরিমাণে ঘটিতে পারিয়াছে, সেই পরিমাণেই নাটকের গঠন প্রশংসনীয় হইয়াছে। আর তথ্য-প্রবণতা যেখানে রস-চেতনাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে—রস হইতে বস্তু যেখানে দূরবর্ত্তী বা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে, সেইখানেই স্রষ্টা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়াছেন। গঠন বিচারে এই সূত্রটিকে আমরা মূল সূত্র হিসাবে গ্রহণ করিতে পারি।

অবশ্য গঠন-বিচার বলিতে বুঝায় সাধারণতঃ সমগ্র বৃত্ত-কল্পনাটির বিচার এবং বিশেষতঃ বুঝায়—সন্ধি-বিভাগ এবং অঙ্ক-দৃশ্য-পরিকল্পনার বিচার; আরো বিশেষতঃ—সমগ্র **কার্য্যকে** (action) কিভাবে সন্ধি-বিভক্ত করা হইয়াছে, তাহার বিচার যে-অঙ্ক বা দৃশ্যপরিকল্পনার দ্বারা কার্য্যকে ব্যক্ত করা হইয়াছে, উহার ঘটনা-যোজনার উপযোগিতার এবং কৌশলের বিচার সেই সমস্ত ঘটনার স্থানকালপাত্র-গত ঔচিত্যের বিচার। সুতরাং শ্রীমধুসূদন' নাটকখানির গঠন সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্তে পৌছিবার আগে আমাদেরও সমস্ত দৃশ্য-পরিকল্পনার দোষ-গুণ বিচার করিয়া দেখিতে হইবে—যে সমস্ত ঘটনার (incidents) সংযোগে নাট্যকার এক একটি দৃশ্য রচনা করিয়াছেন, তাহাদের আবশ্যকতা, সংযোগ-গ্রন্থির সবলতা-দুর্ব্বলতা, সংশ্লেষ-বিশ্লেষের দোষ-গুণ এবং সর্বোপরি তাহাদের কার্য্যানুবন্ধিতা (necessary for action) বিচার করিতে হইবে।

প্রথমতঃ, যে দৃশ্য-পরিকল্পনার সাহায্যে নাট্যকার মধুসূদনের জীবন—তাঁহার ব্যক্তিত্ব আচার-আচরণ এবং শেষ-পরিণতি, রূপ দিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহার সামান্য পরিচয় দেওয়া যাক। আমরা দেখি—শ্রীমধুসূদন নাটকে নাট্যকার—১৮৪৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত—

৩০ বৎসর-ব্যাপী কার্য্যকে (action) রূপ দিয়াছেন এবং এই রূপকে ছোট-বড় মোট একুশটি দৃশ্যে উপস্থাপিত করিয়াছেন। অঙ্ক-বিভাগ নাই বটে, কিন্তু বিরতি দ্বারা অঙ্ক-বিভাগের প্রয়োজন মেটানো হইয়াছে। এইরূপ বিভাগের কৈফিয়ৎ ভূমিকায় নাট্যকার নিজেই দিয়াছেন।

(ক) প্রথম হইতে ষষ্ঠ দৃশ্য অবধি :—প্রধান ঘটনা—মধুসূদনের খ্রীষ্টধর্ম-গ্রহণ। খ্রীষ্টধর্মে-দীক্ষিত মধু মায়ের সহিত দেখা করিতে আসিয়াছেন এখানেই ষষ্ঠদৃশ্যের শেষে প্রথম বিরতি। (খ) সপ্তম হইতে নবম তিন দৃশ্যের পর দ্বিতীয় বিরতি। এখানকার প্রধান উপস্থাপ্য মধুসূদনের বিশপ কলেজের জীবন, দেবকীর প্রতি অনুরাগ, পাদ্রীরা প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করায় মধুসূদনের ক্ষোভ ও আশাভঙ্গ এবং দেবকীর সহিত মধুসূদনের বিবাহে রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহনের অনিচ্ছা, দেবকীর সহিত মধুর বিচ্ছেদ।—ইংলণ্ডে গমন এবং দেবকীর পাণিগ্রহণ—দুই আশাই ভঙ্গ। (গ) **দশম-একাদশ** দুই দৃশ্যে মাদ্রাজ প্রবাসের প্রথম পর্য্যায়—অর্থাৎ মাতৃবিয়োগ পর্য্যন্ত মাদ্রাজ-জীবন, মাতৃবিয়োগের পর কলিকাতা আগমন উপস্থাপিত। একাদশের পরে **তৃতীয় বিরতি**। (ঘ) দ্বাদশ দৃশ্যের পরেই—**চতুর্থ বিরতি**। এই দৃশ্যে—মাদ্রাজ প্রবাসের পরিসমাপ্তি—রেবেকার সহিত বিচ্ছেদ—হেন্‌রিয়েটার সহিত প্রণয় ও পরিণয় রূপ দেওয়া হইয়াছে (ঙ) ত্রয়োদশ হইতে ষোড়শ দৃশ্য অবধি—চার দৃশ্যে কলিকাতার এবং কাব্য-সাধনার জীবন—ব্যারিষ্টার হইবার জন্য বিলাত যাইবার প্রস্তুতি প্রদর্শিত। ষোড়শ দৃশ্যের পরে **পঞ্চম বিরতি**। (চ) সপ্তদশ দৃশ্যে—মাত্র একটি দৃশ্যেই ইউরোপ প্রবাসের জীবন উপস্থাপিত। এই দৃশ্যের পরেই—**ষষ্ঠ বিরতি** (ছ) অষ্টাদশ হইতে একবিংশতি বা 'শেষ দৃশ্য' পর্য্যন্ত চারিটি দৃশ্যের পরে 'যবনিকা'-পাতে শেষ বিরতি। এই কয়টি দৃশ্যে বিলেত-প্রত্যাগত ব্যারিষ্টার মধুসূদনের অর্থোপার্জনের সংগ্রাম—নিষ্ফল সংগ্রাম এবং শোচনীয় পরিণতি প্রদর্শিত হইয়াছে।

"বিরতি"-বিভাগের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে প্রথমেই এই কথাটা মনে আসে যে—বিরতিগুলির মধ্যে সমপরিমাণ ব্যবধান নাই। ৬ দৃশ্যের পরে প্রথমে বিরতি, প্রথম ও দ্বিতীয়ের মধ্যে ৩ দৃশ্যের ব্যবধান, দ্বিতীয়-তৃতীয়ের মধ্যে—২ দৃশ্যের, তৃতীয়-চতুর্থের মধ্যে ১ দৃশ্যের, চতুর্থ-পঞ্চমের মধ্যে—৪ দৃশ্যের, পঞ্চম-ষষ্ঠের মধ্যে ১ দৃশ্যের, এবং ষষ্ঠ এবং শেষ বিরতির মধ্যে—৪টি দৃশ্যের ব্যবধান। এইরূপ বিষম "বিরতি"-বিভাগের ফলে অভিনয়ের সাবলীল গতি ব্যাহত হইবার আশঙ্কা আছে। এক বিরতির পরে অপর বিরতি অতি বিলম্বে বা অতি-দ্রুতভাবে উপস্থিত হইলে দর্শক-চিত্তের প্রত্যাশা আহত হইতে পারে—দর্শকচিত্তে বিরক্তি দেখা দিতে পারে। অঙ্ক বা "বিরতি" বিভাগের সৌষম্যের অভাব গঠন-সুষমার দৈন্যই সূচিত করে। অবশ্য নাট্যকার এ বিষয়ে অনবহিত নহেন। ভূমিকায় লিখিয়াছেন—"প্রতি দুই অঙ্কের মধ্যে সময়-সাম্য রক্ষা করা সম্ভবপর হইল না বলিয়া সাধারণ প্রথামত নাটকটিকে আমি অঙ্কে বিভক্ত করি নাই। অভিনয়কালে—যদি অবশ্য কখনও অভিনীত হয়—যে যে দৃশ্যের পর বিরতি দিলে শোভন হইবে তাহাই কেবল লিখিয়া দিয়াছি।"

তারপর, একুশ-দৃশ্য-বিভক্ত নাটকখানির অভিনেয়ত্ব সম্পর্কেও প্রশ্ন উঠিতে পারে। নাট্যকারের নিজেরও ধারণা ছিল—যদিও তাহা ভ্রান্ত ধারণা—"এ নাটক কখনও অভিনীত হইবে না"। এই ধারণার কারণ বোধ হয়—নাটকখানির ১৭৯-পৃষ্ঠাব্যাপী বিস্তৃতি। গড়ে ১০ মিনিট করিয়া প্রতি দৃশ্যের জন্য লাগিলে, ২১ দৃশ্যের অভিনয়ে—২১×১০=২১০ মিনিট সাড়ে তিন ঘণ্টা—"বিরতি" লইয়া চার সাড়ে চার ঘণ্টা লাগিবার কথা। এদিকে সাধারণ রঙ্গমঞ্চে—২॥ ঘণ্টা, ৩ ঘণ্টার বেশী সময় দেওয়া ব্যবসায়ের খাতিরেই সম্ভব হয়না। দুইবার অভিনয় করিতে না পারিলে তাহাদের ব্যবসায় ভাল জমে না। ফলে সিনেমার চাপে, অভিনেয়ত্বের কাল-মাত্রাও এই ২॥ বা ৩ ঘণ্টায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাই বলিয়া এ কথা বলিলে

ভুল হইবে—নাটকখানি অভিনেয় নহে। শুধু অভিনয়ের কালব্যাপ্তি দ্বারা অভিনেয়ত্ব যাচাই করিতে যাওয়া ঠিক হইবে না।

দৃশ্য-পরিকল্পনার বিশেষ পরিচয়

প্রথম দৃশ্যে—মুখ্যভাবে মধুসূদনের চারিত্রিক প্রবণতাগুলি—বীজাকারে স্থাপিত হইয়াছে এবং কার্য্যারম্ভের সূচনা করা হইয়াছে। **প্রবণতাসমূহ**—(ক] পোষাক-পরিচ্ছদ বিষয়ে বিলাসিতা [খ] শিক্ষিতা এবং পরিণতবয়স্কা মেয়ে—(দেবকীকে বা ইংরেজের মেয়ে) বিবাহ করিবার ইচ্ছা [গ] প্রাণঢালা বন্ধু-প্রীতি [ঘ] পিতার প্রশ্রয়ে—ধূমপানে ও মদ্যপানে আসক্তি। [ঙ] সংগীতে ও সাহিত্যে রতি—মহাকবি হওয়ার প্রবলতম আকাঙ্খা—তত প্রবলতম ইংলণ্ডে যাওয়ার বাসনা [চ] বাধা-অসহিষ্ণু স্পর্শকাতর চিত্ত—**কার্য্যারম্ভ:** বিবাহ-ব্যাপারে রাজনারায়ণের জিদ—"Coercion"—এবং মধুসূদনের প্রতিক্রিয়া। **ব্যক্তিগত ও সামাজিক তথ্য:**—মধুসূদনের বাল্যকালের কয়েকটি ঘটনা—অবশ্য চরিত্রদ্যোতক—অসাধ্যসাধন করিবার প্রবৃত্তিরও শক্তির দ্যোতক। ঘটনা:—[ক] ভায়ের সঙ্গে ভাব করিবার জন্য পোষা পাখীর ছানা কাটিয়া ফেলা [খ] পাঠশালায় পড়িবার কালেই রামায়ণ মহাভারত, কবিকঙ্কণ চণ্ডী প্রভৃতি বই পড়া। **অন্যান্য তথ্য:**—হিন্দু কলেজের শিক্ষকদের প্রকৃতি ও কার্য্যকলাপ—বিশেষতঃ গণিত অধ্যাপক রিজ সাহেব, ক্যাপ্টেন রিচার্ডসন, 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকার সম্পাদক রসিক কৃষ্ণ মল্লিক প্রভৃতির সংবাদ

দ্বিতীয় দৃশ্য—মুখ্য উপস্থাপ্য ঘটনা—মধুসূদনের গৃহত্যাগ এবং খৃষ্টধর্ম গ্রহণের উদ্যোগ—মুন্সী রাজনারায়ণের প্রতিক্রিয়া। এই উপস্থাপনার জন্য, গৌরদাস বসাকের পিতা রাজকৃষ্ণ বসাকের বাড়ীতে 'দৃশ্য' স্থাপনা করা হইয়াছে এবং রাজকৃষ্ণ বসাকের চরিত্রও সংলাপ দ্বারা, পটভূমি হিসাবে, হিন্দু ধর্মের সঙ্কটের রূপটি আঁকা হইয়াছে। রূপটি এই—একদিকে পাদ্রীদের

প্রচার—কুলাঙ্গার কেষ্ট বন্দ্যো'র দুর্মতি—ছেলে ধরিয়া খ্রীষ্টান করার চেষ্টা, অন্যদিকে ব্রাহ্মদের প্রচার। এক দিকে ডিরোজিও অন্যদিকে রামমোহন—সনাতন হিন্দুধর্মের মহাসঙ্কট।

এই দৃশ্যে নিম্নলিখিত তথ্যের সমাবেশ করা হইয়াছে—[১] হেয়ার সাহেবের ছাত্রপ্রীতি [২] কুলাঙ্গার কেষ্ট বন্দ্যোর খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারের আবেগ [৩] খিদিরপুরের—মধুর বাড়ীর পাশেরই—নবীন মিত্রের খ্রীষ্টান হওয়া [৪] রামগোপাল ঘোষের জর্জ টমসনের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া বক্তৃতা দান—[৫] ফৌজদারী বালাখানায় বৃটিশ ইংণ্ডিয়া সোসাইটির উদ্যোগ [৬] দ্বারকানাথ ঠাকুর জর্জ টমসনকে এদেশে আনিয়া মহোপকার করিয়াছেন—[৭] চক্রবর্তী ফ্যাক্‌সন [৮] 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া'র মন্তব্য [৯] মধুর আর:দুই বড় ভাই···প্রসন্ন ও মহেন্দ্র অকালে মৃত। [১০] তত্ত্ববোধিনী সভা তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রতাপ। [১১] "চন্দ্রিকা-প্রকাশে"-প্রকাশিত কেষ্ট বন্দ্যোর ছেলে-ধরার কাহিনী।

তৃতীয় দৃশ্যে—মধুসূদনের বন্ধু—বঙ্কু, ভোলানাথ, রাজনারায়ণ, ভূদেব—প্রভৃতির কথোপকথনের সাহায্যে—বিশেষতঃ রক্ষণশীল ভূদেবের সমালোচনা দ্বারা এবং প্রগতিশীল বঙ্কু, ভোলানাথ প্রভৃতির সমর্থন দ্বারা, মধুর প্রকৃতিও আচরণের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, এবং বিশেষভাবে দেখানো হইয়াছে—মধুর খৃষ্টান হওয়ার অটল সঙ্কল্প এবং পিতার "coercion"এর বিরুদ্ধে—মিলিটারি মেজাজের বিরুদ্ধে—মধুর ততোধিক মিলিটারি মেজাজ। মধু "পয়েণ্ট ওখানের দলে"—টাকা-পয়সা লেনদেন ব্যাপারে মধুর দরাজ হাত।

চতুর্থ দৃশ্যে—প্রধান ঘটনা—জাহ্নবীর অনুরোধে রাজনারায়ণকে লাঠি শড়কির সাহায্যে মধুকে উদ্ধার করার সঙ্কল্প ত্যাগ করা—প্যারীচরণের মুখে কয়েকটি সংবাদ পরিবেষণ করা :—(ক) গৌরদাস—ভূদেবকে পাদ্রিরা দেখা করিতে দেয় নাই। (খ) ভূকৈলাসের রাজা সত্যশরণকেও প্রবেশ করিতে দেয় নাই। [এই দৃশ্যে—ভিখারিণীর মুখে গুপ্ত কবির একখানি গান দেওয়া

হইয়াছে। জাহ্নবীর যে মানসিক অবস্থা তাহাতে গান শুনিবার বা শোনাইবার অবকাশ নাই বলিয়াই মনে হয়। কালক্ষেপের প্রয়োজন আছ বটে, কিন্তু গানের সাহায্য লওয়া ঠিক হয় নাই।]

পঞ্চম দৃশ্যে—ডাঃ কোরবাইনের বাড়ীতে—মধু ও গৌরদাসের সাক্ষাৎকার—মধুর নিজের মুখেই আত্মবিশ্লেষণাত্মক কথা শোনা যায়। এখানেই প্রথম মধুসূদনের অন্তর্দ্বন্দ্বের—Private feelings-এর আভাস পাওয়া যায়—জানা যায়, মধুসূদনের মনে মায়ের জন্য কত গভীর ও তীব্র আবেগ। একদিকে তাঁহার "Principle"—অন্যদিকে মায়ের আকর্ষণ। মায়ের মূর্ত্তি দিনরাত তাঁহার চোখে ভাসে—"She haunts…" শান্তি কোথায়? 'তথ্য' পাওয়া যায়—দীক্ষার সময় যে গানটি গাওয়া হইবে তাহা মধুর নিজেরই রচিত।

ষষ্ঠ দৃশ্যে—প্রধান ঘটনা—মায়ের অনুরোধে, পিতার দেওয়া টাকা লইয়া বিশপ কলেজে পড়িতে মধুর সম্মতি। **আনুষঙ্গিক ঘটনা** :—পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে রাজনারায়ণকে জাহ্নবীর অনুরোধ—রাজনারায়ণের মৌন সম্মতি—মায়ের প্রায়শ্চিত্তের প্রস্তাবে মধুর দৃঢ় অস্বীকৃতি। (মাতা পুত্রের সাক্ষাৎকারের করুণ দৃশ্য)।*

[রাজনারায়ণের চরিত্র এখানে একটু লঘু হইয়া পড়িয়াছে। জাহ্নবীর উক্তি—"ঠিকই বলছি—তোমার মনের কথা আমি বুঝতে পারি… [৪৩ পৃষ্ঠা]—এবং রাজনারায়ণের উক্তি—"অবাধ্য ছেলেকে বাড়ীতে স্থান দিতে পারব না আমি ; সে অনুরোধ আমায় করো না" রাজনারায়ণের চরিত্রের গাম্ভীর্য্যহানি ঘটাইয়াছে।]

(প্রথম বিরতি)

সপ্তম দৃশ্যে—মুখ্য উপস্থাপ্য ঘটনা স্বাধীনচেতা মধুর বিশপ কলেজের কীর্ত্তি—দেবকীর সহিত মধুর মধুর সম্পর্ক—দেবকীকে বিবাহ করিবার জন্য

মধুর ব্যাকুলতা।—[ট্র্যাজেডির সূচনা]—গৌরদাসের কাছে মধুর স্বীকৃতি —"আমি আমার মনের অবস্থাটা ঠিক বোঝাতে পারব না ভাই তোকে। ভাই গৌর বলতে পারিস কি করলে শান্তি পাওয়া যায়। আমার মনে শান্তি নেই—রাত্রে ঘুম হয় না আমার।"…"…I am studying Greek. Latin and Sanskrit—কিন্তু শান্তি নেই—রাত্রে ঘুম হয় না। বিসর্জ্জনের বাজনা শুনে সেদিন আমার চোখে বলে এসে গেছল ভাই। আবার হিন্দু হওয়া যায় না। কিন্তু প্রায়শ্চিত্ত আমি করব না।" [দৃশ্যের প্রথমে জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কমলমণির আলাপ—পরিহাস রসাত্মক। আলাপ একটু দীর্ঘ হইয়াছে। জ্ঞানেন্দ্রনাথ ও দেবকীর আলাপ দিয়া দৃশ্যটি আরম্ভ করিলে বিশেষ কোন ক্ষতির সম্ভাবনা নাই]

অষ্টম দৃশ্যে—রাজনারায়ণের সহিত মধুসূদনের সাক্ষাৎকার—এবং "heathen rascals" কথাটিকে কেন্দ্র করিয়া পিতা-পুত্রে সংঘর্ষ—অবশ্য পিতার উত্তেজনাই সমধিক প্রদর্শিত হইয়াছে। রাজনারায়ণের চাপা বাৎসল্য এবং আহত অভিমান—আর মধুর মায়ের প্রতি টান—দুইটির সংস্পর্শে এবং সংঘর্ষে দৃশ্যটির রসোজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করিয়াছে।

নবম দৃশ্যে—মধুসূদনের দ্বিতীয় আশা ভঙ্গ হইয়াছে। রেভারেণ্ড কৃষ্ণ-মোহন মধুর মত 'উচ্ছৃঙ্খল মাতালের হাতে দেবকীকে দিতে' অসম্মত হইয়াছেন। এই দৃশ্যে এই সকল তথ্য পরিবেষণ করা হইয়াছে :— (ক) মধুর গ্রীক-লাতিন-ইংরেজি সাহিত্য আবৃত্তি করার ক্ষমতা (খ) "বিবিধার্থ-সংগ্রহ" —পত্রিকা (গ) বিশপ কলেজে স্বাধীনচেতা মধুর দ্বিতীয় কীর্তি—মদ দেওয়া ব্যাপারে শাদা চামড়া কাল চামড়ার পার্থক্য করায় খাবার টেবিলে গ্লাস চুরমার করা (ঘ) বই বাঁধা দিয়া টাকা ধার করা—[অমিতব্যয়িতা]। (ঙ) মধুসূদনের বাবা খরচ দেওয়া বন্ধ করিবেন।

(দ্বিতীয় বিরতি)

বিঃ দ্রঃ [যে দুইটি আশায় মধুসূদন খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করিয়াছেন সেই দুটিই

আশাই ভাঙিয়া গিয়াছে। আশাভঙ্গের অন্তর্দাহ শান্তিহারা জীবনের যন্ত্রণাকে আরো বাড়াইয়া দিয়াছে।]

দশম দৃশ্যে—মাদ্রাজ জীবনের ঘটনা। [ক] অরফ্যান স্কুলে শিক্ষকতা করিয়া ভদ্রভাবে থাকা যায় না বলিয়া "টিমথি পেনপোয়েম" ছদ্মনামে 'সার্কুলেটর, 'এথিনিয়ম', 'স্পেকটেটার' প্রভৃতি পত্রিকায় "ক্যাপটিভ লেডী" এবং অন্যান্য কবিতা রচনা। [খ] ঋণের উপর ঋণ করিয়া চাল বজায় রাখার চেষ্টা। [গ] হিব্রু, গ্রীক, তেলেগু, সংস্কৃত, লাতিন, ইংলিশ প্রভৃকি ভাষা শিক্ষা। অন্যান্য তথ্য :—[ব্যক্তিগত]—বাংলা শিক্ষা—রেবেকার যহিত সম্পর্কের অবনতি—হেনরিয়েটার সহিত নূতন সম্পর্ক। গৌরদাসের পত্রে মায়ের মৃত্যু-সংবাদ। [বাংলার খবর] [ক] "হরকরা" পত্রিকার সংবাদ :—"ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশান" প্রতিষ্ঠা। [খ] ব্ল্যাক এ্যাক্ট ব্যাপারে চটিয়া সাহেবরা রামগোপাল ঘোষকে 'এগ্রিহরটি কালচারাল সোসাইটি'র সহকারী সভাপতির পদ হইতে সরাইয়া দিয়াছিলেন।

একাদশ দৃশ্যে—মায়ের মৃত্যু সংবাদ পাইবার পর মধুর কলিকাতা আগমন [১৮৫১ খ্রীঃ অঃ]। রাজনারায়ণের মৃতা জাহ্নবীর জন্য শোচনা, অসাক্ষাতে মধুর জন্য পিতৃহৃদয়ের স্নেহব্যাকুলতা, সাক্ষাতে মধুসূদনের সহিত কর্কশ ব্যবহার—দৃশ্যটিকে খুব রসোজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে।

দ্বাদশ দৃশ্যে—মাদ্রাজ জীবনের শেষ পর্ব। রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহনের হাতে গৌরদাস যে পত্র দিয়াছিলেন সেই পত্রে মধু পিতার মৃত্যু-সংবাদ পান এবং মাদ্রাজ ত্যাগ করেন। এই দৃশ্যে নিম্নলিখিত তথ্যরাজি প্রয়োগ করা হইয়াছে [১] বাংলা গদ্য সাহিত্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বেতালপঞ্চ-বিংশতির আবির্ভাব [২] বাংলাদেশ ও বাংলাভাষার উপরে মধুসূদনের অভিমান [৩] বেথুন সাহেবের 'ক্যাপটিভ লেডী' কাব্যের প্রশংসা—বেথুনের মৃত্যু [৪] বাংলায় লেখার জন্য বেথুনের নির্দ্দেশ [৫] রেবেকার ডাইভোর্স।

বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রবেশ

ত্রয়োদশ দৃশ্যে—'রত্নাবলী নাটকের ইংরেজি অনুবাদ করিবার জন্য মধুসূদনকে আহ্বান, মধুর কিশোরীচাঁদের ইণ্টারপ্রেটরের পদ—১২০ টাকার চাকরী গ্রহণ—বাংলায় ভাল নাটক রচনার এবং অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্ত্তনের সঙ্কল্প গ্রহণ—মুখ্য উপস্থাপ্য বিষয়। সমসাময়িক কালের তথ্য: –[৪] কালী প্রসন্ন কর্তৃক 'বিক্রমোর্ব্বশী অনুবাদ [২] ক্ষেত্র গোঁসাই ও যদুপাল কর্তৃক প্রথম দিশি orchestra গঠন।

চতুর্দ্দশ দৃশ্যে—কাব্য-রচনায় প্রথম সিদ্ধি—'তিলোত্তমা', 'শর্মিষ্ঠা'।

পঞ্চদশ দৃশ্যে—স্থান—৬ নং লোয়ার চিৎপুরের বাসা। কাল ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাস। শর্মিষ্ঠা, পদ্মাবতী, একেই কি বলে সভ্যতা, বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ, তিলোত্তমা লেখা শেষ হইয়াছে। ব্রজাঙ্গনা কাব্য, কৃষ্ণকুমারী নাটক, মেঘনাদ বধ' তিনখানা একসঙ্গে শুরু করা হইয়াছে। পণ্ডিতদের সাহায্যে একসঙ্গে তিনখানা গ্রন্থ রচনা করা অন্যতম মুখ্য ঘটনা। অভাবের তাড়না লাগিয়াই আছে– সঙ্গে বাড়ীওয়ালার তাগাদা।

ষোড়শ দৃশ্যে—বিদ্যাসাগরের বাসা। বাড়ী বিক্রয় করিয়া এবং বিদ্যা-সাগরের নিকট হইতে টাকা ধার করিয়া ব্যারিষ্টার হইবার জন্য বিলাত যাইবার উদ্যোগ এই দৃশ্যের মুখ্য ঘটনা। নিম্নলিখিত তথ্যও পরিবেষিত হইয়াছে: [ক] বীরাঙ্গনা কাব্যখানি বিদ্যাসাগরকে উৎসর্গ করা। [খ] মধুসূদনের হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকার সম্পাদনা ও সম্পাদনা ত্যাগ [গ] গিরিশ হরিশের স্মৃতিচিহ্ন হিন্দু পেট্রিয়ট [ঘ] নীলদর্পণের অনুবাদ করায় ওপর-ওয়ালার গুঁতো খাওয়া—লং সাহেবের কীর্ত্তি [চ] কালীপ্রসন্নের লং সাহেবের হাজার টাকা জরিমানা ঝনাৎ করিয়া ফেলিয়া দেওয়া—মহাভারতের অনুবাদ (ছ)মহাভারত অনুবাদে বিদ্যাসাগরের প্রেরণা ও সহায়তা—মেরি কারপেণ্টারের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের উত্তরপাড়ায় যাওয়া (ঝ) Hudson কর্তৃক বিদ্যাসাগরের মূর্ত্তি অঙ্কন (ঞ) বিদ্যোৎসাহিনী সভার অভিনন্দন ও রূপোর মদের গেলাস

উপহার দেওয়া (ট) চীনাবাজারের জনৈক দোকানদারের 'মেঘনাদবধ' পাঠের ঘটনা (ঠ) জগদ্বন্ধু ভদ্র লিখিত—"ছুছুন্দরী বধ" কাব্য। (ড) ভূদেবের ফরমাসে—ব্রজাঙ্গনা রচনা (ঢ) বিদ্যাসাগরের সঙ্গে টেক্কা দিয়া তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী আর মাধব ধরের ট্রেনিং স্কুল খোলা (ণ) হীরাবুলবুল বলিয়া এক বেশ্যার ছেলেকে হিন্দু কলেজে ভর্ত্তি করা লইয়া কাণ্ড—রাজেন দত্ত কর্ত্তৃক সিন্দুরে পটিতে কলেজ স্থাপন—(**পঞ্চম বিরতি**)

এই দৃশ্যে—বিদ্যাসাগরের চরিত্র দেখানোর দিকে বিশেষ ঝোঁক দেখা যায়। এতখানি ঝোঁক অনাবশ্যক। তথ্য পরিবেষণের ঝোঁকটাই বেশী।

সপ্তদশ দৃশ্যে—উপস্থাপ্য বিষয়—ভার্সাই সহরের একটি দৃশ্যে, মধুসূদন মনোমোহন ঘোষের আলাপে ইউরোপ প্রবাসী মধুসূদনের দুরবস্থা, অভাবের অসহ্য তাড়না · সনেট রচনার সংবাদ—বিদ্যাসাগরের অর্থ সাহায্য—(**ষষ্ঠ বিরতি**)

অষ্টাদশ দৃশ্য—কলিকাতার স্পেনসস্ হোটেল। ব্যারিষ্টার মধুসূদন—সর্ব্বোপরি বন্ধুবৎসল ও উদারচেতা মধুসূদনের রূপ উপস্থাপিত। ব্যক্তিগত ও অন্যান্য তথ্য :—(ক) মধু…বিদ্যাসাগর সংবাদ—(খ) ভূদেবের নিমন্ত্রণ (গ) বিলের উৎপাত (ঘ) দ্বারকার হাইকোটের জষ্টিস হওয়া (ঘ) জ্যাকসন সাহেবের সঙ্গে ঝগড়া (ঙ) লিভারে ব্যথা (চ) বিনা পয়সায় সখীসংবাদ গায়ক ব্রাহ্মণের মোকদ্দমা পরিচালনা করা (ছ) পাঠশালার পণ্ডিতের প্রতি মধুর শ্রদ্ধা ভক্তি (জ) লণ্ডনে বই বাঁধা দেওয়ার সংবাদ (ঝ) মনোমোহনের মক্কেলের মোকদ্দমায় 'ফি' গ্রহণে আপত্তি (ঞ) সিংহল বিজয় রচনার আরম্ভ। (ট) নিজের মুনসির সঙ্গে এক সঙ্গে মদ্যপান (ঠ) মাসিক ভাড়া ৪০০৲ টাকায় লাউডন ষ্ট্রীটে বাসা ভাড়া করা।

ঊনবিংশ দৃশ্য—ভূদেব গৌরদাসের আলাপের সাহায্যে মধুসূদনের অবস্থা জ্ঞাপন করা হইয়াছে। (ক) তথ্য আর্থিক শারীরিক মানসিক সব দিক দিয়াই মধুর অবস্থা শোচনীয়। (খ) ঋণের দায়ে পঞ্চকোট রাজার ম্যানেজারি করিতে যাওয়া—কিছুদিন পরেই চাকরী ছাড়িয়া দেওয়া (গ) ঋণে জর্জ্জরিত হইয়া অসুখে

ভোগা (ঘ) বেনেপুকুর রোডে অবস্থান—বাড়ী ভাড়া অনেক বাকি (ঙ) উত্তরপাড়ায় জয় কেষ্টর মুখুজ্যের লাইব্রেরীতে লইয়া যাওয়ার উদ্যোগ।

বিংশ দৃশ্য—মধুসূদনের শেষ জীবনের দুঃখ—দুর্ভোগ। পাওনাদারদের গালাগালি—নির্জ্জলা ব্রাণ্ডি পান—অবিরাম অন্তর্দাহ এবং শেষ আঘাত অনুগ্রহের নিগ্রহ :—উত্তরপাড়ার রাজা জয়কেষ্টর আমন্ত্রণ—গোবর্দ্ধনের অনুগ্রহ। তথ্য :—(ক) রেভারেণ্ড গোপাল মিত্তিরের গ্রীক বইখানা হারানো (খ) নিজের স্মৃতিস্তম্ভের লেখ্য কবিতাকারে লেখা।

শেষ দৃশ্য—১৮৭৩ খৃঃ অঃ ২৯শে জুন রবিবার, বহরমপুরে বঙ্কিমচন্দ্রের কক্ষ। বঙ্কিমচন্দ্রের আবেশ—পটে মধুসূদনের মৃত্যু সংবাদ প্রতিফলিত করা হইয়াছে; মৃত্যুর পরোক্ষ উপস্থাপনা—বঙ্কিমচন্দ্রের দিবাস্বপ্নের সাহায্যে। দৃশ্যটি সাংকেতিকতাময়। মধুসূদনের যুগের পর বঙ্কিমযুগের আরম্ভ এবং মধুসূদনের কীর্ত্তি অমর এই দুইটি বিষয় সুন্দরভাবে সংকেতিত হইয়াছে। স্বভাবো অতিরিচ্যতে—মনস্তত্ত্বরসিক বনফুল দিবাস্বপ্নের সাহায্য লইয়াছেন। তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে বটে কিন্তু উপস্থাপনার বাস্তবতাও খানিকটা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে নাটকখানি চরিত নাটক অর্থাৎ শ্রীমধুসূদন ব্যক্তিটির নানা ঘটনা উপস্থাপিত করা তথা ব্যক্তিত্বের নানা দিক এবং সমগ্র তাৎপর্য্য রূপ দেওয়া এই নাটকের উদ্দেশ্য।

'দৃশ্য পরিকল্পনার সমালোচনা'

প্রথম দৃশ্য—সম্পর্কে বক্তব্য এই যে (ক) দৃশ্যটিতে মধুসূদনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সুন্দরভাবে ব্যক্ত হইয়াছে এবং নাটকের 'কার্য্য'ও (action) সূচিত হইয়াছে, কিন্তু ঘটনা-সমাবেশ খুব অনবদ্য হইয়াছে, কয়েকটি কারণে সে কথা বলা যায় না। (ক) মধুসূদন—"কলেজ হইতে ফিরিয়া পোষাক ছাড়িতেছেন"—এই ঘটনা এবং গৌর-বঙ্কু-ভোলানাথের আগমন, দুইয়ের

মধ্যে যেটুকু সময়ের ব্যবধান প্রত্যাশিত তাহা নাই। "এক্ষুনি আসবে তারা"—বলিয়া নাট্যকার সতর্ক হইয়াছেন বটে, কিন্তু ভুলিলে চলিবে না—গৌর-বন্ধু-ভোলানাথ কলেজেরই বন্ধু। কলেজ হইতে আসিলেই এক সঙ্গে আসার কথা, বাড়ী হইতে আসিলে—"এখুনি আসবে" কি করিয়া? (খ)—মধুর সহিত জাহ্নবীর সংলাপে—মধুসূদনের বাল্য-কালীন ঘটনা বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্যই বেশী প্রকটিত হইয়াছে। (গ) যিনি জুতার ফিতায় হাত দেন না, তিনি নিজে মদের বোতল ও গেলাস তুলিবেন কি? (ঘ) যে প্রয়োজনে মধুকে দিয়া মদের বোতল ও গেলাস তোলানো হইয়াছে, সেই প্রয়োজন সম্পন্ধে বক্তব্য এই যে খাইতে যাইবার ঠিক মুখেই রাজনারায়ণ মধুর সহিত বিবাহ-সম্পর্কে কথা বলিবেন—ইহা স্বাভাবিক নহে॥

চতুর্থ দৃশ্য—পরিকল্পনা সম্পর্কে বক্তব্য এই যে—জাহ্নবীর অশান্ত মানসিক অবস্থায়—"গুপ্ত কবির গান"—যোজনা অনুচিত হইয়াছে। গান বাদ দিলে দৃশ্যটি ছোট হয় বটে, কিন্তু নাট্যকারের মান বাড়ে বলিয়া মনে হয়।

ষষ্ঠ দৃশ্য—পরিকল্পনা সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে কয়েকটি কথা চরিত্র-পরিপন্থী হইয়াছে; যেমন জাহ্নবীর—"ঠিকই বলছি—তোমার মনের কথা আমি বুঝতে পারি"—রাজনারায়ণ চরিত্রের পরিপন্থী হইয়াছে। রাজনারায়ণের—"অবাধ্য ছেলেকে বাড়ীতে স্থান দিতে পারব না"—ও আপত্তিকর।

সপ্তম দৃশ্যের—গোড়ার দিকটা নাটকের পক্ষে অপ্রয়োজনীয়। দৃশ্যটিকে সংক্ষিপ্ত করিলে অভিনয়-কালের মাত্রা একটু কমিতে পারে।

দশম দৃশ্যের শেষাংশ খুবই উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। হেনরিয়েটার ব্যাগ ভুলিয়া যাওয়া, মায়ের মৃত্যু সংবাদ শুনিবার পরে হেনরিয়েটার উপস্থিতি মধুসূদনের উক্তি—Henrieta, I have lost my mo'her সাংকেতিকতায় পরিপূর্ণ। হেনরিয়েটা একধারে জায়া ও জননীর অভাব পূর্ণ করিবে—ইহাই সংকেতিত।

একাদশ দৃশ্য সম্পর্কে বক্তব্য এই—রাজনারায়ণ মধুসূদনের চিঠি না

পাওয়ায়, দুইবছর পরে হঠাৎ একদিন উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছেন—ইহা স্বাভাবিক ঘটনা নহে। 'দু'বছর চিঠি লেখেনি কাউকে—অথচ তিনিও কোন খোঁজ খবর করেন নাই, ইহা হইতে পারে না। এই হঠাৎ উদ্বেগ রাজনারায়ণের আবেগকে একটু খেলো করিয়া দিয়াছে। তবু রসোজ্জ্বলতার দিক দিয়া দৃশ্যটি খুবই চিত্তাকর্ষক।

দ্বাদশ দৃশ্যে—সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে হেনারিয়েটা ও মধুসূদনের আলাপ-আলোচনা দিয়া দৃশ্যটি আরম্ভ করিলে এবং কথার মধ্যদিয়া কালের গতি সংকেতিত করিতে পারিলে, কলিকাতা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন এবং পিতার মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ এই দুই ঘটনার মধ্যে যে কাল-ব্যবধান প্রত্যাশিত তাহা পাওয়া যাইতে পারে। 'বিরতি'র পরে থাকিলেও মনে হয়—মাতার মৃত্যুর পরে পিতার মৃত্যু অব্যবহিত ভাবেই ঘটিতেছে

ষোড়শ দৃশ্য নাটকের কোনরূপ প্রতি না করিয়াও দৃশ্যটিকে সংক্ষিপ্ত করা সম্ভব এবং করা উচিত। বিদ্যাসাগরের প্রতি ভক্তি থাকায়—কথার পিঠে কথা বাড়িয়া গিয়াছে।

সপ্তদশ দৃশ্য সম্পর্কে বক্তব্য এই যে—ষোড়শের পরেই সপ্তদশ অপ্রত্যাশিত ক্ষিপ্রগতিতে আসিয়াছে। ঘটনা যেন ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়াছে। লণ্ডনের একটি দৃশ্য অপেক্ষিত বলিয়া মনে হয়। অগত্যা এই দৃশ্যের গোড়াতেই লণ্ডন-জীবনের পরোক্ষ অবতারণা করা উচিত ছিল। একটি দৃশ্যে ইউরোপ-প্রবাসের (৫ বৎসর ব্যাপী) জীবন দেখাইতে গেলে, দৃশ্যটিকে একটু দীর্ঘ করা বাঞ্ছনীয়।

বিংশ দৃশ্যেই নাট্যকার মধুসূদনের ট্র্যাজেডির চূড়ান্ত রূপটি ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং এখানেই নাটকের প্রকৃত উপসংহার করিয়াছেন। 'জননীর কোলে শিশু লভয়ে যেমতি বিরাম—' বলিয়া 'শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া চেয়ারে এলাইয়া'—পড়া মৃত্যুরই সংকেত বহন করিয়াছে।

শেষ দৃশ্যটি সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে (ক) দৃশ্যটিতে নাট্যকারের মনস্তত্ত্ব-

রসিকতার ঝোঁকটি বেশী প্রকাশ পাইয়াছে (খ) বঙ্কিমচন্দ্রের দিবাস্বপ্নের আবেশ-পটে মৃত্যু-সংবাদ প্রতিফলিত করিবার মধ্যে যতই নূতনত্ব বা কৌশল ফুটিয়া উঠুক, বঙ্কিমচন্দ্রের দিবাস্বপ্ন দেখিবার হেতু না থাকায় এবং মধুসূদন সশরীরে উপস্থিত হওয়ায়, ব্যাপারটি আপাতদৃষ্টিতে ভৌতিক ব্যাপার বলিয়া মনে হইতে পারে। এই জাতীয় রীতি, উপস্থাপনার বাস্তবিকতার গুরুত্ব কমাইয়া দেয় এবং তাহা দেয় বলিয়াই প্রশংসনীয় নহে। তবে দৃশ্যটির সাংকেতিকতা প্রশংসনীয়। মধুসূদনের যুগের পরে বঙ্কিম-যুগের আবির্ভাব এই কথাটি যেমন সংকেতিত হইয়াছে, তেমনি ঘোষিত হইয়াছে—"মধুসূদন মরেনি"—মরতে পারে না—"অসম্ভব"—এই বক্তব্যটি। এ সব সত্ত্বেও দৃশ্যটির অবাস্তবতা অমার্জ্জনীয়।

[রস—বিচার]

জাতি-পরিচয় নির্দ্ধারণ করিবার কালে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে "শ্রীমধুসূদন" ট্র্যাজেডি-রসাত্মক একখানি চরিত-নাটক, অর্থাৎ নাটকখানির "অঙ্গী"-রস **বিশেষ জাতীয় করুণ রস**—আমাদের নূতন পরিভাষা অনুসারে—'**ট্র্যাজেডি-রস**'। সুতরাং রসবিচারে আমাদের প্রথম ও প্রধান কার্য্য—ট্র্যাজেডি-রসের নিষ্পত্তি বা অভিব্যক্তি যথেষ্টমাত্রায় হইয়াছে কি না এই প্রশ্নের আলোচনা করা। এই আলোচনা করিতে গেলে, যেহেতু রসনিষ্পত্তির জন্য উপযুক্ত বিভাব-অনুভাব-সঞ্চারী ভাবের সংযোগ আবশ্যক এবং সংযোগের সৌষ্ঠবের উপর রসের প্রকৃতি নির্ভর করে, বিভাব-অনুভাবাদির প্রকৃতির এবং সংযোগেরই বিচার করিতে হইবে। প্রকৃতপক্ষে এই বিচার ট্র্যাজেডির আলম্বন-বিভাব অর্থাৎ নায়ক হিসাবে শ্রীমধুসূদনের ব্যক্তিগত যোগ্যতা 'আছে কি না, তাঁহার আচরণ ও অবস্থা জীবনের সংগ্রাম ও পরিণতি ট্র্যাজেডি-সংবিদ (tragic impression) জাগাইতে সমর্থ কি না —এই সব প্রশ্নেরই মীমাংসা।

ব্যক্তিগত যোগ্যতার হিসাব লইতে গেলে দেখা যায়—শ্রীমধুসূদন বিশিষ্ট ধনী ও মানী রাজনারায়ণ দত্তের পুত্র—ঐশ্বর্য্যের কোলে লালিত-পালিত রাজার দুলাল, হিন্দু কলেজের সেরা ছাত্র—মস্তিষ্কের ও হৃদয়ের অশেষ গুণে গুণী—দুর্লভ ক'বি-প্রতিভাব অধিকারী। শুধু বংশেই অভিজাত নহে, গুণেও। আসলে মধুসূদন এমন একজন লোক যিনি ধনে-মানে-গুণে বিশেষভাবে চিত্তাকর্ষক—প্রতিষ্ঠা সম্পন্ন' বিশেষতঃ শ্রীমধুসূদন বাঙালী হৃদয়ের অনেকখানি স্থান জুড়িয়া আছেন।

তবে মধুর সবটুকুই যে মধুময়—মধু যে 'too good' তাহা নহে। মধুর মধ্যে 'নিম'ও কিছু মিশ্রিত আছে। মধু বড় প্রবৃত্তি-প্রবল, অমিতচারী; অনাচারী বলিলেও অত্যুক্তি হয়না। মধুর সবই একটু অমিত। জ্ঞান অনুভব—ইচ্ছা, তাঁহার ব্যক্তিত্বে সব বৃত্তিরই যেন অমিত স্ফূর্ত্তি। জ্ঞানস্পৃহা অমিত, হৃদয়ের স্পর্শকাতরতা বা আবেগপ্রবণতা এবং ভাবালুতা অমিত, ইচ্ছার (will) একাগ্রতা ও দৃঢ়তাও অমিত। আত্মপ্রতিষ্ঠার কামনা-অভ্রভেদী উচ্চাশা হইয়া উদ্দাম গতিতে উচ্ছ্বসিত, ভোগবাসনা সহস্রবাহুতে চেষ্টিত—সর্ব্বভুকের সহস্রজিহ্বায় লেলিহান। বৃত্তির সামঞ্জস্যনাই। মধুসূদনের মধুর ব্যক্তিত্বের গোড়াতেই এই মারাত্মক গলদ এবং সেই গলদ এখানেই **অমিত বাসনার** মধ্যেই। মধুসূদন অতিশয় 'self-willed', বড় স্বেচ্ছাচারী বড় অমিতাচারী। তাঁহার জীবনে যত দুঃখ দুর্ভোগ আসিয়াছে, যে শোচনীয় পরিণতি ঘটিয়াছে···সকলেরই মূলে আছে এই প্রবৃত্তি-প্রবল অসমঞ্জস অহং (ego).

অমিত-ভোগী মধুসূদন উচ্চাকাঙ্খার প্ররোচনায় এমন একটি কাজ করিয়া বসেন যাহা তাঁহার সমস্ত স্বস্তির মূলে কুঠারাঘাত করে—যাহাকে আমরা ভুল পদক্ষেপ বা বিচার error of judgment বলিয়া মনে করিতে পারি। খ্রীষ্টধর্মে—দীক্ষাই ভুল পদক্ষেপ। জগৎ-জোড়া কবি-খ্যাতি এবং মনোমত, দেহে-মনে-সুন্দরী পত্নী লাভ করিবার লোভে মধুসূদন খ্রীষ্ট-ধর্মের অপ্রিয়

সাগরে ঝাঁপ দেন কিন্তু 'সকলই গরল ভেল'। যে যে উচ্চাকাঙ্ক্ষার পরিপূরণ কল্পনা করিয়া মধুসূদন খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেন, নিজের চরিত্রদোষে এবং অনেকটা খ্রীষ্টান পাদ্রীদের এবং রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহনের বিরূপ আচরণে প্রতিশ্রুতিভঙ্গে, তাহার কোনটিরই পূরণ হয় না। এই আশা-বিপর্য্যয়ের বেদনা বিক্ষোভের মধ্যেই মধুসূদনের জীবনের ট্র্যাজেডীর প্রারম্ভ।

মধুসূদন আশার ছলনায়, অতুল ঐশ্বর্য্যের সমস্ত উপচার দূরে ঠেলিয়া দিয়া, পিতামাতার স্নেহ-শীতল আদর অলিঙ্গন উপেক্ষা করিয়া, অভাব-তপ্ত, সংগ্রাম-বন্ধুর এবং অনাত্মীয়-নিঃসঙ্গ মরুপথের পথিক হন। একূল ছাড়েন কিন্তু ওকূলে পৌঁছিতে পারেন না—অকূলে ভাসিয়া বেড়ানই সার হয়। কিন্তু একূল ছাড়িলেও একূলের মায়া তো কাটাইতে পারেন না—মায়ের স্মৃতি বার বার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায়—ব্যথা হইয়া বাজে, বিসর্জ্জনের বাজনা শুনিয়া চোখে জল আসে, রাত্রে ঘুম নাই—মনে শান্তি নাই। এপারে ফিরিয়া আসিবেন সে উপায়ও নাই—স্বভাব বিবাদী। শুধু আশাই যে বিপর্য্যস্ত তাহা নহে, মধুসূদন অন্তর্দাহেও দগ্ধ হইতে থাকেন। প্রথম দৃশ্য হইতে নবম দৃশ্য পর্য্যন্ত, নাট্যকার মধুসূদনের প্রকৃতি গতি ও পরিণতির রূপকে এই অবধিই প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। প্রথম দৃশ্যে মধুসূদনের চারিত্রিক প্রবণতাগুলি এবং দৃশ্যের শেষাংশে ভুল পদক্ষেপের সূচনা প্রদর্শন করিয়াছেন। দ্বিতীয় দৃশ্যে ভুল পথে পদক্ষেপ—মধুর গৃহত্যাগ। তৃতীয় ও চতুর্থ দৃশ্যেও দুর্বার গতিতে এগিয়ে যাওয়া, দেখানো হইয়াছে। পঞ্চম দৃশ্যে বাহ্য গতিবেগ ঠিকই আছে, কিন্তু এখানেই অন্তর্দাহের প্রথম আভাস পাওয়া যায়। গৌর মায়ের কথা বলিতেই মধু বলেন—Do you know she haunts me? ষষ্ঠ দৃশ্যে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত মধু প্রায়শ্চিত্ত করিতে—ভুল সংশোধন করিতে, মায়ের কোলে ফিরিয়া আসিতে অসম্মত—ভুল আঁকড়িয়া থাকিতেই প্রস্তুত। সপ্তম দৃশ্যে—ভুলের ফসল ফলিতে আরম্ভ করে। গৌরের কাছে মনের অবস্থা যাহা ব্যক্ত করেন তাহাতে দেখা যায় পাদ্রী 'rascals'দের বিরুদ্ধে দারুণ বিক্ষোভ, কারণ

বিলেত নিয়ে যাওয়া সম্বন্ধে—'They are very cold' বড় বড় পণ্ডিতদের সংস্পর্শে আসা ছাড়া খ্রীষ্টান হইয়া বিশেষ কোন লাভ হয় নাই, লাভের মধ্যে কোন শান্তি নেই—রাত্রে ঘুম হয় না। প্রায়শ্চিত্ত না করিয়া হিন্দু হওয়া সম্ভব হইলে হিন্দুধর্মে ফিরিয়া আসিতে প্রস্তুত কিন্তু তাহা তো আর সম্ভব নহে। মায়ের জন্য প্রাণ কাঁদে—গৌরকে অনুরোধ করেন, "তুই মাকে একটু দেখিস ভাই, বুঝিয়ে বলিস্, যাস মাঝে মাঝে, বুঝলি ?" অষ্টম দৃশ্যে—মায়ের ব্যথায় ব্যথিত মধুসূদনের ব্যথা-কাতর রূপটি এবং পিতার, ক্ষুব্ধ-বাৎসল্যের অভিমান-নিষ্ঠুর আঘাতে মর্মাহত মধুসূদনের অন্তর্দাহ অর্থাৎ sufferingএর রূপ প্রদর্শিত হইয়াছে। নবম দৃশ্যে—আশাভঙ্গ সম্পূর্ণ হইয়াছে। দেবকীকে 'Thoughtless and penniless young man'এর সহিত বিবাহ দিতে কৃষ্ণমোহন অসম্মত হইয়াছেন—মধুসূদন যে দুইটি আশায় খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করিয়াছেন, দুইটিই বিপর্য্যস্ত হইয়া গিয়াছে।

ইহার পরেই দশম দৃশ্যে মাদ্রাজপ্রবাসের জীবন—আশাহত মধুসূদনের শান্তিহীন শ্রান্তির জীবন। জীবিকার্জ্জনের জন্য কঠোর সংগ্রামের জীবন। 'tight corner'-এ আবদ্ধ অভাব-পীড়িত জীবন। এখানে মধুসূদনের ট্র্যাজেডির যে রূপটি ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে তাহা এই যে রাজনারায়ণ দত্তের পুত্র—রাজার দুলাল—স্বভাব-দোষে অভাবের তাড়নায় অস্থির। ঋণ করিয়া সংসার চালান। তবে অনুভাবের ক্রিয়া তেমন তীব্রভাবে দেখানো হয় নাই। আর একটা কথা। এই দৃশ্যেই মাতৃ-বিয়োগের আঘাত লাগিয়াছে, কিন্তু এই আঘাতকে ট্র্যাজেডি-রসোদ্দীপক করিয়া তুলিবার জন্য যে আয়োজন আবশ্যক তাহা করা হয় নাই। অতীত সুখস্মৃতির চর্ব্বনা দ্বারা অন্তর্দাহ দেখাইতে পারিলে মায়ের স্মৃতিকে সক্রিয় রাখিলে, ট্র্যাজেডি-রসের সংবেদনা বেশ জোরালো হইত।

একাদশ দৃশ্যে—মধুসূদন মাতৃবিয়োগ—কাতর হইয়া পিতার কাছে গিয়াছেন নিঃসঙ্গ পিতাকে সমবেদনা জানাইতে, নিজের কাছে লইয়া যাইতে

কিন্তু পিতার মুখের মর্মান্তিক আঘাত পাইয়া বেদনায় শুম্ভিত হইয়া গিয়াছেন। এখানে এই suffering-এর মধ্যেই ট্র্যাজেডির ধারা রক্ষা করা হইয়াছে।

দ্বাদশ দৃশ্যে—মধুসূদনের বুকে পিতৃবিয়োগের আঘাত বাজিয়াছে। কিন্তু এখানেও আঘাত নিছক আঘাত মাত্রই—ট্যাজেডি-সংবিদের পরিপোষক হয় নাই। রেবেকার কন্যা দ্বারা মধুসূদনের জীবনের নূতন ক্ষত ও দাহ দেখাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে বটে, কিন্তু পূর্বপ্রস্তুতির অভাবে চেষ্টা খুব সফল হয় নাই। ত্রয়োদশ দৃশ্য হইতে ষোড়শ দৃশ্য অবধি—মাদ্রাজ হইতে কলিকাতা আগমন (১৮৫৩) এবং ব্যারিষ্টার হইবার জন্য ইংলণ্ড গমন (১৮৬২) পর্য্যন্ত. মধুসূদনের কবি-সত্তার পূর্ণ প্রতিষ্ঠার কাল। এই পর্বে মূল রসের ধারা অক্ষুণ্ণ রাখা খুবই কঠিন কাজ। বাহিরের কীর্ত্তি-খ্যাতির সমান্তরালে, অন্তর্দ্বন্দ্ব, অন্তর্দাহ বা দুঃখ দুর্দ্দশার রূপ উপযুক্ত পরিমাণে উপস্থাপিত করিতে না পারিলে রসের ধারা স্তিমিত বা বিচ্ছিন্ন হইতে বাধ্য। চরিতের দিকে অধিকতর ঝোঁক পড়ায় রসের ধারাটি এখানে একটু স্তিমিত বা আচ্ছন্ন হইয়াছে। তাই বলিয়া নাট্যকার রস-সম্পর্কে যে সম্পূর্ণ উদাসীন রহিয়াছেন তাহা নহে। মধুসূদনের আর্থিক দুর্য্যোগের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চেষ্টা না করিয়াছেন এমন নহে। ত্রয়োদশ দৃশ্যে গৌরদাসের মুখে জানাইয়াছেন—আর সব খবর অভিশয় শোচনীয়। বাবা মারা গেছেন, বিষয়সম্পত্তি বেদখল, পকেটে একটি পয়সা নেই মাথা গোঁজবার জায়গা নেই"—একশো কুড়ি টাকার মাইনের কথা শুনিয়া মধুসূদন বলিয়াছেন—"It won't keep me in ডাল-ভাত even ;" এই পর্য্যন্তই। রসোদ্দীপক উদ্দীপন বিভাব বা অনুভাব কিছু নাই। তথ্য সমাবেশের সঙ্গে সঙ্গে মধুসূদনের পীড়িত অন্তরের রূপটি দেখানো উচিত ছিল। চতুর্দ্দশ দৃশ্য সম্পর্কেও একই কথা, রস হইতে 'বস্তু' অতি দূরবর্তী। পঞ্চদশ দৃশ্যে—"অর্থাভাব ছাড়া কোন অভাব নাই" দেখাইবার চেষ্টা আছে—পাওনাদারদের নির্বাক বা সবাক তাড়নাও অল্পস্বল্প দেখানো হইয়াছে, কিন্তু মুখ্য রস ব্যক্ত হইতে পারে নাই।

ষোড়শ দৃশ্যে—অভাবগ্রস্ত মধুসূদনের দৈন্য—"রাজকীয় necessity"—সাধ্যের বৈষম্য, আভাষিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তথ্য-পরিবেষণের প্রবণতাই প্রবল, রসধারা অতি ক্ষীণ—বিচ্ছিন্ন বলাও চলে।

সপ্তদশ দৃশ্যে—ভার্সাই শহরে মধুসূদনের অভাবের তাড়না চরমে পৌছিয়াছে। "চারদিকে কেবল ধার আর ধার শোধ করতে না পারলে ফ্রেঞ্চ জেল অনিবার্য্য। Gray's Inn হইতে 'সাস্‌পেণ্ডেড'। পাওনাদারের তাগাদায় অস্থির। কড়ানাড়ার শব্দে ভীতত্রস্ত অসহায় মধুসূদনের আত্মরক্ষার করুণ সংগ্রাম। মধুসূদনের দুর্দ্দশা সুন্দরভাবেই প্রকাশিত হইয়াছে। তবে কৈশোরের স্বপ্নবিভোর জীবনের সহিত বর্ত্তমান জীবনের বৈষম্যকে বেদনা-বিক্ষোভের বা ভাবনার মাধ্যমে প্রকাশ করিতে পারিলে রস-সংবেদনার মাত্রা আরো বৃদ্ধি পাইত।

অষ্টাদশ দৃশ্যে কলিকাতার স্পেন্‌সস্ হোটেলে ব্যারিষ্টার মধুসূদনের সুসজ্জিত ড্রইংরুম, এবং সঙ্গে সঙ্গে মধুসূদনের অমিতাচার এবং নিত্যসঙ্গী অভাব প্রদর্শিত হইয়াছে। পাওনাদারের তাগাদা এড়াইবার জন্য মধুসূদন পিছনের দরজা দিয়া বাহির হইয়া গিয়াছেন। এখানেও নাট্যকরের চরিত-চেতনা রস-চেতনা অপেক্ষা প্রবল।

উনবিংশ দৃশ্যে পরোক্ষভাবে ভূদেব-গৌরদাসের কথোপকথন দ্বারা অমিতাচারী মধুসূদনের "আর্থিক, শারীরিক, মানসিক," সব দিক দিয়ে শোচনীয় অবস্থা।" মধুসূদনের দেহ-মনের যন্ত্রণাকে terrible suffering-এর রূপটি ব্যক্ত করা হইয়াছে এবং পূর্ণমাত্রায়ই তাহা করা হইয়াছে। নাট্যকার উদ্দীপন-বিভাব পরিস্থিতি এবং অনুভাব সঞ্চারিভাবের সুন্দর সমাবেশ করিয়াছেন

১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসের—জেনারেল হাসপাতালে যাওয়ার দুইমাস আগের—ঘটনা। নানাবিধ ব্যাধিতে মধুসূদন আক্রান্ত। গলায় ঘা, পেটে জল পিলে-লিভার, সঙ্গে রক্তবমি। কত কথাই মধুসূদনের মনে হয়! অতীত স্মৃতি

চলচ্চিত্রের মত চোখের সম্মুখ দিয়া চলিয়া যায়। মনে পড়ে সাগরদাঁড়িকে, যে বটগাছটার তলায় বসিয়া ছেলে বেলায় রামায়ণ পড়িতেন সেই বটগাছটিকে, সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়—প্রাণবসে টলমল উহার সতেজ শ্যামল পাতাগুলি আর তাহারই সঙ্গে নিজের নিঃশেষিতপ্রায় শুকিয়ে—যাওয়া জীবনকে—মর্মভাঙ্গা আর্ত্তনাদ জাগে—সব ঠিক আছে—আমি ফুরিয়ে গেলাম। an end so quickly।" বিষাদবিধুর নির্বেদে মধুসূদন পরিপূর্ণ। আর ভাবিবেন না, যতই মনে করেন ভাবনার হাত এড়াইতে পারে না—This brain is a terrible machine !

মনে হয় সংগ্রাম তো জীবনে তিনি কম করেন নাই, বিলাত গিয়াছেন, ব্যারিষ্টার হইয়াছেন, হাইকোর্টে চাকরি লইয়াছেন, আবার ব্যারিষ্টারি করিয়াছেন, পঞ্চকোটে চাকরি লইয়া গিয়াছেন—আবার ব্যারিষ্টারি করিতেছেন। কিন্তু সব কেমন যেন গোলমাল হইয়া গিয়াছে। হেনরিয়েটার 'সব ঠিক হয়ে যাবে আবার'—সান্ত্বনা বাক্যে তাঁহার হাসি আসে ; তবু জীবনের হিসাব নিকাশ ফুরাইতে চাহে না। হেনরিয়েটার জন্য তাঁহার দুঃখ হয় কিন্তু নিজের দুঃখে কাঁদিবার অবসরটুকু পর্য্যন্ত তাঁহার ভাগ্যে নাই। বিল লইয়া পাওনাদারর‍া হানা দেয়=গালাগালি দেয়। অপমানে অপমানে মধুসূদন জর্জ্জরিত হন—উত্তেজিত হইয়া পাওনাদারদের সম্মুখে যাইতে চাহেন এবং তাহাদের বলিতে চাহেন—'এক কপর্দ্দকও আমার কাছে আর নেই—তোমরা যদি আমাকে মেরে ফেলতে চাও মেরে ফেল—অপমান আর করো না—আর সহ্য করতে পারি না আমি।"

অসহায় মধুসূদন, ব্যাধিজর্জরিত বেদনা-কাতর মধুসূদন দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বসিয়া থাকেন। যখন মুখ তুলেন অদ্ভুত সঞ্চারিভাব মুখে বিচিত্র হাসি করুণতম অসহায় হাসি আত্ম ধিক্কারের করুণ আর্ত্তনাদের হাস্যময় রূপ। সহসা ভাবান্তর ঘটে। মধুসূদন রুক্ষ হইয়া হইয়া উঠেন। ব্র্যাণ্ডির বোতল এবং দান্তের ইনফারনো (নরক) দিতে হেনরিয়েটাকে আদেশ করেন। হেনরিয়েটা

ভয়ে ভয়ে তাঁহর আদেশ পালন করেন এবং গহনা কাপড় আসবাবপত্র বিক্রয় করিয়া ঋণ শোধ করিতে অনুরোধ করেন অনুরোধ শুনিয়া মধুসূদন বিরক্ত মিনতি করিয়া হেনরিয়েটাকে চলিয়া যাইতে বলেন। মধুসূদন সোডার অভাবে নির্জ্জলা ব্রাণ্ডি পান করেন এবং ইনফার্নো খানা খুলিয়া উচ্চৈঃস্বরে পড়িতে থাকেন। নির্জ্জলা ব্রাণ্ডি এবং ইনফার্নো তাঁহার আর্থিক ও আত্মিক উভয় দৈন্যকেই সংকেতিত করে।

ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষের সহিত যে কথোপকথন তাহা আরো করুণ রসাত্মক। মনোমোহন প্রবেশ করিতেই মধু বলিয়া উঠেন—I hope you have not come to remind me of my debts! বিদ্যাসাগর, উমেশ আর স্বর্ণময়ীর ঋণ শোধ করিতে না পারায় তাঁহার লজ্জা ক্ষোভের অন্ত থাকে না। নির্জ্জলা ব্রাণ্ডি খাইয়াই যেন আত্মহত্যা করিতে চেষ্টা করিতেছেন। গলায় ছুরি বসাইয়া না মরিয়া ব্রাণ্ডি খাইতেছেন—জানেন "this is a process equally sure but less painful"। "সব ঠিক হয়ে যাবে"—সান্ত্বনা বাক্যের অর্থ বুঝিতে তাঁহার বাকী নাই। সে সব যে কত বড় nonsense তাহা তিনি জানেন। মরিতে তিনি চাহেন না—সুন্দর পৃথিবী ছাড়িয়া কোথাও যাইতে তিনি চাহেন না, কিন্তু যাইতে হইবেই—"The fact is there is no way out of it." দুর্বহ জীবনের ভাব বহিয়া, দশের কৃপাপাত্র হইয়া কোন রকমে টিকিয়া থাকার চেয়ে—অস্তিত্বকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দেওয়াই ভাল।

কাব্য, যশ, টাকা…সবই মরীচিকা মনে হয়। এই সমস্ত চাওয়ার পিছনে ছিল সুখে থাকিবার কামনা। নিজেই স্বীকার করেন—"আমি তো টাকা চাইনি আমি সুখে থাকতে চেয়েছিলাম।" কিন্তু কোথায় সে সুখ? "এ জীবনে তা আর হলো না—কেমন যেন গোলমাল হয়ে গেল।"

আঘাতের পর আঘাত—চরম আঘাত আসে অনুগ্রহের রূপ ধরিয়া সকলেই মধুসূদন দত্তকে অনুগ্রহ দেখাইতেছে! এই জ্বালাই আরো অসহ্য। উত্তরপাড়ার জয়কেষ্ট মুকুজ্যের সাদর আহ্বান বা অনুগ্রহ—তবুও যদিবা সহ্য

করা যায়—পাওনাদার গোবর্দ্ধনের অনুগ্রহের চেয়ে অসহ্য নিগ্রহ আর কি হইতে পারে? শেষ আর্ত্তনাদ শোনা যায়—Out, out brief candle"। মধুসূদনের মৃত্যু সম্পূর্ণ।

মধুসূদন—নিজের কবর নিজেই খুঁড়িয়াছেন—তাই স্মৃতিস্তম্ভের লেখাটুকুও নিজেই লিখিয়া রাখিয়াছেন—সেই লেখাটি আবৃত্তি করিতে করিতে চেয়ারে এলাইয়া পড়েন॥

বাকী শুধু মৃত্যু সংবাদ। শেষ দৃশ্যে শুধু সেই সংবাদটি জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে॥ যে ভদ্রলোক সংবাদ দিয়াছেন—তাঁহার কথা বর্ণে বর্ণে সত্য এবং আমাদেরও কথা—**অত বড় একজন কবি—কি কষ্টেই যে মারা গেছেন, শুনলে চোখের জল রাখা যায় না।** এই দৃশ্যটিতে নাটকের এবং রসেরও উপসংহার ঘটিয়াছে। কিন্তু যে ভাবের "নির্ব্বহনেঽদ্ভুতম্—থাকিলে চমৎকারিত্ব বৃদ্ধি পায় সেইরূপ চমৎকারিত্ব এখানে নাই। বিংশ দৃশ্যে রসের যে অভিব্যক্তি ঘটিয়াছে, তাহার তীব্রতা এখানে কমিয়াছে বই বাড়ে নাই॥ যাহা হউক, রসের অভিব্যক্তি সমধারায় না হইলেও অর্থাৎ দুই একটি দৃশ্যে ধারা স্তিমিত বা আচ্ছন্ন হইয়া পড়িলেও সাকল্যে যে ট্র্যাজেডিরস নিষ্পন্ন হইয়াছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই॥

অন্যান্য রসের মধ্যে—উল্লেখযোগ্য জাহ্নবী ও রাজনারায়ণের বাৎসল্য, হেনরিয়েটার পতিভক্তি, বিদ্যাসাগরের মহত্ত্ব বা দানবীরত্ব এবং জ্ঞানেন্দ্রমোহন—আশ্রয়ী কৌতুকরস ও বঙ্কুবিহারী প্রভৃতি—আশ্রয়ী হাস্যরস। জাহ্নবীর বাৎসল্য অভিমানহীন সহজ ও কোমল। তাঁহার কাছে সব কিছুর উর্দ্ধে পুত্রের মঙ্গল। পুত্র-বিচ্ছেদের আঘাতে, মায়ের প্রাণ বিদীর্ণ হইয়া যায়—এক মাত্র—সন্তান জননীর আকুল আগ্রহে সন্তানকে বুকের মধ্যে পুরিয়া রাখিতে চাহে। তাঁহার মধ্যে পুত্রের প্রতি অভিমান নাই, ভৎ‍র্সনা নাই, রুক্ষ আচরণ নাই, শুধু আছে বুকভরা স্নেহ আর আঘাতের বেদনায় তিলে তিলে ক্ষয়। রাজনারায়ণ পিতা—পুরুষের মত পুরুষ—অভিমানী পুরুষ। তাঁহার

স্নেহ বাধা পাইয়া অভিমানে ফুলিয়া উঠিয়াছে। বঞ্চনার আঘাতকে বুক পাতিয়া গ্রহণ করে নাই, যত আহত হইয়াছে তত নিষ্ঠুরের মত আঘাত করিয়াছে। রাজনারায়ণ চরিত্রে, অভিমানের পাত্রে স্নেহ পরিবেষণ করা হইয়াছে এবং করুণবাৎসল্যের সুন্দর আলম্বন সৃষ্টি করা হইয়াছে। বাৎসল্যের বিগলিত রূপটি দেখা যায়—জাহ্নবী চরিত্রে আর এখানে দেখা যায়—অভিমান-রুক্ষ, শুষ্ক বাৎসল্যের করুণ রূপটি। **অষ্টম দৃশ্যে ও একাদশ দৃশ্যে** এই রূপটিই সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। অভিমান ও বাৎসল্যের দ্বন্দ্বে রাজনারায়ণ ক্ষতবিক্ষত হইয়াছেন। (মধুসূদনেরও সমান অবস্থা)। [অষ্টম দৃশ্যের শেষাংশ—৬৮-৭০ পৃষ্ঠা, এবং একাদশের শেষাংশ—৯৪-৯৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য] **হেনরিয়েটার** মধ্যে সেই সর্বংসহা একানুব্রতা সতী সাধ্বী পতি-পরায়ণা নারীর সনাতন মূর্তি প্রকাশিত। রেবেকা-চরিত্রে ইহারই বিপরীত কোটি প্রদর্শিত। হেনরিয়াটা স্বামীর সুখে সুখী, স্বামীর দুঃখে দুঃখী—স্বামীর মধ্যে নিজেকে বিলীন করিয়া দিয়া সে চরিতার্থ।

নাটকে লঘু রস অর্থাৎ হাস্যরস সৃষ্টির চেষ্টা করা হইয়াছে মোটামুটিভাবে মধুসূদনের বন্ধুবান্ধবদের রহস্যালাপের দ্বারা। গৌরদাস বসাকের পিতা রাজকৃষ্ণ বসাক চরিত্রের উগ্র হিন্দুসংস্কার এবং সংলাপ দ্বারা, কিছুটা যতীন্দ্র মোহন ঠাকুরের নাট্যবাক্তিক দ্বারা (খ) জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুরের কমলমণি এবং দেবকীর সহিত কৌতুকালাপের দ্বারা। প্রথম দৃশ্যে—গৌরদাসের বচন, বিশেষতঃ বঙ্কুবিহারীর বচন, বাচন ভঙ্গী এবং আচরণ বেশ হাস্যোদ্দীপক। বৈষ্ণবের ছেলে গৌরদাসের রোজ রোজ মাংস খাওয়া সত্ত্বেও জাত বাঁচাইবার মৌখিক প্রচেষ্টা এবং বঙ্কুবিহারীর—কথাবার্তার ফাঁকে ফাঁকে "With your permission মধু" বলিয়া গ্লাসের পর গ্লাস খালি করা এবং মদ খাওয়ার ব্যাপারে দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়,—সহাস্যে Dont fear—I am Banku Bihari দু'এক গ্লাসে আমার কিছু হয় না—বলা, চমৎকার উদ্দীপক। দ্বিতীয় দৃশ্যে—বৈষ্ণব রাজকৃষ্ণ বসাকের—পাদ্রী আক্রোশ এবং ব্রাহ্ম-বিরাগ—এক কথায়

হিন্দুধর্ম্মকে তথা জাত বাঁচাইবার জন্য চেষ্টা—বাচনিক প্রতিরোধ—রক্ষণ-শীলতার নিদর্শন বলিয়াই; হাস্যকর হইয়াছে। তৃতীয় দৃশ্যে—বঙ্কু, ভোলানাথ হাস্যরসের অবলম্বন হইয়াছে। বঙ্কুই অবশ্য প্রধান। মদ মাংস-নিষ্ঠায় চরিত্রটির মজ্জা গঠিত। চাল-চলনেও বচনে বঙ্কু বেশ রাশভারী। বঙ্কু যত গম্ভীর তত হাস্যোদ্দীক।

সপ্তম দৃশ্যে—জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুরের শিক্ষিত-পটু শ্লিষ্ট এবং কৌতুককর-বচন, পরিহাসরসের চমৎকার উদ্দীপক। নবম দৃশ্যেও জ্ঞানেন্দ্রমোহন রসিক প্রকৃতিতেই প্রকাশিত। দশম দৃশ্যে—মধুসূদন এবং নটবর ঘোষের উক্তির প্রত্যুত্তরে মধুসূদনের উক্তি হাস্যোদ্দীপক হইয়াছে। একটি দৃষ্টান্ত :—নটবরের —"মিষ্টার দত্ত বাড়িতেই আছেন দেখছি।"—এই কথার উত্তরে মধুসূদন হাসিয়া বলিয়াছেন—"Cant help it"—মধুসূদন না হাসিলেও—উক্ত পরিস্থিতিতে—Cant help it শুনিয়া সকলেই হাসিবেন।

ত্রয়োদশ দৃশ্যে—যতীন্দ্রমোহনের কয়েকটি উক্তি—বিশেষতঃ Fixity of purpose (নাট্য-বাতিক ?) এবং তাহাতে বার বার বাধা হাস্যোদ্দীপক হইয়াছে এবং পঞ্চদশ দৃশ্যের শেষাংশে—পণ্ডিতদের আচরণে সামান্য একটু আভাস আছে। অষ্টাদশ দৃশ্যে—নিম্নলিখিত অংশটুকু উল্লেখ যোগ্য। [গৌরদাস। মদটা একটু কমানো দরকার এবার, লিভারে ব্যথা হয়েছে।

মধু। (স্মিত মুখে এক চুমুক পান করিয়া) হরিশ মরেই গেল!

ভোলানাথ। হরিশের যে মাত্রাজ্ঞান ছিল না।

মধু। (বেশ বড়গোছের একটা চুমুক দিয়া) হ্যাঁ মাত্রাজ্ঞান থাকাটা দরকার—বিশেষতঃ গৌরের—দ্বিতীয় পক্ষে বিয়ে করেছে, কচি বউ।] কথা ও কাজের অসঙ্গতি দ্বারা চমৎকার হাস্যরস সৃষ্টি করা হইয়াছে।

চরিত্র সমালোচনা

শ্রীমধুসূদন নাটকের পাত্র-পাত্রীর সংখ্যা—বহু॥ পুরুষের সংখ্যা—ছোট বড় মিলাইয়া—চৌত্রিশ এবং স্ত্রীলোকের সংখ্যা—এগার—মোট (৩৭+৮)= পঁয়তাল্লিশ। এই হিসাব দাখিল করায় কেহ যেন মনে না করেন যে অধিক সংখ্যক পাত্র-পাত্রী উপস্থাপিত করাতেই চরিত্র স্রষ্টার বড় কৃতিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে ইহাই আমি বলিতে চাই। স্রষ্টার কৃতিত্ব—ব্যক্তির মধ্যে ব্যক্তিত্ব আরোপ করায়। এই আরোপের মাত্রার উপরেই ব্যক্তির আকর্ষণ—শক্তি বা প্রাণবত্তা নির্ভর করে, অর্থাৎ ব্যক্তি যে পরিমাণে ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়, সেই পরিমাণে উহা দর্শকের চিত্ত আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয়—দর্শকের কৌতূহল জাগ্রত রাখিতে পারে॥ পুরুষ চরিত্রের মধ্যে প্রধান চরিত্র দুইটি— মধুসূদন এবং মধুসূদনের পিতা রাজনারায়ণ দত্ত। পারিপার্শ্বিক চরিত্রের মধ্যে মধুসূদনের সহপাঠিগণ, বিশেষতঃ গৌরদাস বসাক ও ভূদেব মুখোপাধ্যায় বঙ্কুবিহারী কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর ঈশ্বরচন্দ্র যতীন্দ্রমোহন, নটবর ঘোষ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। **গৌরদাস** চরিত্রের বড় বৈশিষ্ট্য,—বন্ধু বাৎসল্য॥ তাহা ছাড়া তাঁহার নিজের কোন ব্যক্তিত্ব ফুটিয়া উঠে নাই। **ভূদেব** ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য লইয়া যথাসম্ভব সুব্যক্ত। **বঙ্কুবিহারী** উপস্থিতির সঙ্গেই আপন ব্যক্তিত্ব সঞ্চারিত করিতে সমর্থ। (বঙ্কুবিহারীর চরিত্র বৈশিষ্ট্য আগেই আলোচিত হইয়াছে)। **কৃষ্ণমোহনের** চরিত্র খুব পরিস্ফুটরূপে অঙ্কিত হয় নাই; ভিতরকার মানুষটির তেমন কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। **জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর** রসিক চরিত্র, সুতরাং সহজেই চিত্তাকর্ষক হইয়া উঠিয়াছে। **ঈশ্বরচন্দ্রের** দয়ার সাগর এবং একাধারে করুণা-কোমল এবং সঙ্কল্প—দৃঢ় রূপটিকে রেখারূপের আকারে আঁকা হইয়াছে। **যতীন্দ্রমোহনের** ব্যক্তিত্ব, সুপরিস্ফুট না হইলেও অলক্ষ্য নহে—নাট্যগত

প্রাণ, সাহিত্য-রসিক যতীন্দ্রমোহন দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ। মাদ্রাজ প্রবাসী বাঙালী নটবর ঘোষ মহাশয়ের হাবভাবেও বৈশিষ্ট্য আছে। স্ত্রী চরিত্রের মধ্যে—জাহ্নবী ও হেনরিয়েটাই প্রধান; রেবেকা দেবকী প্রভৃতি অন্যান্য চরিত্র অপরিস্ফুট।—বিশেষতঃ রেবেকা ও দেবকী বেশ একটু উপেক্ষিতাই বটে।

প্রধান প্রধান চরিত্র সৃষ্টিতে নাট্যকার কতখানি দক্ষতা দেখাইতে সমর্থ হইয়াছেন—চরিত্রগুলি সম্যক বিশ্লেষণ না করিয়া তাহা পরিমাপ করা সম্ভব নহে। নায়ক-চরিত্র সম্পর্কে অনেক কথা আগেই বলা হইয়াছে। শ্রীমধুসূদনের চরিত্রে—প্রধান প্রধান প্রবণতা কি এবং সেই সকল প্রবণতার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে, কি ভাবে তাঁহার জীবন শোচনীয় পরিণতি লাভ করিয়াছে তাহা সবিস্তারে আলোচনা করা হইয়াছে। এখানে চরিত্রটিকে আরো একটু বিশ্লেষণ করা হইতেছে। নাট্যকার নাটকের প্রথম দৃশ্যেই মধুসূদনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সুন্দরভাবে উপস্থাপিত করিয়াছেন।—ক্রমানুসারে এবং তালিকাকারে সেইগুলি নিম্নলিখিতভাবে সাজাইয়া দেওয়া যাক।

১। আলালের ঘরের দুলাল—নিজের হাতে জুতোর ফিতেটা পর্যন্ত খোলেন না

২। মধুসূদন পোষাক-পরিচ্ছদ বিলাসী—

৩। বন্ধু-বৎসল [বন্ধুবান্ধবদের খাওয়ানোতে জিনিসপত্তর দেওয়ায় আনন্দ]

৪। ইংরেজের মেয়ে বিবাহ করিবার প্রবল বাসনা—(দেবকীও মনের মতো)

৫। ভারতীয় সংস্কৃতির ও বাংলা-ভাষার প্রতি অশ্রদ্ধা—[শ্রীরামচন্দ্র অতি অপদার্থ লোক]

৬। হিন্দু কলেজের সেরা ছেলে—('genius')

৭। ভীষণ একগুঁয়ে—("rebel")

৮। খুব মডার্ণ—[মা-বাপের জ্ঞাতসারেই তামাক ও মদ খান]

৯। কবি প্রতিভার অধিকারী [already a Pope]

১০। প্রবলতম উচ্চাকাঙ্ক্ষা—['মহাকবি হব'—]

১১। ইংলণ্ড যাওয়ার আকাঙ্ক্ষাও প্রবল

১২। মাতৃভক্ত—[I love my mother in my own way and no less]

১৩। অসহিষ্ণু।

পারিবারিক প্রশ্রয়ে মধুসূদনের স্বভাবে যে যে প্রবণতা প্রকাশ পায় তাহাদের মধ্যে—পরিচ্ছদ বিলাসিতা অন্যতম এবং এই **পোষাক-পরিচ্ছদ বিলাস**—মধুসূদনের শেষ অবধি ছিল। তিনটি চারিটি পোষাক লইয়া তিনি কলেজে যাইতেন এবং ঘণ্টায় ঘণ্টায় পোষাক বদলাইতেন। রাজনারায়ণ (৮ম দৃশ্যে) উচ্ছৃঙ্খলতার অভিযোগ তুলিলে মধুসূদনকে বলিতে দেখা যায়—"পোষাক-পরিচ্ছদ বিষয়ে হয়ত আমার একটু বাড়াবাড়ি আছে, I prefer to be clad like a gentleman. I spend a penmy too much perhaps on dress." অতি অভাবের মধ্যেও দামী পোষাকের অর্ডার দিতে তাহার কুণ্ঠা আসে নাই। বাড়ী ভাড়া বাকী, পণ্ডিতদের দেয় টাকা তিন মাস বাকী, তবু হেনরিটার জন্য সুদৃশ্য ও দামী গাউন বানাইতে ইতস্তত: করেন নাই। ব্যাধি জর্জ্জরিত অবস্থায় জীবনের হিসাব নিকাশ করিতে করিতে, শর্ম্মিষ্ঠার প্রসঙ্গ আসিতেই, সহসা তাহার মনে পড়ে—স্বর্ণময়ীরদেওয়া—দামী গাউনটার কথা—"মহারাণী স্বর্ণময়ী কি সুন্দর গাউনটা দিয়ে ছিলেন শর্ম্মিষ্ঠাকে—It was lovely"—এই পরিচ্ছদ-বিলাস তাঁহার ঋণের বোঝা ভারীই করিয়াছিল। পিতামাতার অত্যধিক স্নেহের ফলেই এই বিলাসিতার জন্ম।

পারিবারিক প্রশ্রয়ের দ্বিতীয় কুফল—**মদ্যপানাসক্তি**। পিতার অনুচিত প্রশ্রয়ে, মধুসূদন পিতার সম্মুখেই তামাক খাইতেন এবং জ্ঞাতসারেই মদ্যপান

করিতেন। মডার্ণ অর্থাৎ সাহেব বানাইবার অভিলাষ এবং মডার্ণ বা সাহেব বনিবার চেষ্টা—দুই ইচ্ছা মিলিবার ফলে, মধু আঠারো বৎসর বয়সেই—নেশাগ্রস্ত। এই নেশার খরচ তাঁহার "রাজকীয় necessity"র অনেকখানি দখল করিয়া ছিল এবং নেশার চাহিদা মিটাইতে গিয়াই তাঁহাকে অকালে প্রাণ দিতে হইয়াছিল—অত শোচনীয়ভাবে শেষ বিদায় লইতে হইয়াছিল॥ অমিতাচারের খেসারৎ দিতে দিতেই মধুসূদন দেহে-মনে দেউলিয়া হইয়া গিয়া ছিলেন। মদ খাওয়াকে 'মডার্ণিজমের সহিত এক করিয়া দেখাতেই এই বিপত্তি ঘটিয়াছিল॥

পারিবারিক প্রশ্রয়ের আর একটি কুফল—অত্যুগ্র-অস্মিতা—**একগুঁয়ে স্বভাব**। এই স্বভাবেরই ক্রমপরিণতি—বাধা-অসহিষ্ণুতা—বিদ্রোহিতা। তাঁহার কোন আবদারই অপূর্ণ থাকে নাই, ফলে প্রবৃত্তির অনুশীলন যে পরিমাণে হইয়াছিল নিবৃত্তির অনুশীলন সে পরিমাণে হয় নাই।

প্রবৃত্তিই তাঁহার একমাত্র পথপ্রদর্শক হইয়াছিল। যেখানেই অস্মিতা বাধা পাইয়াছিল সেখানেই মধুসূদন অসহিষ্ণু হইয়া বাধার বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। বিবাহে বাধা পাইতেই—"Coercion। By Gosh।" বলিয়া মধু বিদ্রোহ করিয়াছিলেন—খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। অস্মিতার জন্যই প্রায়শ্চিত্তের দরজা দিয়া সমাজে প্রবেশ করিতে চাহেন নাই, বিশপ কলেজের অধ্যক্ষের মুখের উপর বলিতে পারিয়াছিলেন—"either you allow me to put on the collegiate costume or I shall put on our national dress. I wont be treated shablily, I dont care for the rules of this Bishop's College"; মদ দেওয়ার ব্যাপারে কালো চামড়া সাদা-চামড়ার মধ্যে পক্ষপাতিত্ব করায়—খাবার টেবিলে গ্লাস চুরমার করিয়া উঠিয়া আসিয়াছিলেন; রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন তাঁহাকে "উচ্ছৃঙ্খল মাতাল" বলিলে (৯ম দৃশ্য)—মধুসূদন হবু-হবু শ্বশুর মহাশয়ের মুখের উপর বলিয়াছিলেন—"Is it not a fact that you yourself drank, ate

beef, and were turned out of your own home এবং "জীবনে আর মদ স্পর্শ করবে না"—এই প্রতিজ্ঞা করিতে বলিলে—ব্যঙ্গ করিয়া বলিয়াছিলেন —I am too green a christian yet to make such a false; promise"। এই অস্মিতাই বারবার মধুর স্বস্তি কাড়িয়া লইয়াছিল বটে তবে মধুকে যেমন ইহা উদ্ধত তেমনি অকপটও করিয়া তুলিয়াছিল। এই 'rebel' বা "revolutionary in him" মধুর ট্র্যাজেডির জন্য—নাটকেরও বটে—অনেকখানি দায়ী।

কিন্তু মধুসূদনের ভোগবাসনা এবং আত্মাভিমান ও মেজাজ যত প্রবলই থাকুক, মধুসূদনের হৃদয় ছিল স্পর্শকাতর। "you have enough of sentiments no doubt গৌরদাসের এই কথাই সত্য। মধুসূদনও স্বীকার করিয়াছেন My sentiments are my principles ॥ এই সেন্টিমেন্টের এক ধারা বন্ধু বাৎসল্য রূপে প্রকাশিত হইয়াছে, এক ধারা—মাতৃ-অনুরাগের রূপ লইয়াছে একধারা মহাকবি হওয়ার passion বা উচ্চাকাঙ্ক্ষার (ambition) রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। মধুসূদনের হৃদয় ছিল যেমন স্পর্শকাতর তেমনি মস্তিষ্ক ছিল কল্পনা প্রবণ। private feelings" এর হাত এড়াইবেন তিনি কি করিয়া? কল্পনার চোখের সম্মুখে মায়ের করুণ মূর্তি বার বার আসিয়া হানা দিয়াছিল। গৌরদাসের কাছে মধু স্বীকার করিয়াছিলেন Do you know she haunts me? এই স্পর্শকাতর চিত্তই মায়ের মৃত্যুর পরে পিতাকে নিজের কাছে লইয়া যাইতে ছুটিয়া আসিয়াছিল এবং আহত হইয়া ফিরিয়া গিয়াছিল। এই স্পর্শকাতর চিত্তই রেবেকার ছেলে মেয়ে ছিনাইয়া লইয়া রেবেকাকে নিষ্ঠুর আঘাত দিতে কাতর হইয়া পড়িয়াছিল, "unprotected lone stepmother কে দেখিয়া crest fallen—dumbfounded" হইয়াছিল একদিকে ভোগবিলাসিতা অমিতাচরিতা আত্মাভিমানিতা অস্মিতা সমবেদনাশীল চিত্তের স্পর্শকাতরতা (বন্ধুবৎসলতা মাতৃভক্তি পিতৃভক্তি সন্তানবাৎসল্য প্রভৃতিতে ব্যক্ত) অন্যদিকে মধুসূদনের মেধা বা মনস্বিতা এবং কল্পনা-শক্তি ও সহৃদয়তা। শেষোক্ত—হৃদয়ের ও

মস্তিষ্কের ক্ষমতাই (Genius) মধুসূদনের উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রকৃতি গঠন করিয়াছিল। মধু কলেজে 'already a pope' ছিলেন। এই কবি শক্তির' আবির্ভাবই তাঁহার মধ্যে ক্রমে মহাকবি হওয়ার উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রবল আবেগে পরিণত হইয়াছিল। ইংলণ্ডে যাওয়া—ইংরেজ-মেয়ে বিয়ে করা—এই উচ্চাকাঙ্ক্ষারই অনুপান বিশেষ। ইহারই উর্দ্ধচাপে মধুসূদন উৎকেন্দ্রিক হইয়া কক্ষচ্যুত হইয়াছিলন।

এতখানি ভোগবিলাসিতা অমিতাচারিতা এবং অস্মিতা যাঁহার বাসনায়, এতখানি স্পর্শকাতরতা ও ভাবাবেগ যাঁহার হৃদয়ে এবং এত বড় কল্পনাশক্তি ও মেধা যাঁহার মস্তিষ্কে—আর সব কিছুর উপরে উদগ্র উচ্চাকাঙ্ক্ষা যাঁহার প্রাণে, তাঁহার জীবনে ট্র্যাজেডির অবকাশ যথেষ্টই আছে।

এইরূপ ব্যক্তির জীবনে বৃত্তির সামঞ্জস্য-জনিত ভারসাম্যের অভাব অনিবার্য্য ; স্বস্তি শান্তি—সুখের সহিত ইহাদের বিবাদ না ঘটিয়াই পারে না। অস্মিতা মধুসূদনকে বারবার আশ্রয়চ্যুত করিয়াছে, ভোগবিলাসিতা অভাবের ও ঋণের চাপে স্বস্তিত নিশ্বাস :লইতে দেয় নাই, অমিতাচারে—দেহ রোগ জর্জ্জরিত করিয়াছে, স্পর্শকাতর চিত্ত প্রতি পলে পলে আঘাত পাইয়াছে, উচ্চাকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ রহিয়া হতাশা জাগাইয়া রাখিয়াছে, প্রতিভা স্বস্তিতে স্ফূর্ত্ত হইতে পারে নাই—আত্মাভিমান মর্ম্মান্তিক আঘাতে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়াছে —এই ভাবেই মধুসূদনের দুঃখ-দুর্দ্দশার পাত্র নানা দিক দিয়া পূর্ণ হইয়াছে॥

নাট্যকার মধুসূদনের সমস্ত সত্তাই কম-বেশী ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, এবং অস্মিতা উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং স্পর্শকাতর চিত্তের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার রূপ দেখাইবার চেষ্টাও মন্দ করেন ·নাই। তবে এই চেষ্টা সর্ব্বত্র সমান সফল হয় নাই।

অনুভাব-সঞ্চারিভাব সবক্ষেত্রে যথেষ্ট মাত্রায় প্রয়োগ করা হয় নাই। একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক—অষ্টম দৃশ্যের শেষে—রঘু প্রবেশ করিয়া জানাইয়াছে

—"মা আবার কেমন যেন নেতিয়ে পড়েছেন।" এই সংবাদের পর, মধুর প্রশ্নটি "কি হয়েছে মায়ের?" যথেষ্ট প্রতিক্রিয়া বলা যায় না। তারপর—রাজনারায়ণ পথ রোধ করিবার পরে মধুর মধ্যে যে বাচনিক ও সাত্বিক অভিব্যক্তি দেখানো হইয়াছে তাহাও যথেষ্ট বলা যায় না।

একটি ত্রুটি বেশী করিয়া চোখে পড়ে এবং তাহা এই যে—মধুসূদনকে আরো সচেতন, আরো মননশীল (introspective) আরো ভাবুক (brooding) করিবার যে সুযোগ ছিল, তাহা নাট্যকার গ্রহণ করেন নাই। ভাবে ও ভাবনায় মধুসূদনকে আরো সমৃদ্ধ করার সুযোগ আছে। মাতা-পিতার স্মৃতি, মধুসূদনের পিতৃসত্তা, অপূর্ণ উচ্চাকাঙ্ক্ষার জন্য হা-হুতাশ প্রভৃতি দ্বারা, মাদ্রাজ প্রবাসী মধুসূদনকে আরো রসভাবসমুজ্জ্বল করা যাইত। পরবর্ত্তী জীবনে, কবি-মধুসূদনে বা ব্যারিষ্টার মধুসূদনে শুধু অভাবের তাড়নাই দেখানো হইয়াছে—গভীর কোন দ্বন্দ্ব ফুটিয়া উঠে নাই। অবশ্য বিংশ দৃশ্যে নাট্যকার চক্রবৃদ্ধি হারে এই দ্বন্দ্বের অভাব পূরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং অনেকখানি কৃতকার্য্যও হইয়াছেন॥

রাজনারায়ণ

অন্তর্দ্বন্দ্বের গভীরতার এবং তীব্রতার দিক দিয়া দেখিতে গেলে, সমগ্র নাটকের মধ্যে 'রাজনারায়ণ' চরিত্রটিই সর্ব্ব প্রথম উল্লেখযোগ্য। **'মুন্সী-রাজনারায়ণ', 'পিতা-রাজনারায়ণ'** এবং **'পত্নী-অনুরাগী রাজনারায়ণ'** —এই তিনটি সত্তার সমবায়ে রাজনারায়ণ চরিত্রটি গঠিত হইয়াছে এবং মুন্সী-রাজনারায়ণ এবং পিতা-রাজনারায়ণের তীব্র দ্বন্দ্বই চরিত্রটিকে প্রাণবান করিয়া তুলিয়াছে। পত্নী-অনুরাগী রাজনারায়ণকে একটি দৃশ্যে (একাদশ দৃশ্যে) পিতা পুত্রের দ্বন্দ্বের পটভূমি করা হইয়াছে বটে, কিন্তু পূর্ব্ব প্রস্তুতির অভাবে পটভূমিটুকু জোরালো উদ্দীপক হইতে পারে নাই। পত্নী-অনুরাগ এবং আরো তিনবার বিয়ে—এই দুইটি ব্যাপারকে মূল রসের সহিত সমন্বিত

করিতে হইলে রাজনারায়ণ-কে যেভাবে গাঁথিয়া তুলা দরকার, সেভাবে গাঁথিয়া তুলা হয় নাই। নাট্যকার এ বিষয়ে সচেতন বটে, কিন্তু খুব সতর্ক হন নাই। সতর্ক হইলে—ষষ্ঠ দৃশ্যে—বংশরক্ষার আবেগকে আরো তীব্র রূপে প্রকাশ করিতেন এবং জাহ্নবীর মুখে—"ঠিকই বলেছি—তোমার মনের কথা আমি বুঝতে পারি"—এই উক্তিটি বসাইতেন না। উক্তিটি গাম্ভীর্য্যের হানি ঘটাইয়াছে। তারপর জাহ্নবীর প্রায়শ্চিত্ত করাইবার প্রস্তাবে··· রাজনারায়ণ যাহা বলিয়াছেন উল্লিখিত উক্তির পরে তাহাকেও শুধু স্নেহাভিমানের প্রতিক্রিয়া বলিয়া উপলব্ধ হয় না। পিতা-রাজনারায়ণ এবং পত্নী-অনুরাগী রাজনারায়ণের সত্তা অক্ষুণ্ণ রাখিতে আরো সতর্কতা আবশ্যক। বংশ রক্ষার জন্য বিয়ের পর বিয়ে, অকৃত্রিম পত্নী-অনুরাগের (জাহ্নবী অনুরাগের) পটভূমিতে এবং বংশ রক্ষার উদভ্রান্ত আবেগের সহিত দেখাইতে না পারিলে, পিতা-রাজনারায়ণের গুরুত্বও সম্পূর্ণ রক্ষা করা সম্ভব নহে।

মুন্সী-রাজনারায়ণ = স্বভাবে—দৃঢ়চেতা এবং খুব অহংপুষ্ট ব্যক্তি, আর্থিক অবস্থায়—ধনী, সামাজিক প্রতিষ্ঠায়—সম্ভ্রান্ত এবং অভিজাত এবং রুচিতে—প্রগতিপন্থী। মধুর সাহেবিয়ানা—(পোষাকে এবং আচারেও বটে) তামাক খাওয়া মদ খাওয়া প্রভৃতি "Common punctilios" তিনি কালের ধর্ম্ম বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন,—কেষ্টবন্দ্যো, রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি ইংরেজী শিক্ষিতদের রক্ষণশীলরা "আচার ভ্রষ্ট কুলাঙ্গার" "মানুষ তো নয় মদের পিপে এক একটি" বলিয়া ধিক্কার দিলেও তিনি তাঁহাদের "শিক্ষিত বলিয়া দেশের হিতাকাঙ্ক্ষী বলিয়াই মনে করেন। পিতা-রাজনারায়ণ এক মাত্র বংশধর—ছেলের মতো ছেলে—হিন্দু কলেজের সেরা ছেলে—মধুর সব আবদারই পূরণ করেন, কিন্তু তাই বলিয়া পুত্র পিতাকে 'অমান্য' করিবে —রাজনারায়ণের মাথা ডিঙ্গাইয়া যাইবে 'মুন্সী-রাজনারায়ণ' তাহা বরদাস্ত করিতে নারাজ। মধুর বিবাহ—"রাজনারায়ণ যখন ঠিক করেছে, তখন আর 'যদি'র স্থান নেই"। তাঁহার কথার দাম—ষোল আনা; সেখানে পাই

পয়সা এদিক ওদিক হইতে পারিবে না। তাঁহার কথায়ও মতের কাছে—"ওসব চলবে টলবে না"……। মুন্সী-রাজনারায়ণ শক্ত মানুষ।

এই শক্ত-মানুষটির সহিত মধুর প্রথম সংঘাত বাধে এবং বাধে বিয়ের ব্যাপারে। মধু বলে—'পারব না' মুনশী রাজনারায়ণ বলেন—"you must" "আমি কাল তোমার জবাব চাই definitly"। দুই গোঁয়ে ঠোকাঠুকি বাধিয়া যায়। বাপ্‌কা-বেটা মধু খ্রীষ্টান হইবার জন্য গৃহত্যাগ করে। রাজকৃষ্ণ বসাকের বাড়ীতে এই মুনসী-রাজনারায়ণের উগ্র মূর্ত্তি দেখা যায় তাঁহার ক্রোধ জলিয়া ওঠে—"আমার ছেলেকে ধরে খ্রীষ্টান করবে।…খুন করে ফেলব সব—রাজনারায়ণ মুন্সীকে চেনেনা ব্যাটারা। লেঠেল আর শড়কি-ওয়ালা এনে আগুন ছুটিয়ে দেয়।

পিতা-রাজনারায়ণ আর্তনাদ করেন—"সর্ব্বনাশ হয়ে গেল আমার"। কিন্তু তিনি মুন্সী-রাজনারায়ণ—যত আঘাত পাইয়াছেন তত তীব্র তাঁহার উত্তেজনা—সেই উত্তেজনায় তিনি রীতিমত অপ্রকৃতিস্থ—পুত্রের প্রতি দারুণ অভিমান সেই উত্তেজনার সঙ্গে মিশিয়া আছে। ভিতরকার জ্বালায় বাহিরে আঘাত হানিতেছেন, জাহ্নবীকে আঘত দিয়া বলেন—আদর দিয়ে ছেলেকে মাথায় চড়িয়েছিল—ছেলে এখন সেই মাথায় লাথি মেরে চলে গেল।" একটি "উঃ" এবং উচ্চৈঃস্বরে প্যারিকে আহ্বানে তাহার অন্তর্দাহ উৎক্ষিপ্ত হয়। উত্তেজনার মুখ ফিরে—পাদ্রীদের দিকে—তর্জ্জন গর্জ্জনের রূপে বাহির হয়—"শালাদের দেখাচ্ছি আমি!'……"বাঘের বাচ্চা কেড়ে নিয়ে যাওয়া বরং সোজা, কিন্তু আমার ছেলেকে কেড়ে নিয়ে যাওয়া শক্ত।" কিন্তু জাহ্নবীর ভয়—'চটাচটি করলে তবে যদি বাছার কোন অনিষ্ট করে'। ভয় অমূলক নহে। কারণ ওরা সব পারে। পুড়াইয়া মারিতেও তাহারা পারে। এই ধরণের কথা শুনিয়া পিতা রাজনারায়ণের মধ্যে দুশ্চিন্তাই স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া—স্বাগতকণ্ঠে বলিলেও তিনি জাহ্নবীর কাছেই যেন আত্মসমর্পণ করেন—জিজ্ঞাসা করেন "কি করতে বল তুমি! 'বুঝিয়ে সুজিয়ে' ফিরিয়ে আনার প্রস্তাবে

মুন্সী রাজনারায়ণের উত্তেজনা বাড়িয়া যায়* [যাওয়া স্বাভাবিকই কিন্তু—আর্কডিকন ডিলট্রি এবং ব্রিগেডিয়ার পাউনিকে পদিপিসি ও শান্তমাসীর সহিত তুলনা করিয়া রাজনারায়ণ গাম্ভীর্য্যের হানি ঘটাইয়াছেন বলিয়া মনে হয়, কারণ ঐ দুইটি শব্দ উচ্চারণের সঙ্গেই হাস্য উদ্রিক্ত হওয়ার সম্ভবনাই বেশী ; এখানে অভিনয়ের দ্বারা গাম্ভীর্য্যের ধারা রক্ষা করিতে পারিবেন—এমন অভিনেতা সুদুর্লভ] বুঝিয়ে সুজিয়ের মধ্যে মুনসী রাজনারায়ণ নাই। তাঁহার সুস্পষ্ট জবাব—"সে আমি পারব না। এই ফিরিঙ্গি পাদরি ব্যাটাদের কাছে হাতজোড় করে আমি বলতে পারব না যে আমার ছেলেকে তোমরা ফিরিয়ে দাও দয়া করে। এ অসম্ভব আমার পক্ষে। কিন্তু জাহ্নবী পায়ে ধরিয়া কাঁদেন—"প্রসন্নকে হারিয়েছি, মহেন্দ্রকে হারিয়েছি—শেষকালে কি মধুকেও হারাবো।" রাজনারায়ণ সহসা দ্রবীভূত হন—জাহ্নবীকে তুলেন—'পিতা রাজনারায়ণ' একমাত্র বংশধবের জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করেন। মধু কি তাহারও সন্তান নয়। একদিকে জাহ্নবীর অনুরোধ, পুত্রের নিরাপত্তা—অন্য দিকে পুত্রের উদ্ধারের জন্য লাঠিয়াল জমায়েৎ। মহা মুসকিলেই তিনি পড়েন।

সমস্যাই বটে॥ রাজনারায়ণের একমাত্র বংশধর মধু খ্রীষ্টান হইয়াছে শহরময় টি টি পড়িয়া গিয়াছে। মুনসী-রাজনারায়ণের মাথা একেবারে হেট হইয়া গিয়াছে। মধুকে ফিরিয়ে আনার প্রাণপণ চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। অগত্যা বিলাত গিয়া খ্রীষ্টান হইবার জন্য যে হাজার খানেক টাকা পাঠাইয়াছিলেন তাহাও মধু ফিরাইয়া দিয়াছে! "একমাত্র ছেলে হলেও খৃষ্টান ছেলে ঘরে নেওয়া যায় না।" জাহ্নবীর পায়ে পড়িয়া অবিরাম কান্না। মহাসমস্যা রাজ নারায়ণের। অভিমানে বুক ভরিয়া উঠে। এতবড় আঘাত যে ছেলে দিতে পারে তাহাকে মাপ করিবেন কেন? পুত্রের কর্ত্তব্য বলিয়া কিছু নাই? জাহ্নবী যতই কাঁদুক, যতই বলুক—পুত্রের পায়ে ধরিয়া ক্ষমা চাইবেন সে লোক তিনি নহেন। কত বড় আঘাত মধুসূদন তাঁহাকে দিয়াছেন। একমাত্র বংশধর জলপিণ্ডের একমাত্র আশা" আর সেই আশারই সে ছাই দিয়াছে। যে "ছেলে

খ্রীষ্টান হয়ে'ছে—ধর্ম্মতঃ তার মৃত্যু হয়েছে।" ক্ষুব্ধ অভিমানে রাজনারায়ণ চীৎকার করিয়া বলেন—মাপ তাকে আমি করতে পারি না। খৃষ্টান হয়ে সে আমার ইহকালের মর্য্যাদা নষ্ট করেছে—পরকালের সদ্‌গতির পথ বন্ধ করেছে —"সে আমার পুত্র নয়—শত্রু॥" "তার মুখদর্শন করতে চাই না আমি' এ অভিমান খুবই স্বাভাবিক।

কিন্তু জাহ্নবীর বিবাহের প্রস্তাবে—তাহার পরেও—রাজনারায়ণ যে প্রতিক্রিয়া দেখাইয়াছেন [৪২ পৃষ্ঠা—৪৪ পৃষ্ঠা] তাহা সমুচিত হয় নাই। জাহ্নবীর প্রতি অনুরাগ, মধুর প্রতি স্নেহ এবং বংশ রক্ষার ব্যাকুলতার মধ্যে যে দ্বন্দ্ব প্রত্যাশিত, তাহা নাট্যকার ব্যক্ত করিতে পারেন নাই। সব দিক বজায় রাখিয়া, আরো দুইবার বিবাহ দিতে হইলে যাহা করা দরকার—বিবাহ ব্যাপারটিকে যেভাবে হতাশ এবং বিক্ষিপ্ত চিত্তের ক্রিয়া রূপে দেখানো দরকার, তাহা দেখানো হয় নাই।

যাহা হউক রাজনারায়ণ আরো দুইবার বিবাহ করেন, কিন্তু যে আশায় করেন তাহা সম্পূর্ণ হয় না। আঘাতে—"কেমন যেন হয়ে গেছেন।" মদের মাত্রা বাড়িয়াছে। ঘন ঘন বাইনাচ করাইয়া ভিতরের দুর্ব্বলতা ঢাকিবার ব্যর্থ চেষ্টা করেন। কিন্তু মধুর মতো ছেলেকে মন হইতে মুছিয়া ফেলা অসবম্ভব। আত্মীয়ের অভিযোগের উত্তরে এই দুর্ব্বলতা বাহির হইয়া পড়ে—"যদি পাঁচজনে এসে আমাকে বিরক্ত করতে থাক, তাহলে ত পাগল হয়ে যাব আমি॥" এই কথোপকথনে নানা সঞ্চারিভাবের মধ্যদিয়া স্নেহার্ত্ত হৃদয় ব্যক্ত হয়। এখনও যে রাজনারায়ণ মধুকে কতখানি ভালবাসেন—বাহিরের রুক্ষ আচরণের অন্তরালে আজও সেই পুত্রস্নেহাতুর পিতা বসিয়া চোখের জল ফেলেন তাহা দেখা যায়।

অথচ সেই বহুবাঞ্ছিত পুত্র সম্মুখে আসিতেই ক্ষুব্ধ পিতৃ অভিমান দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠে—ছোটখাটো দুইএকটি শব্দের স্ফুলিঙ্গের স্পর্শে বিস্ফোরণ ঘটিয়া যায়। **অষ্টম ও একাদশ দৃশ্য**—রাজনারায়ণের পুত্রস্নেহকাতর অভিমান-

ক্ষুব্ধ রূপটিকে ব্যাভিচারিভাবের সাহায্যেই সঞ্চারিত করা হইয়াছে। সংবেদনার দিক দিয়া এই দুইটি দৃশ্য—খুবই উল্লেখযোগ্য। এখানে রাজনারায়ণ চরিত্রের ট্র্যাজেডি খুব তীব্রভাবেই সঞ্চারিত হইয়াছে। তবে অনুভাব-সঞ্চারি ভাবের—তথা ভাবদ্বন্দ্বের আরো উৎকর্ষ দেখানোর অবকাশ যে আছে—সে বিষয়েও কোন সন্দেহ নাই।

এইবার আলোচনার উপসংহার। নাট্যকার, নাটকের জাতি এবং নাটকের গঠন, রস ও চরিত্র সম্বন্ধে অল্পবিস্তারে যতখানি বলা সম্ভব,আশা করি, বলিতে পারিয়াছি। নাটকখানি যে সার্থক একখানি ট্র্যাজেডি-রসাত্মক চরিত-নাটক—এ সিদ্ধান্তে স্থির থাকিয়াই আমি তিলতণ্ডুল ন্যায় অনুসরণে গুণ অপেক্ষা দোষের উল্লেখ বেশী করিয়াছি—অর্থাৎ বেশী পরিমাণ তণ্ডুল হইতে অল্পসংখ্যক তিল বাছিয়া শ্রম লাঘব করিয়াছি। এই কারণে দোষের উল্লেখ গুণের উল্লেখের বেশী থাকায় কেহ যদি মনে করেন নাটকে গুণ অপেক্ষা দোষের মাত্রাই বেশী, তাহা হইলে নাট্যকার ও নাট্য সমালোচক উভয়েরই প্রতি অবিচার করা হইবে। আশা করি কোন সহৃদয় পাঠক তাহা করিবেন না।

(সমাপ্ত)